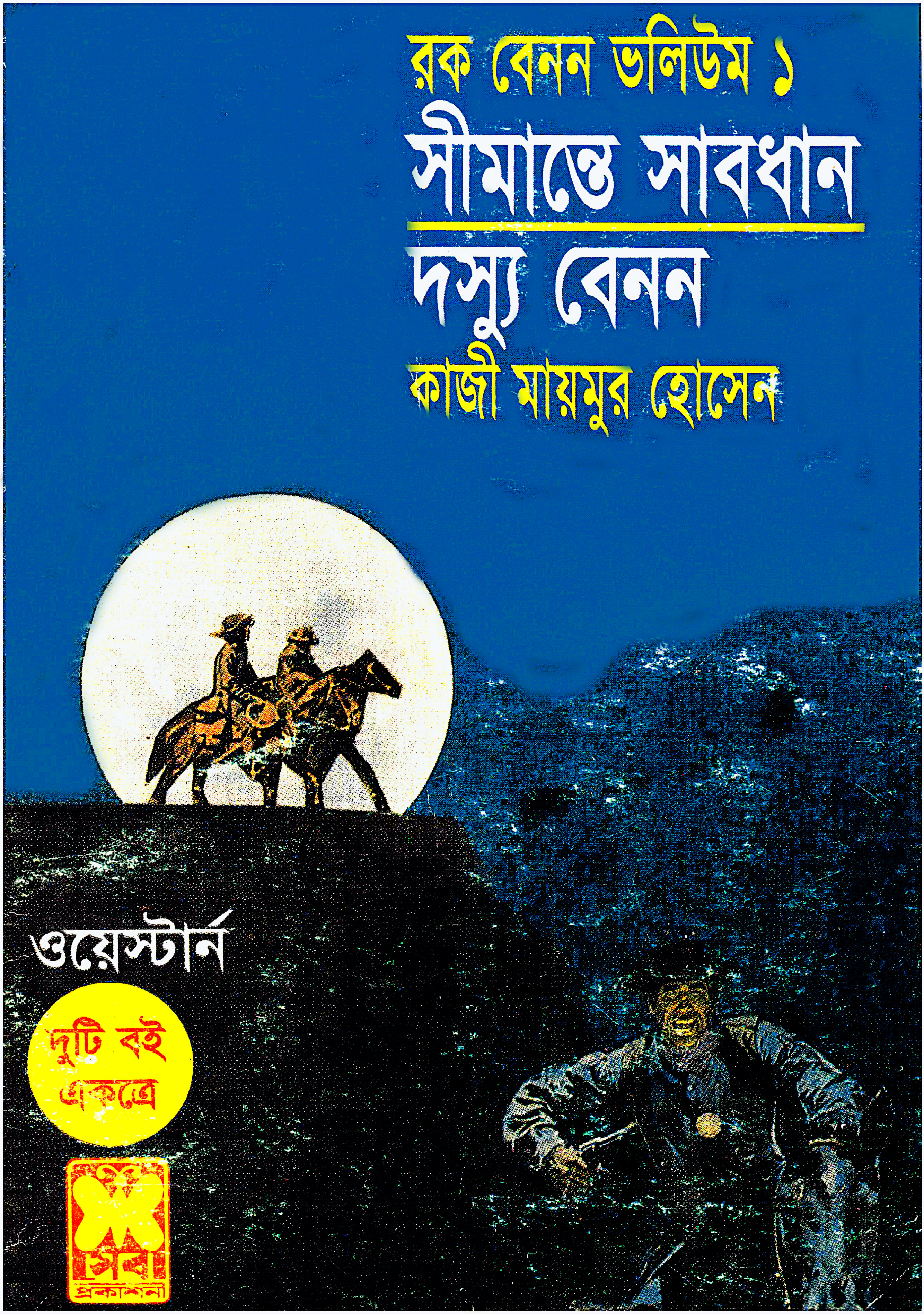

রক বেনন ভলিউম ১
সীমান্তে সাবধান
দস্যু বেনন
কাজী মায়মুর হোসেন
ওয়েস্টার্ন
দুটি বই একত্রে
সেবা প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন

[দুটি বই একত্রে]

কাজী মায়মুর হোসেন

দস্যু বেনন

সবে মাত্র আউট-ল ঘোষিত হয়েছে তরুণ রক বেনন। ক্যালিফোর্নিয়ার ট্রেইলে দেখা হলো ধর্মপ্রাণ এক নির্মল মনের র‍্যাবাইয়ের সঙ্গে। বন্ধুত্ব হলো ওদের। দুর্গম ট্রেইল ধরে সানফ্রান্সিসকো যাচ্ছে ওরা। পথে নানা ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ল। শেষে ধরা পড়ল ভয়ঙ্কর ইন্ডিয়ানদের হাতে। আগুনে ঝলসাবে ওদের। কি হবে এখন?

সীমান্তে সাবধান

দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলো রক বেনন। খুন হলো মিড বাসটিয়ান, এক লক্ষ ডলার গায়েব। প্রায়ই চুরি হচ্ছে হিলা ভ্যালির গরু। খুনী সন্দেহে ফাঁসিতে ঝোলানোর চেষ্টা শুরু হলো। কে মেরেছে বাসটিয়ানকে? কার কাছে চুরি যাওয়া এক লক্ষ ডলার? শেষ পর্যন্ত সব রহস্যের বেড়াজাল বেনন ছিন্ন করতে পারল কি?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ওয়েস্টার্ন

রক বেনন ভলিউম-১

দস্যু বেনন

সীমান্তে সাবধান

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8194-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

DASHYU BENNON
SHIMANTEY SABDHAN
Two Western Novels
By: Qazi Maimur Husain

চৌত্রিশ টাকা

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাড়ইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক,টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা,কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা। **আবু মাহদী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্।

দস্যু বেনন

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

এক

জোব্বা পরা এগারো জন গুরুগম্ভীর র‍্যাবাই বসে আছেন স্কুল বিল্ডিঙের অফিস ঘরে। গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নিতে মীটিং ডাকা হয়েছে আজ। ডেকেছেন র‍্যাবাইদের প্রধান। নব্বইয়ের একদিনও কম হবে না তাঁর বয়স। হাড়জিজ্জিরে শরীর। ছোবা ছাড়ানো নারকেলের মতো মাথা। গাল দুটো তোবড়ানো। কুঁতকুঁতে দু'চোখে এই বয়সেও বুদ্ধির ঝিলিক। সবার কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছেন তিনি, মাঝে মাঝে সায় দিয়ে মাথা দোলাচ্ছেন।

আলাপের এক পর্যায়ে হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বললেন তিনি। দরজার পাশে টুলে বসে থাকা বাচ্চা একটা ছেলেকে বললেন, 'ইব্রাহিমকে ডেকে আনো তো দেখি।'

চলে গেল ছেলেটা। একটু পরেই সদ্য যুবক এক সুদর্শন কিন্তু রুগ্ন র‍্যাবাইকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

ততোক্ষণে আবার আলোচনায় ডুবে গেছেন বয়স্ক র‍্যাবাইরা। ঘরের কোনায় কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে কথা শুনতে লাগল ইব্রাহিম। আসার সময় বৃষ্টিতে ভিজেছিল, সেই বৃষ্টির ফোঁটাগুলো টপটপ করে পড়তে লাগল কার্পেটে।

'আমি বুঝতে পারছি না হাজার হাজার মাইল দূরের কাউকে ওরা ডাকছে কেন!' মন্তব্য করলেন একজন। 'ব্যাপারটা আমার কাছে পাগলামি মনে হচ্ছে।'

'মোটেও তা নয়,' দ্বিমত পোষণ করলেন আরেক র‍্যাবাই। 'বরং এটা আমাদের জন্যে একটা দুর্লভ সম্মান যে ন'হাজার মাইল দূর থেকে ওরা আমাদের প্রশিক্ষিত র‍্যাবাই চেয়েছে। সেজন্যেই আমি বলতে চাই যে ইব্রাহিমকে নয়, আমাদের উচিত সেরা কাউকে পাঠানো। ইব্রাহিম খুবই খারাপ ছাত্র। তাছাড়া পরীক্ষার আগে কোরান শরীফ আর বাইবেল পড়তে গিয়ে সে ধরা পড়েছিল একথা আমাদের ভুললে চলবে না। অন্য ধর্মের প্রতি অত আগ্রহ কিসের! তারচেয়ে আমি বলি পাঠালে আমাদের নেতানিয়াহুকেই পাঠানো উচিত। বললে নেতানিয়াহু রাজি হবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

মাথা নাড়লেন আরেকজন। 'আমি বলেছিলাম। নেতানিয়াহুর মা ওকে যেতে দেবে না।'

'ইব্রাহিমের চেয়েও পরীক্ষায় খারাপ করেছে একজন,' বলল ইব্রাহিমের

ভক্ত, টুলে বসে থাকা বাচ্চা ছেলেটা। 'ইব্রাহিম একেবারে খারাপ ছাত্র না।'
'অ্যাই, তুমি চুপ করো!' একসঙ্গে ধমক দিলেন কয়েকজন র‍্যাবাই।
'তাছাড়া ভাল কেউ আমেরিকার মতো জায়গায় যেতে চাইবে কেন!' ইব্রাহিমের দিকে তাকালেন প্রধান র‍্যাবাই। ইদ্দিশ ভাষায় বললেন, 'ইব্রাহিম, আমি তোমার সঙ্গে জরুরী একটা বিষয়ে গোপনে আলাপ করতে চাই।'
'জ্বী, র‍্যাবাই।' কুর্নিশ করল ইব্রাহিম। 'কখন?'
'এখন, গর্দভ, এখন।'
'কিন্তু আর সবাই...'
'ইংরেজিতে কথা বলব আমরা,' ইংরেজি বললেন র‍্যাবাই প্রধান।
ফ্রেঞ্চ, জার্মান আর স্প্যানিশ ভাষায় ইব্রাহিম এতোই কাঁচা যে বাধ্য হয়ে ইংরেজি শেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে ওকে। অল্পবিস্তর শিখেছে সে। শিখিয়েছেন র‍্যাবাইদের প্রধান। তিনি ছাড়া এই স্কুলের আর কেউ ভাষাটার সঙ্গে পরিচিত নয়, কি কথা হচ্ছে বুঝবে না কেউ, কারণ ইংরেজিতে তাওরাতের তেমন কোন প্রচলন নেই।
'তুমি ভাল ছাত্র ছিলে না, ইব্রাহিম,' গম্ভীর চেহারায় মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ র‍্যাবাই।
'জ্বী।' চোখ নামিয়ে নিল ইব্রাহিম। গত কয়েকদিনে কোন ভুল করেছে কিনা মনে করার চেষ্টা করল। মনে পড়ল না কিছু। তবে নিশ্চিত হবার কোন উপায় নেই, কখন কোথায় ভুলচুক হয়ে গেছে কে বলতে পারে! বোধহয় শাস্তি দিতে ডেকেছেন র‍্যাবাই, কে জানে!
'এই স্কুল থেকে স্নাতক করা অষ্টাশিজনের মধ্যে অষ্টাশিতম হয়েছ তুমি।'
'আঁ, র‍্যাবাই...'
'এটা খুব ভাল কথা নয়।'
'র‍্যাবাই...'
'অন্যরা যখন তাওরাত পড়েছে, তুমি তখন অন্য ধর্মগ্রন্থ পড়ে সময় নষ্ট করে...'
'র‍্যাবাই...'
বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কুঁচকালেন র‍্যাবাই। 'কি!'
'সাতাশি।'
'অ্যাঁ?' থতমত খেয়ে তাকালেন প্রধান যাজক।
'আমি সাতাশিতম হয়েছি, র‍্যাবাই! মেন্ডল পিনকাস অষ্টাশিতম হয়েছিল।' মেন্ডল পিনকাসের জন্যে অন্তর থেকে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করল ইব্রাহিম। পিনকাস সৃষ্টি না হলে ওর নিজের সবচেয়ে খারাপ ছাত্র হওয়া কোনমতে ঠেকানো যেত না। সবচেয়ে খারাপ ছাত্র না হওয়ায় হাসি এসে গেল ওর। বেরিয়ে পড়ল বত্রিশ পাটি দাঁত।
'অ্যাই, হাসবে না খবরদার, ডংকি, চ্লিমাজেল, নাচশলিপার, টমবেনিক কোথাকার!' ধমক দিলেন র‍্যাবাই। 'সাতাশিতম হওয়াতে হাসির কিছু নেই।'
চেহারাটা গম্ভীর করে তুলল ইব্রাহিম। খসখস করে মাথা চুলকে গভীর

মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করল।

'তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত,' বললেন গম্ভীর র‍্যাবাই। 'কোথায়, তোমার চেহারায় দুঃখ দেখছি না কেন!'

ঠোঁটের দু'কোণ নিচে নামিয়ে চেহারায় বিষাদ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল ইব্রাহিম।

'আজ সকালে একটা চিঠি এসেছে আমার কাছে,' আবার শুরু করলেন র‍্যাবাই। 'নতুন একটা কংগ্রিগেশন হতে যাচ্ছে...'

'আমেরিকায়, র‍্যাবাই?' প্রশ্নটা ফসকে বেরিয়ে গেল ইব্রাহিমের মুখ থেকে। বেয়াদবি হয়ে গেল কিনা বুঝতে না পেরে দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে ধরল ও।

'অত কথা কিসের!' ভ্রূকুটি করলেন র‍্যাবাই। 'হ্যাঁ, আমেরিকা থেকেই চিঠি এসেছে। ওদের ওখানে কোন র‍্যাবাই নেই, তাই র‍্যাবাই চেয়েছে ওরা। কমবয়সীরা নাকি অধার্মিক হয়ে যাচ্ছে, ধর্মে-কর্মে মন নেই। এমনকি পরিবার ভেঙে চলে যাচ্ছে অনেকে। ওরা চায় কঠোর একজন র‍্যাবাই। প্রয়োজনে আত্মবিসর্জন দেবার মতো মানসিকতা থাকতে হবে তার।

'তুমি কি আমেরিকায় যেতে ইচ্ছুক?'

'জ্বী, র‍্যাবাই।' বুকের মাঝে লাফ মারল ইব্রাহিমের হৃৎপিণ্ড। অনেকদিনের ইচ্ছে ওর এই স্কুল থেকে বেরোয়। তিনবার পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারেনি ও। এবারই কেমন করে যেন কপালে লেগে গেছে। দরকার হলে নরকে যেতেও আপত্তি নেই ওর। তবু যদি বুড়ো র‍্যাবাইদের চোখ রাঙানি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

'বেশ, তাহলে তুমি ইয়ারবা বুয়েনায় যাচ্ছ।' ইব্রাহিম রাজি হওয়াতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন প্রধান র‍্যাবাই। আমেরিকার মতো দূর দেশে ছেলেদের যেতে দিতে কোন অভিভাবকই রাজি হচ্ছিল না। এতিম ইব্রাহিমের সেই সমস্যা নেই, তাছাড়া আমেরিকায় যেতে খুশি মনে রাজি আছে ও। আরেকটা ব্যাপার, ইব্রাহিমের মতো বাজে ছাত্র জেরুজালেমে কাজই বা পাবে কোথায়। আর কাজ না পেলে বেচারা না খেয়ে মরবে এতে সন্দেহ নেই কোন। তার চেয়ে দেখুক একবার চেষ্টা করে। ভাগ্যে থাকলে আমেরিকায় যদি পৌঁছতে পারে হয়তো করে কম্মে খেতে পারবে। শিক্ষক হিসেবে এটুকু সুযোগ তাঁর ছাত্রকে করে দিতে পেরে সন্তুষ্টি বোধ করলেন বৃদ্ধ র‍্যাবাই।

'ইয়েরবা বুয়েনা কোথায়, র‍্যাবাই?' জানতে চাইল ইব্রাহিম।

'ওটার নাম বদলে এখন হয়েছে সান ফ্রান্সিসকো, আমেরিকার পশ্চিম-দক্ষিণে।' টেবিলে রাখা ম্যাপে আঙুল ঠুকলেন র‍্যাবাই। 'এই যে। তোমাকে যেতে হবে ফিলাডেলফিয়া হয়ে।' উপস্থিত আর র‍্যাবাইদের দিকে তাকালেন তিনি। স্বস্তির শ্বাস ফেলে হিব্রুতে বললেন, 'হ্যাঁ, ইব্রাহিম যেতে রাজি। এবার ভোট গ্রহণ। কে কে ওর যাবার পক্ষে, হাত তুলুন।'

একটা হাতও ওপরে উঠল না। যত খারাপ ফলাফলই করুক, যতবারই পরীক্ষায় ফেল করুক, ইব্রাহিম সরল সাদাসিধে; তাছাড়া অত্যন্ত বাধ্য, অনুগত

ঈশ্বরভক্ত হিসেবে নাম করেছে। ওকে মৃত্যুর মুখে এভাবে ঠেলে দেয়া সমর্থন করতে পারল না কেউ।

'বেশ, তাহলে ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হলো,' বললেন প্রধান র‍্যাবাই। 'এবার আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী ফলাফল ঘোষণার পালা। ভোট গণনা শেষে সবদিক বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হলাম যে ইব্রাহিম যাচ্ছে।'

ইদ্দিশ, জার্মান, পোলিশ, স্প্যানিশ আর রাশিয়ান ভাষায় তুমুল প্রতিবাদের ঝড় তুললেন বাকি র‍্যাবাই। দু'তিনজন মারমুখী হয়ে তেড়ে গেলেন প্রধান র‍্যাবাইয়ের দিকে। কেউ মাতৃভাষা হিব্রু ব্যবহার করতে পারছেন না কারণ হিব্রুতে কোন গালাগাল নেই।

'যাও, ইব্রাহিম, যাও!' দু'হাত শূন্যে তুলে হুঙ্কার ছাড়লেন র‍্যাবাইদের প্রধান। পরক্ষণেই কয়েকজনের তলায় চাপা পড়ে গেলেন তিনি।

তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো ইব্রাহিম।

বিদায়ের আগের দিন ছোট একটা অনুষ্ঠান করে ইস্কুলের তরফ থেকে ওর হাতে তুলে দেয়া হলো একটা তাওরাত গ্রন্থ আর রুপোর পাতে লেখা টেন কমান্ডমেন্ট। ও নিজে সঙ্গে নিয়ে নিল বাইবেল আর একখানা পবিত্র কোরান শরীফ। সব ধর্মই তো স্রষ্টার কাছ থেকে এসেছে। কোনটাই ফেলনা নয়। কোথাও বলা নেই যে মিথ্যে কথা বলো বা খারাপ কাজ করো। সেজন্যেই কোন ধর্মকে খাটো করে না দেখার একটা তাগিদ সবসময়েই মনের গভীরে অনুভব করে ও।

বিদায় গ্রহণের পালা শেষে ডিসেম্বরের এক শীতের সকালে জাহাজে চাপল ইব্রাহিম।

তিরিশ বছর বয়সী জীর্ণ জাহাজটার নাম কলিব্রি। দু'মাস্তুলের জাহাজ। তুলো বহন করত। এখন অনেকেই আমেরিকা যেতে ইচ্ছুক দেখে নতুন ব্যবসায় নেমেছে। সামান্য ঢেউয়ের দোলাতেই ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করছে ওটার কাঠের জোড়াগুলো। এ জাহাজ আমেরিকায় পৌঁছবে সে সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ।

'আহা নবজীবনের বাহন,' ডেকে উঠে বিড়বিড় করে বলল ইব্রাহিম। স্টিয়ারেজ সেকশনের দিকে পা বাড়িয়ে দেখল অনেকেই শ্রদ্ধা নিয়ে দেখছে ওকে। ওর পরনে র‍্যাবাইয়ের পোশাক, সেটাই তাদের ভক্তির কারণ।

স্টিয়ারেজ সেকশনটা উচ্চতায় ছয় ফুট। আমেরিকায় কেন লম্বা ইহুদি এত কম দেখা যায় সে ব্যাপারে পরবর্তী কালের গবেষকরা এই স্টিয়ারেজ সেকশনটাকে অন্যতম কারণ বলে ধরতে পারে।

খোলের দু'পাশে ওপর-নিচে দু'সারি বাংক। সম্মানিতদের সেখানে থাকার ব্যবস্থা। মেঝেতে শোবে বাকি সবাই। প্রত্যেককে যাত্রা উপলক্ষে দেয়া হলো একটা করে সাবান আর তোয়ালে। প্রতি তিনজনের জন্যে একটা করে লাইফ প্রিযার্ভারও জুটল সেই সঙ্গে।

খোলের মাঝখানটা বেড়া দিয়ে ঘেরা। ওখানে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে শুয়োর আর মুরগির পাল। বাল্কহেডের পাশে রইল পানির ব্যারেল, চাল আর আলুর বস্তা।

আহা, ভাবল ইব্রাহিম, এর চেয়ে ভাল জাহাজ কি আর হয়! আমার জন্যে কতই না খরচ করেছে আমাদের কংগ্রিগেশন!

প্রথমদিনই যাত্রীদের জানা হয়ে গেল যে র‍্যাবাই ইংরেজি পারে। অনেকে মিলে ইব্রাহিমকে চেপে ধরল; ইংরেজি শেখাতে হবে তাদের।

দ্বিতীয় দিন থেকে ডেকের ওপরে শুরু হলো ইব্রাহিমের ক্লাস। সামনে বিশ-পঁচিশজনকে বসিয়ে ইংরেজি শেখাতে লাগল ইব্রাহিম।

'আমি সী ক্র্যাঙ্ক,' বলল মইশি ফিশবেইন।

'উঁহুঁ, হলো না,' মাথা নাড়ল ইব্রাহিম। গ্রামারের বইটা একবার দেখে নিয়ে বলল, 'তুমি হচ্ছ সী-সিক।'

'আমি সী ক্র্যাঙ্ক,' জানাল ফিশবেইন।

'তুমি হচ্ছ সী-সিক,' বলল ইব্রাহিম। 'বুঝেছ? তুমি সী-সিক।'

জবাব দিতে পারল না ফিশবেইন, বমির ভাব আসায় গলা দিয়ে গঁকগঁক শব্দ করল কেবল।

'আমার নাম অ্যানা লিফস্‌শিজ,' বলে উঠল একজন মহিলা।

'বাহ্, বেশ, এই তো হচ্ছে।' উৎসাহ দিল ইব্রাহিম। হাত তুলল, যাতে কারও কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারে।

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?' নিজের পাণ্ডিত্য দেখাতে জানতে চাইল সদ্য বাক্যটা শেখা একজন।

'আমি সী-সিক,' জবাবে বলল অ্যানা লিফস্‌শিজ।

'হলো না,' জানাল ইব্রাহিম। 'আপনি যাচ্ছেন ফিলাডেলফিয়া।'

'আমি সী ক্র্যাঙ্ক,' বমির ফাঁকে বলে উঠল ফিসবেইন।

'তুমি হচ্ছ সী-সিক।' শুদ্ধ করে দিল ইব্রাহিম।

'আমি হচ্ছি সী-সিক,' বলল মিসেস লিফস্‌শিজ।

'ইনি হচ্ছেন সী-সিক,' অ্যানা লিফস্‌শিজের দিকে ক্লাসের মনোযোগ আকর্ষণ করল ইব্রাহিম।

'তাহলে যে একটু আগে বললেন ইনি অ্যানা লিফস্‌শিজ?' ইদ্দিশ ভাষায় জানতে চাইল একজন সন্দেহপরায়ণ বৃদ্ধ। বাকিরাও সায় দিল তার কথায়। ব্যাপারটা সবার কাছেই বড্ড গোলমেলে ঠেকছে।

কিছুক্ষণ মাথা চুলকানো শেষে গ্রামার বই খুঁজে উপযুক্ত জবাব হাতড়াতে লাগল বিপর্যস্ত ইব্রাহিম। তারপর জবাব খুঁজে পাবার আগেই বমি করতে ছুটল জাহাজের রেলিঙের দিকে।

এভাবেই প্রতিদিন চলল তার ক্লাস।

এগিয়ে চলেছে জাহাজ আমেরিকার দিকে।

দুই

আকাশের রং গাঢ় নীল, মাঝে মাঝে ভেসে যাচ্ছে সাদা মেঘের ভেলা; শান্ত সাগর, ঢেউয়ের দল মৃদু ছল-ছল-ছলাৎ শব্দে বাড়ি খাচ্ছে জাহাজের খোলে। পশ্চিমে হেলে পড়েছে সূর্য, লোনা জলের গন্ধ মেখে ঝিরঝির করে বইছে হিমেল বাতাস, কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে সবার গায়ে।

স্টিয়ারেজ সেকশনে ক্লাস চলছে প্রধান সব ধর্মের মাহাত্ম্য বিষয়ে, জানানো হচ্ছে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে, এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হলো জাহাজের মেট। ইব্রাহিমকে হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হড়বড় করে বলল, 'মিশকিন মরে যাচ্ছে, র‍্যাবাই!'

'আবার?' চিন্তিত চেহারায় মেটের দিকে তাকাল ইব্রাহিম। ধর্মীয় আলোচনা থেকে হঠাৎ উঠে চলে যাওয়া উচিত হবে কিনা ভাবছে।

ঘনঘন মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'আবার।'

'ওকে বলো একমিনিটের মধ্যে আসছি আমি।'

'একমিনিট! অনেক দেরি হয়ে যাবে, দড়িতে ঝুলে পড়েছে ও।' ওর হাত ধরে টানল লোকটা।

'বেশ চলো।' পা বাড়াল ইব্রাহিম। নিজেরই হোক বা অপরের, জান বাঁচানো ফরজ একথাটা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে ও।

জাহাজের হোল্ডে এসে দেখা পাওয়া গেল মিশকিনের। একটা ক্রস-বিমে দড়ি টাঙিয়ে ঝুলে পড়েছে পঁয়ত্রিশ বছরের গোঁফওয়ালা ইয়া মোটা মুচি। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মারা যাবার তাল করছে সে। গত সপ্তাহে ওর পঁচাশি বছরের বুড়ি মা মারা গেছে। সাগরে কবর দেয়া হয়েছে মহিলাকে। সেই থেকে দু'দিন পরপর মরতে চাইছে মিশকিন। এর আগে স্টিয়ারেজ সেকশনে মরতে চেয়েছিল, কিন্তু দড়িতে গলা ঢোকানোর পর দেখা গেল মেঝেতে পা ঠেকে যাচ্ছে ওর। এবার তাই হোল্ডে এসেছে। এখানে ঝুলে পড়ার সেই সমস্যাটি আর নেই, হোল্ডের উচ্চতা আট ফুট।

ঝুলছে মিশকিন। দু'পাশ থেকে দু'জন তাকে তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার শার্টের হাতা ধরে ওপরে তুলতে চাইছে এক আরব মহিলা। সবাই মিলেও পারছে না। অসম্ভব ওজন মুচির। দুইশো চল্লিশ পাউন্ড। একে তো জাহাজটা দোল খাচ্ছে, তার ওপর এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়ছে মুচি। সেই সঙ্গে চিৎকার, 'আমাকে মরতে দাও! কোন্ অধিকারে আমাকে ঠেকাচ্ছ? মরতে দাও আমাকে!'

'দেব, শয়তান কোথাকার!' দাঁত খিঁচিয়ে খেঁকিয়ে উঠল এক বৃদ্ধ। 'দেব মরতে। আগে আমার টাকা শোধ করো, তারপর মরে জাহান্নামে যাও।'

ইব্রাহিমকে দেখে কাতরে উঠল মিশকিন, 'তাকে ছাড়া আমি বাঁচব

না···বাঁচতে চাই না আমি!'

দৌড়ে গিয়ে মুচির দু'পায়ের ফাঁকে কাঁধ গলিয়ে দিল ইব্রাহিম। ওজনের কারণে হাঁটু বেঁকে গেল ওর। কোনমতে ককিঁয়ে উঠল, 'বাঁচাও!'

ইতিমধ্যে হোল্ডে এসে ঢুকেছে কয়েকজন। র‍্যাবাইয়ের সাহায্যে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো তারা। মিশকিনকে নামিয়ে আনল ফাঁস খুলে।

দম ফিরে পেয়ে ইব্রাহিম বলল, 'মিশকিন, কি হয়েছে তোমার বলো তো?'

দু'হাত দু'দিকে ছুঁড়ে দিল কান্নারত মিশকিন। 'আমি এই নিষ্ঠুর দুনিয়ায় বড় একা।'

সান্ত্বনা দিল র‍্যাবাই। 'ছিহ্, এসব কি কথা, আমরা আছি না!'

ফুঁপিয়ে উঠে মাথা নাড়ল মুচি। 'মাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।'

'এটা কোন সমাধান হলো না।' বোঝাবার চেষ্টা করল ইব্রাহিম।

'আমাকে ছেড়ে কেন চলে গেল মা?' আকাশের দিকে তাকাল মিশকিন। আকাশ মানে হোল্ডের ছাদে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো তার। ডুকরে উঠল, 'মা! মাগো! কোথায় গেলে, মা, তুমি, আমাকে এতিম করে!'

এই পর্যায়ে দার্শনিক হয়ে উঠল ইব্রাহিম। বলল, 'সে আর ইহলোকে নেই কারণ তোমার মাও যে মানুষ ছিল। মানুষ মাত্রেই মরতে হয়। যে না মরে সে বাঁচবে কিভাবে বলো? তুমি যদি মরতে না চাও তাহলে বেঁচো না।'

'আমার মা দেবী ছিল।'

'বেশ, তোমার কথাই ঠিক বলে ধরে নিলাম।'

'আমার মা পরী ছিল। মার···'

'মার বয়স হয়েছিল পঁচাশি,' কথা কেড়ে নিয়ে বলল ইব্রাহিম।

দড়িটা গলার যে জায়গাটায় এঁটে বসেছিল সে জায়গাটা ডলল মিশকিন। সিদ্ধান্তে এসে বলল, 'আমি মরতে চাই।' কথা শেষেই ঝুলন্ত দড়িটা ধরে মাথায় পরার চেষ্টা করল সে।

তাকে বাধা দিল ইব্রাহিম। 'মিশকিন! সব ধর্মেই বলেছে আত্মহত্যা করা মহাপাপ।'

'দড়ি ছাড়ুন, ছেড়ে দিন, র‍্যাবাই!'

'তাওরাতে বলা আছে কিছু একটা চাইলে···চাইতে থাকলে চারবারের বার ঈশ্বর তাকে সেটা অবশ্যই দেন।'

'আমাকে শান্তিতে মরতে দিন!' দড়িটা টানা হ্যাঁচড়া আরম্ভ করল মিশকিন।

'বেশ, তবে তাই হোক!' দড়ি ছেড়ে দিল ইব্রাহিম।

কিছুটা দ্বিধা আর শংকা নিয়ে ওর দিকে তাকাল মোটা লোকটা। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'ধন্যবাদ, র‍্যাবাই।' ভাবেনি সত্যিই র‍্যাবাই ওর আত্মহত্যার চেষ্টায় সম্মতি দেবে।

'কিন্তু এভাবে নয়, এভাবে মরাটা পাপ।' তাকে নিরস্ত করতে হাত তুলল ইব্রাহিম। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসো দেখি কয়েকজন, ওকে চেপে

ধরে সাগরে ছুঁড়ে দাও।'

জটলার মধ্যে গুঞ্জন উঠল। র‍্যাবাইয়ের নির্দেশ পালন করতে পা বাড়াল কয়েকজন।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' দু'হাত সামনে বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল মিশকিন। পিছিয়ে গেল কয়েক পা। 'পানি বড় ঠাণ্ডা।'

'মাত্র কয়েক মিনিট তুমি টের পাবে তা,' বলল ইব্রাহিম।

'তাছাড়া…আঁ…আঁ…আমি সাঁতার জানি না।'

হাসি হাসি হয়ে গেল ইব্রাহিমের মুখের চেহারা। 'তাহলে তুমি মরতে চাও না, মিশকিন?'

'আসলে…আমি…'

'তাহলে তুমি বাঁচতে চাও?'

দ্বিধান্বিত দেখাল মুচিকে। তোতলাচ্ছে, 'আমি…আ…আমি…'

'বলো। বলে ফেলো, মিশকিন! সত্যি কথা বলাটা কোন অপরাধ নয়।'

'আমি বাঁচতে চাই!' গলা ফাটিয়ে চেঁচাল মিশকিন।

হৈ-হৈ করে উঠল সবাই। মিশকিনের পিঠ চাপড়ে দিতে এগিয়ে এলো সামনে। একজন আবার বেহালায় আনন্দের সুর তুলল।

'জীবন। আহা, জীবন!' চেঁচাল মিশকিন।

ভিড়ের কেউ হৈ-হট্টগোলে খেয়ালই করল না যে মুচির ছেড়ে দেয়া দড়িটা ইব্রাহিমের গলায় আটকে গেছে।

দুলছে জাহাজ। ফলে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর কোন উপায় নেই। পা পিছলে ঝুলে পড়ল ইব্রাহিম। দম আটকে গেল। ওদিকে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ বিজেতা নায়কের মতো স্টিয়ারেজ সেকশনের দিকে ফিরে চলেছে মুচি।

ককিয়ে উঠল ইব্রাহিম। 'আরে, আরে, আমিও তো বাঁচতে চাই!'

কপাল ভাল যে বয়স্কা এক বিধবা মহিলা পেছন ফিরে তাকিয়েছিল। র‍্যাবাইয়ের অবস্থা দেখে চোখ কপালে উঠল তার। 'হায়, ঈশ্বর!' চেঁচিয়ে উঠে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। 'র‍্যাবাই যে মরে যাচ্ছে!'

অজ্ঞান হয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে ইব্রাহিমকে দড়ির ফাঁস খুলে নামানো হলো।

দু'মাস হয়ে গেছে আমেরিকার দিকে এগিয়ে চলেছে জাহাজ।

এক শুক্রবার ইব্রাহিমের গোসল করার পালা এলো। প্রত্যেকেরই সুযোগ আসে সপ্তাহে মাত্র একবার। ইব্রাহিমের গোসলের পালা গত পরশুই শেষ, কিন্তু মিশকিন ওর গোসলটা প্রিয় র‍্যাবাইকে ছেড়ে দিয়েছে। চোখ খুলে দেয়ার পারিশ্রমিক। চমৎকার এক মেয়ের সঙ্গে খাতির হয়ে গেছে মিশকিনের। সেই খুশিতে এমনকি জাহাজের বাবুর্চির সঙ্গে ভাব জমিয়ে আজকে র‍্যাবাইয়ের জন্যে গরম পানির ব্যবস্থাও করেছে সে।

ডেকের সামনের দিকে একটা জায়গা পর্দা দিয়ে ঘেরা। ভেতরে আছে লম্বালম্বি কাটা একটা পানির বড় ব্যারেল। ওই ব্যারেলেই স্নানের ব্যবস্থা।

ব্যারেলে, গরম পানিতে বসে আরাম করে হাড্ডিসার শরীরে সাবান ডলল ইব্রাহিম। কবুতরের বুকের খাঁচার মতো পাঁজর থেকে চিমসে পেট পর্যন্ত দু'ইঞ্চি পুরু ফেনা তুলে ফেলল। ঈশ্বরের চমৎকারিত্বে আপ্লুত হয়ে গেল ওর মনটা। ঈশ্বর কত মহান, সর্বজ্ঞানী যে খাবারের যখন অভাব তখন তিনি সবাইকে সী-সিক বানিয়ে মুখের রুচি মেরে দিচ্ছেন। আবার গোসল যখন করতে হবে ব্যারেলে তখন কি সুন্দর তিনি আগেই শরীরটাকে শুকিয়ে রেখেছেন যাতে চাপাচাপি না করেই ঢোকা যায়।

হঠাৎ চারপাশে হৈ-চৈ শুনতে পেল ইব্রাহিম। চেঁচাচ্ছে সবাই।

'আমেরিকা! আমেরিকা দেখা যায়!'

'ওই যে আমেরিকা!'

'আমেরিকার আলো!'

গোসলখানার পর্দা সরিয়ে এক লোক উঁকি দিল। 'আমেরিকা, র‍্যাবাই! আমেরিকায় এসে পড়েছি আমরা!'

দ্রুত একটা প্রার্থনা সেরেই ডেকে বেরিয়ে এলো ইব্রাহিম। সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেক লোকের বিস্মিত দৃষ্টি ঘুরে গেল তার দিকে।

আমেরিকায় এসে প্রথম দর্শনীয় বস্তু হিসেবে একজন উলঙ্গ র‍্যাবাইকে দেখতে পেল তারা।

ব্যাপার বুঝতে কয়েক মুহূর্ত লাগল ইব্রাহিমের। তারপরই ঝেড়ে দৌড় দিল সে। গোসলখানায় ঢুকে টেনে দিল পর্দা।

সবাই নেমে যাবার পর জাহাজ থেকে নামল ইব্রাহিম। ঢুকল সামনের নিচু, লম্বা বিল্ডিঙে। ওটাই বুকিং কাউন্টার। সান ফ্রান্সিসকোগামী জাহাজের টিকেট কাটতে হবে ওখান থেকে।

পকেট হাতড়ে ঠিকানা লেখা কাগজটা বের করল সে। ওতে লেখা আছেঃ প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন জাহাজ। সান ফ্রান্সিসকো।

কয়েকবার লেখাটা পড়ে মুখস্থ করে নিয়ে কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ইব্রাহিম।

'সান ফ্রান্সিসকোর টিকেট দিন। প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন জাহাজে।'

'আপনি পশ্চিমে যাচ্ছেন?' জানতে চাইল ওর পেছনে দাঁড়ানো লোকটা।

'না। আমি যাব সান ফ্রান্সিসকোয়।' আবার কাউন্টারের দিকে ফিরল র‍্যাবাই, একটা পঞ্চাশ ডলারের নোট সামনে বাড়িয়ে বলল, 'ওয়ান ওয়ে টিকেট, প্লীজ।'

'কোথায় যাবে?'

'ওয়াশিংটন যাব। সান ফ্রান্সিসকো জাহাজে।'

মাথা নাড়ল টিকেট এজেন্ট। 'ওই নামের কোন জাহাজ নেই।'

'অ্যাঁ! নেই?' টাকা এজেন্টের হাতে গছিয়ে পকেট থেকে কাগজটা বের করে নাকের সামনে ধরল ইব্রাহিম। ভুলটা বুঝতে পেরে লজ্জিত হাসি হাসল। বলল, 'আমি দুঃখিত। আসলে ওয়াশিংটন জাহাজের টিকেট চাইছি। সান

ফ্রান্সিসকো যাব।'

নোটগুলো ফিরিয়ে দিল এজেন্ট। 'হবে না।'

ইব্রাহিম ভাবল আবার বোধহয় প্রথম থেকে লেনদেন আরম্ভ করতে চায় এজেন্ট। কাজেই ডলার সামনে বাড়িয়ে বলল, 'ওয়াশিংটনে যাব সান ফ্রান্সিসকো জাহাজে।'

'জাহাজ ছেড়ে গেছে,' জানাল এজেন্ট।

'কি!'

'হ্যাঁ। পরের বোট সামনের মাসে।'

পেছনের লোকটা কাঁধে টোকা দেয়ায় চমক কাটল ইব্রাহিমের। লোকটা জানতে চাইল, 'কি বলছে এজেন্ট?'

'বলছে জাহাজ চলে গেছে।' লাইন থেকে সরে দাঁড়াল ইব্রাহিম।

পেছনের লোকটা কাউন্টারে ঝুঁকে জানতে চাইল, 'সান ফ্রান্সিসকোর জাহাজ চলে গেছে?'

'হ্যাঁ। গতকাল বিকেলে।'

'কিন্তু তা কি করে হয়!'

'আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'কিন্তু আগামী কালকে ছাড়ার কথা ছিল!'

'কথা?' হাসল এজেন্ট। 'এখন আর কোন কথার বালাই নেই। জানো না গোল্ড রাশ শুরু হয়েছে?'

'কিন্তু শিডিউল...'

কথা শেষ করতে দিল না এজেন্ট। 'আর কোন শিডিউল নেই, পরের জাহাজ আগামী মাসে।'

'হায় ঈশ্বর!...তাহলে...তাহলে...' কাঁধ ঝুলে পড়ল লোকটার। ইব্রাহিমকে পাশ কাটিয়েই মাটিতে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। ডুকরে উঠল, 'ঈশ্বর, তুমি বলে দাও এখন আমি কি করব...কিভাবে যাব সান ফ্রান্সিসকো!'

'কি হয়েছে তোমার?' পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে জানতে চাইল ইব্রাহিম। হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমার নাম ইব্রাহিম আশেক।' নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন ও। মানুষের দুঃখ লাঘব করাই তো সত্যিকার ধার্মিকদের কাজ।

ভেজা চোখ তুলে ইব্রাহিমকে দেখল লোকটা। গাল বেয়ে টপটপ করে নেমে এলো অশ্রুবিন্দু। করমর্দন করে ঢোক গিলে বলল, 'আমি ডেরিল ডিগস। আজকেই আমি আর আমার ভাই খবর পেলাম যে আমাদের মা মারা যাচ্ছে।'

'কি হয়েছে তার?'

'নিউমোনিয়া।'

'সান ফ্রান্সিসকো যাবার আর কোন পথ নেই?' কাজের কথায় এলো ইব্রাহিম।

'আমাদের আর কোন উপায় নেই, স্যার।' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ডেরিল। ঢোক গিলে কান্না চেপে বলল, 'মাত্র দশ মিনিট আগে টিকেটের

পয়সা জোগাড় করতে ঘোড়া আর ওয়্যাগনটা বেচে দিয়েছি। ভেবেছিলাম ওয়াশিংটনে চেপে সান ফ্রান্সিসকো যাব। কিন্তু বিধি বাম। তা আর হবার নয়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডেরিল। 'এখন একা…নিঃসঙ্গ মারা যাবে আমার মা।'

নিজের বাবা-মার কথা মনে পড়তেই বুকের ভেতর আঁকড়ে এলো ইব্রাহিমের। উথলে উঠল দুঃখ। আপ্লুত হয়ে গেল মনটা। বলল, 'তুমি যার কাছে ওয়্যাগনটা বেচেছ তাকে বললে সে হয়তো একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। হয়তো ফেরত দেবে ওয়্যাগনটা।'

মাথা নাড়ল ডেরিল। 'না, তা দেবে না। মন গলবে না তার। খুব কড়া মানুষ।'

'কিন্তু তুমি যদি তাকে টাকা ফেরত দেয়ার কথা বলো?'

চিন্তিত দেখাল লোকটাকে। তারপর হঠাৎই আঁকড়ে ধরল ইব্রাহিমের বাহু। দেখে মনে হলো নতুন আশা সঞ্চারিত হয়েছে তার ভেতরে। বলল, 'আপনি আমার হয়ে একটু বলবেন তাকে? প্লীজ, স্যার! আমি ভাল করে কথা বলতে পারি না। কি বলতে কি বলে ফেলব…তাছাড়া কথা বলতে গেলেই মার কথা মনে পড়ছে, কান্না এসে যাচ্ছে আমার। দয়া করে তাকে বলবেন, স্যার?'

লোকটার চেহারা দেখে মায়া হলো ইব্রাহিমের। বলল, 'বেশ, চেষ্টা করে দেখতে পারি। বাকি সব ঈশ্বরের হাতে।'

'আমি চিরঋণী হয়ে গেলাম, স্যার!' ইব্রাহিমের হাত ধরে সামনে বাড়ল ডেরিল। এখন তাকে একটু সুস্থির দেখাচ্ছে।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, আগেই এত আশা করে বোসো না; আমি কিন্তু ভাল করে ইংরেজি বলতে পারি না।' কাঠের বাক্সটা বগলে চেপে তার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল ইব্রাহিম।

ডক এলাকা ছাড়িয়ে সরু একটা গলি ধরে এগোল ওরা। পেছনে পড়ে গেল হল্লারত মাতাল নাবিকের দল।

পথের দু'ধারে দু'তলা তিনতলা ইঁটের বাড়ি। কাঠেরও আছে দু'একটা। ফুটপাথে বাজার বসেছে। ফলফলারি, তরিতরকারি কেনাবেচা হচ্ছে। লোকজনের ভিড় ঠেলে পথ করে এগিয়ে চলল ওরা।

কয়েকটা গলি ঘুরে একটা অন্ধ গলির ভেতরে ইব্রাহিমকে নিয়ে এলো ডেরিল। গলির মাঝামাঝি একটা স্টেবলের আধখোলা দরজা। থামল তার সামনে।

একপাশে রাখা আছে একটা ক্যানভাসের ঘের দেয়া পুরনো ওয়্যাগন। ওটার সামনে ঝিমুচ্ছে দুটো ক্লান্ত চেহারার বুড়ো ঘোড়া।

'এই যে আমাদের ওয়্যাগন আর ঘোড়া,' জানাল ডেরিল।

ওয়্যাগনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে কঠোর চেহারার এক গোঁফওয়ালা শক্তপোক্ত লোক। কুঁচকে রেখেছে ভ্রূ। ডেরিলকে দেখেই জানতে চাইল, 'সবকিছু ঠিক আছে, ডেরিল?'

মাথা নাড়ল ডেরিল। 'জাহাজটা ছেড়ে গেছে।'

'কি!'

'চলে গেছে। এজেন্ট বলল গোল্ড রাশ। গতকালই রওয়ানা হয়ে গেছে জাহাজ।'

বোবার মতো ডেরিলের দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা।

ওয়্যাগনের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো স্টেবল মালিক। ডেরিলকে নড করে ঘোড়ার হার্নেস ঠিক করতে লাগল বুড়ো লোকটা।

'কি করব আমরা এখন?' এতোক্ষণে জবান ফিরে পেল ডেরিলের ভাই।

'ঈশ্বর আছেন আমাদের সঙ্গে, ম্যাট,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল ডেরিল। ইব্রাহিমকে দেখাল। 'ইনি ইব্রাহিম আশেক, একটু আগে এঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। আর, স্যার ইব্রাহিম,' গাঁট্টাগোট্টা লোকটাকে দেখাল ডেরিল, 'এ হচ্ছে আমার ভাই, ম্যাট ডিগস।'

করমর্দন করল দু'জনে।

বুড়ো লোকটার উদ্দেশে ডেরিল বলল, 'মিস্টার জোন্স, মস্ত বিপদ হয়ে গেছে। ছেড়ে চলে গেছে আমাদের বোট।'

'শুনে খুব দুঃখিত হলাম,' নিরাবেগ গলায় বলল বুড়ো। হাতের কাজ থামিয়ে তাকাবারও প্রয়োজন বোধ করল না।

পকেট থেকে টাকা বের করল ডেরিল। 'আপনি যদি টাকাগুলো ফেরত নিয়ে ওয়্যাগন আর ঘোড়া দুটো দিতেন তাহলে মাকে দেখতে সান ফ্রান্সিসকো যেতে পারতাম, মিস্টার জোন্স।'

ম্যাট ডিগস বলল, 'নিউমোনিয়ায় মারা যাচ্ছে আমাদের মা, স্যার।'

বুড়োর ভ্রূ বিছের মতো মোটা। সেগুলো কুঁচকে দু'ভাইয়ের দিকে তাকাল সে। বোঝা গেল বিরক্ত হয়েছে। জানতে চাইল, 'তোমাদের মা মারা যাচ্ছে তাতে আমি কি করতে পারি? ব্যবসায়ী মানুষ আমি। জিনিস কেনাবেচা করে সেই মুনাফা দিয়ে চলি। মুনাফা ছাড়া কোনকিছু বেচব কেন?'

অসহায় দেখাল ডেরিলকে। ভাইয়ের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু আমাদের কাছে বাড়তি কোন টাকা নেই, মিস্টার জোন্স!'

শ্রাগ করল বুড়ো। 'আমি দুঃখিত। কিন্তু সেক্ষেত্রে কোন লেনদেন হবে না।'

এবার কথা বলার সময় এসেছে, সিদ্ধান্ত নিল ইব্রাহিম। বাক্সটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বলল, 'কত টাকা মুনাফা হলে চলে আপনার, মিস্টার জোন্স?'

জোব্বা পরা কংকালসার লোকটাকে আপাদমস্তক দেখল বুড়ো। 'অন্তত একশো পঞ্চাশ ডলার।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডেরিল। 'নাহ্, হলো না, ম্যাট। মাকে দেখতে যেতে পারলাম না আমরা।' ইব্রাহিমের হাতটা ধরে বলল, 'ধন্যবাদ, র‍্যাবাই, অনেক করেছেন আপনি আমাদের জন্যে। আপনার সময় নষ্ট করার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত।' ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে ফুঁপিয়ে উঠল বেচারা। ওকে জড়িয়ে ধরে পা বাড়াল ম্যাট। চলে যাচ্ছে। বুঝে গেছে গলবে না বুড়ো স্টেবল মালিকের পাষাণ হৃদয়।

'তোমরা দাঁড়াও একটু,' ডাক দিল ইব্রাহিম। বুড়োকে বলল, 'বর্তমান

পরিস্থিতি বিবেচনা করে মানবতার খাতিরে কিছু কি কমাবেন না আপনি? ধরুন...তিরিশ ডলার? তাতে চলবে আপনার? যদি রাজি থাকেন এখুনি নগদ দিয়ে দিতে পারি আমি।'

ইতস্তত করে থেমে দাঁড়াল দু'ভাই।

বুড়ো বলল, 'পঁচাত্তর হলে দিতে পারি ওয়্যাগন।'

কোটের পকেট থেকে পঞ্চাশ ডলার বের করল ইব্রাহিম। 'এ-ই বড়জোর দিতে পারি আমি। বাকি টাকা ইমিগ্রেশন সোসাইটিতে ফেরত দিতে হবে।'

একমুহূর্ত চিন্তা করল বুড়ো। তারপর ছোঁ মেরে নিয়ে নিল নোটটা।

ডেরিল বলল, 'আপনার অনেক দয়া, র‍্যাবাই। কিন্তু আমি জানি না কি করে এই ঋণ শোধ করব। তারচেয়ে নাহয়...'

হাত তুলে তাকে থামাল ইব্রাহিম। 'চিন্তা কোরো না, এই টাকা তোমাদের শোধ করতে হবে না। মানুষের জন্যে এতটুকু যদি করতে না পারি তাহলে নিজেকে মানুষ ভাবব কি করে!'

'ওয়্যাগনের সীটে কুশন পেতে আপনার বসার ব্যবস্থা করে দেব।' কৃতজ্ঞ হাসল ডেরিল।

'আপনাকে নিরাপদে সান ফ্রান্সিসকো পৌঁছে দিয়ে তবে আমাদের স্বস্তি,' বলল ম্যাট।

'কুশনটা আমরা সবাই মিলে ব্যবহার করব,' খুশি হয়ে জানাল ইব্রাহিম।

'ম্যাট,' বলল ডেরিল, 'ঈশ্বর আজকে আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।'

সায় দিয়ে মাথা দুলিয়ে হাসল ম্যাট।

বাকি টাকা বুড়োকে দিয়ে ওয়্যাগনটা যাত্রার উপযোগী করতে লেগে পড়ল দু'ভাই।

ঈশ্বর আজকে ওকে দিয়ে মহৎ একটা কাজ করিয়েছেন, কাজেই রাস্তায় হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসল ইব্রাহিম।

চারজনই মহাখুশি।

স্বয়ং ঈশ্বরও বুঝি হাসলেন। শুধু তিনিই জানেন অদূর ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে।

তিন

গোল্ড রাশ শুরুর এই কিছুদিন আগেও ইয়ারবা বুয়েনায় সাতশো লোকের বাস ছিল। তাদের অর্ধেক ছিল সাদা আমেরিকান। পরবর্তী মাত্র তিন বছরেই সাগর আর স্থল পথে চল্লিশ চল্লিশ আশি হাজার লোক এসে হাজির হলো।

হু-হু করে বেড়ে গেল সবকিছুর দাম। এখন একটা ডিমের দাম এক ডলার। পোর্টাররা একটা ব্যাগ বহন করার জন্যে দু'ডলার করে নেয়। এক

ঢোক মদ খেতে হলে দিতে হয় একচিমটে সোনার গুঁড়ো।

শহরে আইন-শৃঙ্খলার বালাই নেই; খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি-রাহাজানি লেগেই আছে।

নতুন আগতদের মধ্যে বেন্ডার পরিবারও এসেছিল। কিন্তু আর সবার মতো প্রসপেক্টিঙে মেতে গেল না তারা। এই পরিবারের প্রধান স্যামুয়েল বেন্ডার বুঝতে পেরেছিল যে গোল্ড রাশ শেষ হলে মাইনাররা ছাড়া আর সবাই বড়লোক হয়ে যাবে। সেজন্যেই দোকান আর হোটেলের ব্যবসা খুলল সে। এখন বেন্ডারদের পাঁচটা স্টোর, দুটো হোটেল আর একটা ওয়্যার হাউজ আছে।

পর্যাপ্ত প্রাচুর্য আসতেই ধর্ম-কর্মের দিকে মন গেল পরিবার প্রধানের। সমমনা আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ সেরে ইজরাইলে চিঠি পাঠাল র‍্যাবাই চেয়ে।

আজকে সে-বিষয়ে আলোচনার জন্যেই স্যামুয়েল বেন্ডারের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা। মোট বারো জন। তাদের মধ্যে ইদ্দিশ, পোলিশ, রাশিয়ান আর জার্মান ভাষাভাষীও আছে।

টেবিলের একমাথায় পিঠ সোজা করে বসে আছে স্যামুয়েল বেন্ডার।

আইজাক বিয়ালিক নামের টাক মাথা এক রোগা লোক বক্তব্য শুরু করল:

'আপনারা অবগত আছেন যে র‍্যাবাই চেয়ে যে-চিঠি দেয়া হয়েছিল জবাব এসেছে সে চিঠির। আমরা এখন অপেক্ষা...

স্যামুয়েল বেন্ডারের মন নেই বিয়ালিকের কথায়। ভাবুক চেহারায় বড় মেয়ে সারার দিকে চেয়ে আছে সে।

চা পরিবেশন করছে সারা।

দেখতে শুনতে মেয়েটা তেমন ভাল না হলেও দেহসৌষ্ঠব অত্যন্ত আকর্ষণীয়। শহরের যুবাসমাজের প্রায় সবাই ওর সঙ্গে খাতির জমাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু পাত্তা পায়নি। নিজেকে অধরা করে রেখেছে মেয়েটা নির্লোভ একজন ধার্মিক এবং বিদ্বান স্বামী পাবে এই আশায়। অবশ্য এটা ওর বাবার ধারণা। সারা নিশ্চয়ই এমন মানুষকেই স্বামী হিসেবে চাইবে যে ওর বাবার টাকার লোভ করবে না।

আসলে চালু মেয়ে সারা। কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে তা দু'কান হবার জো নেই।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে বুকটা গর্বে ভরে গেল স্যামুয়েলের। জেরুজালেমের যে স্কুল থেকে র‍্যাবাই আসছেন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে চিঠিতে ঠিক হয়েছে—তরুণ র‍্যাবাই এসে পৌঁছলেই তাঁর সঙ্গে সারার বিয়ে দেয়া হবে। এটা একটা বিরল পারিবারিক সম্মান। মেয়ের ছবিও পাঠিয়ে দিয়েছিল সে। জেরুজালেম থেকে আসা চিঠিতে জানা গেছে নতুন র‍্যাবাই ইব্রাহিম আশেকের এই বিয়েতে অমত নেই। ছবি দেখে মেয়ে পছন্দ করেছেন তিনি।

আজকের মীটিঙেই এই শুভ সংবাদ সবাইকে জানাবে বলে ঠিক করেছে স্যামুয়েল বেন্ডার।

এদিকে সারার চা পরিবেশন প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। জুলিয়াস রোজেনশাইনের সামনে বাকিদের তুলনায় খানিকটা বেশি সময় থামল সে। দু'জনের দৃষ্টি এক হতেই সারার গালে লালের ছোপ পড়ল। সন্দেহ নেই মেয়েটা জুলিয়াসের প্রতি দুর্বল।

জুলিয়াস রোজেনশাইন বিদ্বান নয়, তবে অত্যন্ত সুদর্শন। আর্থিক দিক থেকেও যথেষ্ট সচ্ছল। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক হিসেবে সমাজে একটা পরিচিতি গড়ে তুলেছে সে। ছয় জন ওরা। জুলিয়াসই সবার বড়।

জুলিয়াসের প্রতি সারার অতি মনোযোগ দৃষ্টিকটু দেখাবার আগেই ওর ছোট বোন রোজি সারাকে কোমরে গুঁতো দিয়ে সংবিৎ ফিরে পেতে সাহায্য করল। ব্যাপারটা লক্ষ করে গম্ভীর হয়ে গেল স্যামুয়েল বেন্ডার। সে মোটেও চায় না সারা ওই অশিক্ষিত ছোকরার চারপাশে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াক।

এরপর বিয়ালিককে চা পরিবেশন করল সারা। বক্তৃতা শেষ করে বসে পড়ল বিয়ালিক। এবার বেন্ডারের পালা।

'আমরা আজ সকালে একটা শুভ সংবাদ পেয়েছি,' শুরু করল বেন্ডার। 'আপনারা জানেন যে র‍্যাবাই আসছেন। কথা মতো বোধহয় ভিলেন্সা থেকেই রওয়ানা হয়েছেন তিনি। তবে শুধু এ কথা বলার জন্যেই আজ আমি আপনাদের নিমন্ত্রণ করিনি। আজ আমার পরিবারের জন্যে বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। আপনারা জেনে সুখী হবেন যে র‍্যাবাই ইব্রাহিম আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সারাকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছেন। আসুন আমরা সবাই ঈশ্বরের কাছে দু'জনের সুখ কামনা করি।'

মেঝেতে পড়ে গেল সারা বেন্ডারের হাতের ট্রে, ঝনঝন করে ভাঙল কাপ-ডিশগুলো। চোখে অভিযোগ নিয়ে বাবার দিকে তাকাল সারা। 'বাবা...'

'এখন নয়, সারা!' তাকে কড়া গলায় থামিয়ে দিল স্যামুয়েল।

গোমড়া মুখে মেঝে থেকে ভাঙা চিনেমাটির টুকরো তুলতে লাগল সারা। রোজি সাহায্য করল ওকে। বুকের ভেতর প্রতিবাদের ঝড় উঠল সারার। কেন বাবা বুঝতে চায় না যে এটা আমেরিকা, এখানে বাবা-মা কখনোই ছেলে-মেয়ের বিয়ে ঠিক করে না। নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খুঁজে নেয় সবাই। বাবা বুঝতে চায় না যে তার নিজের বিয়ে অভিভাবকদের পছন্দ মতো হয়েছিল বলেই এমন কোন কথা নেই যে পরবর্তী প্রজন্মকেও একই নিয়ম মেনে চলতে হবে। ঠিক আছে, বাবা চায় শিক্ষিত কারও সঙ্গে ওর বিয়ে হোক। তেমন লোকের তো কোন অভাব নেই। তাছাড়া স্বামীকে বিদ্বানই বা হতে হবে কেন? যতবারই ও যুক্তি দেখাতে গেছে, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে শুনেছে বাবা। ওর কথা শেষে বলেছে, 'তাওরাত পড়োনি? দেখোনি ওতে কি লেখা আছে? ঈশ্বর বলেছেন, যদি বাধ্য হও তাহলে তোমার যা কিছু আছে সব বেচে দাও, তবুও তোমার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করো শিক্ষিত কারও সঙ্গে।' র‍্যাবাই ইব্রাহিম বিয়েতে রাজি হওয়ায় আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে বাবা। কিছুতেই এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাতে রাজি নয়।

এদিকে মেয়ের মনোভাব বুঝে ভেতরে ভেতরে খানিকটা নরম হয়ে গেছে স্যামুয়েল। ঠিক করেছে আপাতত পারতপক্ষে মেয়েকে আর ঘাঁটাবে না। তাছাড়া আরও একটা চিন্তা তার মাথায় দোলা দিয়ে গেছে। হতে পারে রোজেনশাইন শিক্ষিত নয়, কিন্তু এটাও মিছে নয় যে ছোকরা সারার ব্যাপারে বেশ উৎসাহ দেখাচ্ছে। টাকা-পয়সা আছে, তাছাড়া ছেলে দেখতে শুনতেও ভাল, এর সঙ্গে যদি মেয়ের বিয়ে বাধ্য হয়ে দিতেই হয়, তাহলে দিতে আপত্তি কোথায়? স্বয়ং ইয়াকুব নবী অশিক্ষিত ছিলেন। মোম বিক্রি করে দিনাতিপাত করতেন। কিন্তু তাই বলে মানুষ হিসেবে কি তিনি নগণ্য ছিলেন? মোটেও নয়। তবে স্যামুয়েল আশা ছাড়েনি, একথা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে র‍্যাবাইকে মেয়ে জামাই করে পেলে স্বর্গলাভ একেবারে নিশ্চিত। সেই বিবেচনায় রোজেনশাইন তো খোঁয়াড়ের কাদামাখা শুয়োর!

উপস্থিত সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে জেরুজালেম থেকে আসা চিঠিটা জোরে জোরে পড়তে লাগল স্যামুয়েল বেন্ডার।

ছ'ঘণ্টা হলো ঘাসে ছাওয়া ঢেউ খেলানো সবুজ প্রান্তর ধরে গড়গড়িয়ে ছুটে চলেছে ওয়্যাগনটা।

মিনিট পনেরো হলো অবাক হয়ে ইব্রাহিমের প্রার্থনা শুনছে ডেরিল। কোন ভাষা তা বুঝতে পারছে না। তবে র‍্যাবাইয়ের ভক্তি দেখে মনে হয় স্বয়ং ঈশ্বরের সামনে বসে গুণকীর্তন করছে।

ভবিষ্যতের কথা ভেবে ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধা অনুভব করল ডেরিল।

পাঁচ মিনিট পর থামল প্রার্থনা। বাক্সের ভেতর বাইবেল আর কোরানের পাশে যত্ন করে তাওরাতটা রাখল ইব্রাহিম।

'আপনার দোয়া পড়া শেষ?' হাতের আপেলটায় কামড় দিয়ে জানতে চাইল ডেরিল।

'আপাতত।'

কি যেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল ডেরিল।

ব্যাপারটা খেয়াল করল ইব্রাহিম। মাস কয়েক আগে এইরকম এক পরিস্থিতিতে প্রধান র‍্যাবাই ওকে যা বলেছিলেন হুবহু তা আওড়াল ও, 'কিছু জিজ্ঞেস করবে? মনে কোন প্রশ্ন রেখো না। মনে প্রশ্ন রাখলে শিখবে কি করে? কি ভাবে আসবে প্রকৃত মহাজাগতিক জ্ঞান?'

'আমি জানতে চাই দোয়া পড়ার সময় আপনি আমাদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন কেন।'

'কারণ দোয়া পড়ার সময় জেরুজালেমের দিকে ফিরে পড়তে হয়। জেরুজালেম হচ্ছে আমাদের জন্যে প্রতিশ্রুত ভূমি।'

'তারমানে অনেকটা ক্যালিফোর্নিয়ার মতো?' জানতে চাইল ম্যাট।

মাথা দোলাল ইব্রাহিম। 'তা বলতে পারো।'

'আপেল খাবেন?' সাধল ডেরিল।

'দাও।'

আপেলে কামড় দিয়ে কোটের পকেট থেকে একটা ছবি বের করল ইব্রাহিম। ছবিটা বেন্ডার পরিবারের। সারা বেন্ডারের ওপরে একটা ক্রস চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে কার সঙ্গে ওর বিয়ের কথা ঠিক হয়েছে।

'আপনার পরিবার?' জানতে চাইল ডেরিল।

মাথা নাড়ল ইব্রাহিম।

গলা সামনে বাড়িয়ে ছবিটা গভীর মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করল ডেরিল। শিস দিয়ে বলল, 'অন্য মেয়েটা দেখতে সুন্দরী হলেও ওই ক্রস চিহ্ন দেয়া মেয়েটার ওপর দিকটা...ওফ্ কি বলব!'

একটু গম্ভীর হয়ে গেল ইব্রাহিম। হবু বউ সম্বন্ধে এধরনের অশালীন মন্তব্য সহজ ভাবে মেনে নিতে পারল না।

সামনে দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে ট্রেইল। ওয়্যাগনটা ডানদিকের ট্রেইলে পরিচালিত করল ম্যাট। ইব্রাহিম চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাতেই বলল, 'শর্টকাট। এদিক দিয়ে গেলে চারদিন আগেই আমরা সান ফ্রান্সিসকো পৌঁছে যাব।'

ট্রেইলের দু'পাশে এখানে পাইনের জঙ্গল। ফাঁকে ফাঁকে জন্মেছে প্রিকলি পেয়ার, চোলা আর মেসকিটের ঝোপ। ইব্রাহিম জানল না শহরে যার কাছ থেকে ওয়্যাগন কিনেছে, সেই বুড়ো লোকটা একটা গাছের আড়াল থেকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

জঙ্গলের খানিকটা ভেতরে ঢুকতেই ঘোড়ায় চড়ে পিছু নিল লোকটা। ওয়্যাগনের পিছনে এসেই লাফ দিয়ে উঠে এলো পাটাতনে। ইব্রাহিম চমকে গিয়ে তাকাতেই চেপে ধরল ওর ঘাড়। বুড়ো হলেও জোর আছে লোকটার গায়ে। আঙুলগুলো ঢুকে যেতে চাইল ইব্রাহিমের ঘাড়ের মাংসের ভেতরে।

'করেন কি, করেন কি!' আর্তনাদ ছাড়ল ইব্রাহিম। মুখ থেকে খসে পড়ল আপেলটা।

কে শোনে কার কথা, র‍্যাবাইয়ের চোয়ালে দড়াম করে এক ঘুসি বসিয়ে দিল বুড়ো। ইব্রাহিমের মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল আপেলের টুকরোগুলো।

এদিকে থেমে গেছে ওয়্যাগন। তৈরি হয়ে আছে ডেরিল আর ম্যাট, বুড়ো একা না পারলে সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

রোগা পাতলা লোক ইব্রাহিম, গায়ে তেমন জোরও নেই, ফলে সহজেই ওকে মেঝেতে পেড়ে ফেলতে পারল বুড়ো। বুকের ওপর হাঁটু রেখে চেপে বসে থাকল।

কিছুক্ষণ উঠে বসার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল ইব্রাহিম।

এবার হাত লাগাল ডেরিল। অসহায় শিকারের জুতো জোড়া খুলে নিল সে। মোজা খুলতে খুলতে ভাইকে বলল, 'এখানেই টাকা লুকিয়ে রাখে ইহুদি ব্যাটারা।'

'ননন.' আপত্তি জানাল ইব্রাহিম। বোঝাতে চাইল ওর মোজায় টাকা নেই।

'ধুশ্ শালা।' স্বগোতোক্তি করল ডেরিল। মোজা খুলে কিছুই পায়নি। 'এ

ব্যাটা তো পথের ফকির দেখছি!'

বড় বড় চোখে বিস্ময় নিয়ে ডেরিলের দিকে তাকাল ইব্রাহিম। 'ছেড়ে দাও আমাকে! এসব কি করছ!'

জবাবে ওর চোয়ালে গায়ের জোরে ঘুসি বসাল হতাশ ডেরিল।

এক ঘুসিতেই অজ্ঞান হয়ে গেল ইব্রাহিম।

কোটের পকেট থেকে টাকার থলে বের করে নিয়ে র‍্যাবাইয়ের দেহটা ওয়্যাগনের পেছন দিয়ে ফেলে দিল বুড়ো।

বুড়োর ঘোড়া ওয়্যাগনের পাশে থেমে পড়েছে। ওটায় চেপে হাতের ইশারা করে সামনে বাড়ল ডেরিল। পেছন পেছন চলল ওয়্যাগন। ঘুরপথে আবার শহরে ফিরে চলেছে। নতুন মক্কেল ধরতে হবে।

টাকা গুনে দেখে হতাশ হলো বুড়ো। বৃথা গেছে দিনটা, আজকের দাঁও মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। মাত্র দেড়শো ডলার। তিনজন আলাপ করে ঠিক করল ভবিষ্যতে কোন ইহুদিকে হালকা করার পরিকল্পনা করলে আগেই জেনে নিতে হবে লোকটা র‍্যাবাই কিনা। র‍্যাবাই হলে তাকে ফাঁদে না ফেলাই দেখা যাচ্ছে লাভজনক।

বিশ মিনিট পর চেতনা ফিরল ইব্রাহিমের। প্রথম কয়েক মুহূর্ত ও বুঝতেই পারল না কোথায় রয়েছে, কি হয়েছে ওর। তারপর মনে পড়ল সবকিছু। মরে যায়নি বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল ঈশ্বরের কাছে। মন থেকে ক্ষমা করে দিল শয়তান লোকগুলোকে। ঈশ্বর যা করেন ভালর জন্যেই করেন একথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যায় না কখনও ও।

হাঁটতে লাগল ইব্রাহিম। মুখ কুঁচকে রেখেছে। খালি পায়ে বিঁধছে ছোট ছোট কাঁকর। এখন বুঝতে পারছে ওর সঙ্গে অভিনয় করেছিল ডেরিল, ম্যাট আর বুড়ো। বোকার মতো ওদের কথা বিশ্বাস করে আজকে ওর এই দুরবস্থা। অতে কি, হাঁটার গতি বাড়াল ইব্রাহিম, ঈশ্বর যা করেন ভালর জন্যেই করেন।

ওয়্যাগনের চাকার দাগ ধরে আধমাইল এগোনোর পর জুতো জোড়া পেল ও। ওগুলো এতই পুরনো যে ডাকাতরা নেয়নি। ওই একই কারণে কয়েকশো গজ দূরে পেল বাকি চোপড় চোপড়। পনেরো মিনিট পরে একটা ঝোপের পাশে পাওয়া গেল ওর বাক্স।

দামী তেমন কিছু না পেয়ে শেষ পর্যন্ত জিনিসটা ফেলে যাওয়াই মনস্থ করেছে ডাকাতের দল। ভেবে দেখল ইব্রাহিম, একেবারে অসহায় হয়ে পড়েনি ও। ওর আন্ডার প্যান্টের গোপন পকেটে আছে লুকিয়ে রাখা বারো ডলার। ভাগ্যিস লোকগুলো টের পায়নি। একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়নি সে। এখনও ভরসা আছে, হয়তো সান ফ্রান্সিসকো পৌঁছাতে পারবে সে।

কিন্তু, তবু মনের মাঝে শান্তি পাচ্ছে না ইব্রাহিম। ভয় লাগছে ওর। সুটকেসটা খুলে যদি দেখে ওর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ধর্মীয় বইগুলো নেই, তাহলে? বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব করছে ইব্রাহিমের। কাঁপা হাতে সুটকেসের ডালা ওপরে তুলল সে। বড় করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। না, আছে; অপ্রয়োজনীয়

মনে করে বইগুলো নেয়নি ডাকাতের দল। তবে মস্ত বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেছে। প্রধান র‍্যাবাইয়ের দেয়া রুপোর পাতে লেখা টেন কমান্ডমেন্টটা নেই। তবু যা পাওয়া গেছে তাই বা কম কি? হাঁটু গেড়ে পথের ওপর বসে ঈশ্বরের জয়গান গাইল সে বেসুরো গলায়। আবেগের তাড়নায় দু'চোখ দিয়ে দরদর করে গাল ভাসিয়ে নেমে এলো অশ্রু।

পাঁচ মিনিট পর বাক্সটা কাঁধে ঝুলিয়ে হাঁটতে লাগল ইব্রাহিম। সামনে কোথাও নিশ্চয়ই জনবসতি আছে। সেখানে পাওয়া যাবে পথের হদিস।

বিকেল হয়ে গেল, তবু কোথাও কোন বাড়ি ঘর দেখতে পেল না ও। এদিকে খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে পেট।

সন্ধের পর কপাল খুলল। দূর থেকে দেখতে পেল দপদপ করে জ্বলছে একটা অগ্নিশিখা।

হাঁটার গতি বেড়ে গেল ওর। মানুষের দেখা পাবার আনন্দে দৌড়াতে শুরু করল এক সময়।

কাছে এসে দেখল একটার পেছনে আরেকটা ওয়্যাগন রেখে বড় একটা বৃত্ত তৈরি করেছে এক দল অভিযাত্রী। মাঝখানে জ্বলছে আগুনটা। ওটাকে ঘিরে বসে আছে পনেরো বিশ জন লোক।

একটা ওয়্যাগনের পেছনের ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকল ইব্রাহিম।

ওকে দেখে নিরাসক্ত চেহারায় তাকাল লোকগুলো। তাদের মাঝখানে একটু আলাদা হয়ে বসে আছে বয়স্ক একজন লোক। ভাবগাম্ভীর্য দেখে তাকেই দলের নেতা বলে মনে হয়। তামাকের কষ মাখা কালচে এক মুখ থুতু থোঃথোঃ করে আগুনে ফেলল লোকটা।

তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ইব্রাহিম। হড়বড় করে বলতে লাগল কি ঘটেছে ওর ভাগ্যে।

চুপচাপ শুনল লোকগুলো। ওকে বসতে বলা হলো না। একবারও বাধা দেয়া হলো না কথায়।

'আমি কি করব এখন?' কথা শেষে জানতে চাইল ইব্রাহিম।

'টাকা আছে?' এতক্ষণে মুখ খুলল বয়স্ক লোকটা।

'হ্যাঁ।'

চকচক করে উঠল বুড়োর চোখ। 'কত?'

'বারো ডলার।'

'মাত্র!' হতাশ দেখাল বুড়োকে। 'তাহলে তো তোমার কিছুই করার নেই দেখছি। আবার নিউ ইয়র্কে ফিরে গিয়ে দেখো লোকগুলোকে ধরতে পারো কিনা।'

'জায়গাটা চিনলে তাই করতাম। কিন্তু এত বড় শহর যে মাথা গুলিয়ে গেছে। কিছুতেই ওদের আস্তানা খুঁজে পাব না।' কঠোর চেহারার লোকগুলোর ওপরে ঘুরে এলো ইব্রাহিমের দৃষ্টি। খাবার চাইবে কিনা ভেবে ঠিক করতে পারল না। খিদে! বড় খিদে! 'আচ্ছা,' একটা চিন্তা মাথায় আসতেই বলল সে, 'আমি যদি তোমাদের সঙ্গে যাই তাহলে কোন লোকালয়ে তো পৌঁছে যাব,

তাই না? দল বেঁধে নিশ্চয়ই কোন শহরে যাচ্ছ তোমরা?'

'অরিগন।'

'আরে, আমিও তো ওদিকেই যাব। সান ফ্রান্সিসকোতে। তোমরা আমাকে সঙ্গে নেবে?'

মাথা নাড়ল বুড়ো। 'তোমাকে আমরা বিশ্বাস করি না। তাছাড়া আমাদের সঙ্গে মহিলারা রয়েছে। আমাদের পক্ষে তোমাকে সঙ্গে নেয়া সম্ভব নয়।'

'আমি যদি তোমাদের পেছনে পেছনে আসি?' মরিয়া হয়ে জানতে চাইল ইব্রাহিম।

'আসতে পারো, যদি ওয়্যাগনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারো।'

'আমাকে একটা ঘোড়া ধার দেয়া যাবে?'

'না।' তামাকের কষ আগুনে ফেলল বুড়ো। 'তবে তার চেয়ে ভাল একটা ব্যবস্থা করতে পারি। বারো ডলারে একটা ঘোড়া কিনতে পারো তুমি ইচ্ছে করলে।'

বুড়োর সঙ্গীদের কেউ কেউ চোখের ইশারায় সাবধান করল, বুঝতে পারল না ইব্রাহিম।

কথায় কথায় জানা গেল বিনে পয়সায় এখানে খাবার জুটবে না। ঠেকে শিখছে দ্রুত, ফলে অনেক দরদাম করে ঘোড়াটা শেষ পর্যন্ত সাত ডলারে কিনল ইব্রাহিম। তিন ডলারে কিনল খানিকটা করে ময়দা, বীন, চাল, আলু, কফি, লবণ আর চিনি। বাকি টাকা বিপদে লাগতে পারে ভেবে রেখে দিল কোটের পকেটে।

ঘোড়াটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে বটে, তবে ও নিয়ে চিন্তা নেই ইব্রাহিমের, বুড়ো বলেছে এটা ছিল রেসের ঘোড়া–নিউ ইয়র্কে পরপর তিন বছর রেসে জিতেছিল।

ঘোড়ার নাম চ্যালেঞ্জার রাখল ইব্রাহিম। নাকে হাত বুলিয়ে আদর করে পোষও মানিয়ে ফেলল অবিশ্বাস্য কম সময়ে। এর একটা কারণ হতে পারে যে বাপের জন্মে এত আদর পায়নি ঘোড়াটা কারও কাছে। আসলে ওটা ঘোড়াই নয়। কিন্তু ইব্রাহিম জানে না সেটা। খচ্চর আর ঘোড়ার চেহারায় পার্থক্য আছে কি নেই তা র‍্যাবাইয়ের জানার কথাও নয়।

ইব্রাহিম টেরও পেল না মুখে যত প্রশংসাই করুক মনে মনে ঠগ বুড়ো বিশ্বাস করে এক কালে ভাল খচ্চর থাকলেও এতো কাজ ওটাকে দিয়ে করানো হয়েছে যে চ্যালেঞ্জারের চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা পুরোপুরিই তিরোহিত হয়েছে। সেজন্যেই ওটাকে মাত্র সাত ডলারে ছেড়ে দিয়েছে সে।

বুড়োর সঙ্গে কথা বলে ঠিক হলো পরদিন কাক ভোরে ওয়্যাগন ট্রেইনের সঙ্গে রওয়ানা হবে ও।

পরবর্তী দুটো দিন মরমন অভিবাসীদের পেছনে এগোল ইব্রাহিম। মনে ওর আশা জাগল যে দেরিতে হলেও একদিন না একদিন ঠিকই সান ফ্রান্সিসকো

পৌঁছে যাবে ও। বেশি ভালবাসেন বলেই কিনা কে জানে, যখনই ইব্রাহিম ভাবে এক, ঈশ্বর করে দেন আরেক। এবারও বুঝি মুচকি হাসলেন ঈশ্বর।

তৃতীয় দিন বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল ওর। চোখ রগড়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখল ওয়্যাগন ট্রেইন নেই। ওর খোঁড়া ঘোড়া শুধু বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে অনুগত ভৃত্যের মতো।

গত রাতে ধুলোময় এক সুপ্রশস্ত প্রান্তরে ক্যাম্প করেছিল ওরা। রাতে বেশ বাতাস ছেড়েছিল। খুশি হয়েছিল ইব্রাহিম ঝিরঝিরে বাতাসে ঘুমাতে পারবে ভেবে। কে জানত সেই বাতাস এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে! এখন খুঁজতে গিয়ে কোথাও কোন ট্রেইল খুঁজে পেল না ইব্রাহিম। চারপাশে ধু-ধু বালিয়াড়ি। ভয়ে দুরুদুরু করতে লাগল ইব্রাহিমের বুকের ভেতর। আসল ক্ষতিটা এতোক্ষণে চোখে পড়েছে ওর।

রাতে ওকে একা পেয়ে দল বেঁধে হানা দিয়েছিল এক পাল র‍্যাকুন। মড়ার মতো ঘুমিয়েছে ইব্রাহিম। আর সেই সুযোগে ওর খাবার দাবারের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছে ওগুলো। খেয়েছে যত, ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্ট করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি। ওগুলো আর কোন কাজেই আসবে না। তবু বাঁচতে হলে খাদ্য দরকার। যতটা সম্ভব বালি থেকে খুঁটে তুলল ইব্রাহিম।

'আমরা হারিয়ে গেছি রে, চ্যালেঞ্জার, বুঝলি?' খচ্চরটাকে বলল ও। 'তোর উচিত ছিল আমার খাবারগুলো পাহারা দেয়া।'

জবাবে দাঁত দেখাল খচ্চরটা। ভেবেছে তাকে বীন দেয়া হবে।

'এতে হাসির কিছু নেই।' শাসন করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ইব্রাহিম। ভেবে নিয়ে বলল, 'তবে ভয় পাব না আমরা। জানিই তো সূর্য পুবে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায়। সূর্যাস্তের দিকে এগোব আমরা, ঠিক আছে?'

ছয় দিনের দিন ম্যাকিনও বোটে চেপে সেন্ট লুইসের উত্তরে মিসিসিপি নদী পেরল ও। আমেরিকান নয় বলে পঁচিশ সেন্টের বদলে ওকে বোটের ভাড়া দিতে হলো পঁচাত্তর সেন্ট। তারপরও হাতে যা আছে তা দিয়ে কিছু শুকনো কর্ন কেক, কয়েক টিন বীন আর ওর ঘোড়ার জন্যে আধ বেল খড় কিনল ও ফেরিঘাটের দোকান থেকে।

চার দিনের দিন শেষ হয়ে গেল ওর কেনা খাবার।

সেদিন বিকেলে হাঁটু সমান ঘাসে ছাওয়া লালচে-খয়েরী প্রেয়ারির বুকে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল ওর চোখে। গায়ের রং এমনই যে প্রেয়ারির সঙ্গে প্রায় মিশে আছে। খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে গলা বাড়িয়ে সামনে তাকাল ও। গভীর মনোযোগে দেখার চেষ্টা করল কি ওটা। কিছুক্ষণ পর বুঝল ওটা একটা পাখি। চোখের সামনে ভেসে উঠল পাখির গরম গরম রোস্ট।

প্রেয়ারি চিকেনটাকে ধরতে হামাগুড়ি দিয়ে অতি সাবধানে এগোল ইব্রাহিম। মনে মনে ভাবল, ছোট একটা মাথা, কতই বা বুদ্ধি ধরবে? চট করে গিয়ে যদি ঝট করে চেপে ধরা যায় তাহলেই রাতের খাওয়া নিশ্চিন্দ।

কিন্তু অত সহজ নয়। ইব্রাহিমকে বেকায়দা ভঙ্গিতে কাছে আসতে দেখেই সতর্ক হয়ে গলা উঁচু করে তাকাল ওটা।

'বাহ, বাহ, কি সুন্দর লক্ষ্মী মুরগি তুমি,' আদর মাখা গলায় বলল ইব্রাহিম। মুখ দিয়ে চুক চুক শব্দ করতেই দু'পা পিছিয়ে গেল প্রেয়ারি চিকেন। 'এই যে খাবার, এসো, এসো,' মৃদু স্বরে বিড়বিড় করছে র‍্যাবাই, 'ঈশ্বরের শপথ, তোমায় কিছু বলব না।' এক হাতে কান ধরে মনে মনে বলল, 'মাপ করে দাও, ঈশ্বর, পেটে বড় খিদে তো তাই মিছে কথা বলছি।'

ঈশ্বরই বোধহয় প্রেয়ারি চিকেনটাকে সাবধান করে দিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়েই ঝেড়ে দৌড় দিল ওটা।

'চিক চিক চিক চিক চিকি চিকি চিকি চিক!' শিকার হাওয়া হয়ে যাচ্ছে দেখে পেছনে ছুটল ইব্রাহিম। হতাশ হয়ে চেঁচাচ্ছে, 'আরে এটা কি হচ্ছে! দৌড়াচ্ছ কেন, বললাম তো তোমায় কিছু বলব না!'

দশ গজ পেছনে পড়ে যেতেই দৌড় থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ইব্রাহিম। হাতের মুঠি উঁচিয়ে চেঁচাল, 'তোকে কি আর খেতাম রে, বোকা মুরগি!'

ওর কথা শোনার জন্যে থেমে নেই, ততোক্ষণে একশো গজ দূরে ঘন ঘাসের আড়ালে চলে গেছে মুরগিটা।

খচ্চরটার কাছে ফিরে এলো ইব্রাহিম। ওটাকে আড় চোখে ওর দিকে তাকাতে দেখে ইজ্জত বাঁচানোর জন্যে বলল, 'কাছ থেকে দেখে ওটাকে তেমন সুবিধের মনে হয়নি, তাই ছেড়েই দিলাম।'

চিঁহি চিঁহি করে উঠল চ্যালেঞ্জার। ইব্রাহিমের সন্দেহ হলো অবিশ্বাসের হাসি হাসল বোধহয়।

সন্ধেয় ওসেজ রিভারের একটা অপরিসর শাখায় কোমর সমান পানিতে নামল ইব্রাহিম। হাতে ভাঙা ডাল দিয়ে তৈরি একটা বর্শা। আশপাশ দিয়ে সাঁতরে বেড়াচ্ছে বড় বড় মাছ, কিন্তু কেন যেন গাঁথা যাচ্ছে না একটাকেও। ইব্রাহিম জানে না পানিতে আলো বাঁকা হয়ে ঢোকে, ফলে বর্শা ছুঁড়ে সফল হতে হলে কতটুকু বাঁকা করে ছুঁড়তে হবে সেই আন্দাজটা জানা থাকা চাই।

আধ ঘণ্টা একটানা পরিশ্রম করার পর ক্লান্ত হয়ে গেল ইব্রাহিম, একটা মাছও বর্শায় তুলতে পারল না।

শেষ বারের চেষ্টা হিসেবে ওর কোমরের কাছে ঘুরঘুর করতে থাকা একটা পেট মোটা লোভনীয় চেহারার ট্রাউটের দিকে বর্শা ছুঁড়ল ইব্রাহিম। এবারও ফলাফল আগের মতোই হতাশাব্যঞ্জক। লেজের বাড়িতে ওর মুখে পানি ছিটিয়ে দূরে সরে গেল মাছটা।

দু'হাত আকাশে তুলে ভাঙা গলায় বলে উঠল ইব্রাহিম, 'এ-ই কি তুমি চাও, ঈশ্বর, যে না খেয়ে মরি আমি? কোথায় তোমার দয়া!'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু চমকে গিয়ে থেমে যেতে হলো ওকে। পরপর পাঁচটা গায়েবী আওয়াজে কেঁপে উঠল চারপাশ। মহা আশ্চর্যের একটা ব্যাপার ঘটে গেল। ওর চারপাশে ছিটকে উঠল পানি। ভেসে উঠতে লাগল একটার পর একটা বড় বড় মাছ। রক্ত ঝরছে সবগুলোর পেট থেকে। মোট পাঁচটা।

থর থর করে কেঁপে উঠল ইব্রাহিম। মস্ত বেয়াদবি হয়ে গেছে স্রষ্টার

সঙ্গে। এত রাগাই তিনি রেগেছেন যে রাগের চোটে তার মতো সাধারণ একজন র‍্যাবাইকে নিজের কেরামতি দেখিয়ে দিয়েছেন। এবার নিশ্চয়ই নেমে আসবে অবাধ্যতার শাস্তি!

পর মুহূর্তে চমক কাটল ওর অট্টহাসির শব্দে। তাকিয়ে দেখল ক্রীকের পাড়ে একটা ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে কাউবয়ের পোশাক পরা এক লোক। হাতে একটা সিক্সগান। এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে ওটার নল থেকে।

লোকটার বয়স ওর চেয়ে কম হবে তো বেশি হবে না। বড় জোর বিশ। রোগা পাতলা দেহ। তবে জোর আছে, বোঝা যায় কাঁধের পেশি দেখে। দেখতে তেমন সুদর্শন নয় তরুণ, তবে চেহারাটা এমনই হাসিখুশি যে প্রথম দর্শনেই এর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছে হয়।

'আরও লাগবে?' হাসি থামিয়ে জানতে চাইল যুবক।

যাক, তাহলে স্রষ্টার কোপে পড়েনি, স্বস্তির শ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল ইব্রাহিম।

সিক্সগানটা হোলস্টারে রেখে র‍্যাবাইয়ের দিকে এগিয়ে এলো যুবক। 'আমি আউট-ল। রক বেনন নাম আমার।'

আউট-ল মানে বুঝল না ইব্রাহিম। জানতেও চাইল না। এখন এসব জানার সময় নয়। পেটে জ্বলছে দাবানল। সামনে ভাসছে তাজা মাছ। এখন আগুন জ্বেলে তাজা মাছকে ভাজা করে খাওয়ার সময়।

'আহা, তুমি আরও একটু আগে এলে একটা মুরগি খেতে পারতাম,' কথা খুঁজে না পেয়ে বলল ইব্রাহিম।

মরা ডাল জোগাড় করে চটপট আগুন জ্বেলে ফেলল বেনন। মাছ সংগ্রহ করে র‍্যাবাই উঠে আসতেই বলল, 'যা আছে তাই আগে খেয়ে শেষ করি তো এসো। পরে দেখা যাবে পরেরটা।'

চার

কালো চাদরের মতো আকাশে মেঘ নেই, মিটমিট করে জ্বলছে অজস্র নীল নক্ষত্র। পুব থেকে উঠে এলো আধফালি রুপোলি চাঁদ। আবছা ধূসর আলো ছড়াল প্রেয়ারির বুকে। ঘাসগুলো ঝিরঝিরে বাতাসে দুলছে।

র‍্যাবাইয়ের কোটের পকেট থেকে বেরল মরিচ আর লবণ। এগুলো র‍্যাকুনের হামলা থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

রান্না চড়িয়ে ক্যাম্প ফায়ারের পাশে বসল ওরা।

দু'জনেই ক্ষুধার্ত, ফলে কথাবার্তা তেমন একটা হলো না, একে একে ছয়টা মাছ ওরা সাবড়ে দিল আধঘণ্টার মধ্যে। শেষ মাছের শিরদাঁড়াটা অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে হাত চাটতে লাগল ইব্রাহিম। থাকলে আরও খেতে পারত ও। এখনও পেটের পাঁচ ভাগের এক ভাগ খালি রয়ে গেছে।

একটা সিগার ধরিয়ে আয়েস করে ধোঁয়া টানল বেনন। পুরনো পোশাক আর মাথায় গোল টুপি পরা পাশে বসা আজব লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'জানতে পারি কি কোত্থেকে এসেছ তুমি? দেখে তো এদিকের লোক বলে মনে হচ্ছে না।'

'ঠিকই ধরেছ। আমি জেরুজালেমের লোক।' পশ্চিমে দেখাল র‍্যাবাই। বোঝাতে চাইল ওদিকে যাবে।

বুঝল না বেনন। 'তুমি তাহলে ক্যালিফোর্নিয়ার জেরুজালেম নামের কোন শহর থেকে এসেছ?'

'না। ওখানেই, মানে ক্যালিফোর্নিয়াতেই যাব।'

'তাহলে জেরুজালেম কোথায়?'

'জেরুজালেম হচ্ছে জেরুজালেমে। কোনদিকে তা আমি বলতে পারব না।...আচ্ছা! তাহলে ক্যালিফোর্নিয়া পশ্চিমে এতে তো ভুল নেই কোন?'

কৌতূহলী চোখে র‍্যাবাইকে দেখল বেনন। 'তুমি আসলে হারিয়ে গেছ, তাই না?'

'খানিকটা।'

'আচ্ছা!'

মাথা দোলাল ইব্রাহিম। 'হ্যাঁ, হারিয়ে গেছি বটে, তবে ঠিক ঠিকই একদিন পৌঁছে যাব সান ফ্রান্সিসকোতে।'

'সঙ্গে টাকা আছে?'

'না।'

'খাবার?'

'না।'

'কোত্থেকে যেন এসেছ বললে?'

'জেরুজালেম। আর তুমি?'

'ক্যালিফোর্নিয়া। ওখানেই আমার জন্ম।' সিগারের ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে ইব্রাহিমের দিকে তাকাল বেনন। 'তুমি তাহলে সান ফ্রান্সিসকো যেতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

আগুনে ছাই ঝাড়ল বেনন। রায় ঘোষণার সুরে বলল, 'পারবে না।'

'পারব না?'

'না।'

'কিন্তু কাল সকালে তুমি যদি আমাকে পথের হদিস জানিয়ে দাও তাহলে না পারার কি আছে?'

সরাসরি জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল বেনন, 'ওখানে যাওয়াটা অত জরুরী কেন?'

খুলে বলল ইব্রাহিম। জানাল সান ফ্রান্সিসকো গেলেই বিয়ে হবে ওর। বউ ঠিক করা আছে।

বিস্ময়ে কপালে উঠল বেননের চোখ। 'জীবনে যাকে দেখোনি এমন কাউকে বিয়ে করবে তুমি?'

'দেখেছি।' বেন্ডার পরিবারের ছবিটা পকেট থেকে বের করল ইব্রাহিম। 'এই যে। ক্রস দেয়া মেয়েটাই আমার বউ হবে।'

'উইইইই বাপস্!' মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল বেননের।

'ছবি দেখে কি মনে হয়?' মতামত জানতে চাইল র‍্যাবাই।

উত্তর দেয়ার আগে বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করতে হলো বেননকে। এই সহজ সরল লোকটাকে ভাল লেগেছে ওর। এমন কিছু বলা উচিত হবে না যাতে সে মনে চোট পায়। শেষ পর্যন্ত গম্ভীর চেহারায় মতামত দেবার ভঙ্গিতে বলল ও, 'তোমার এক জোড়া যমজ বাচ্চা হলেও দুধের কোন অভাব হবে একথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'তোমার পরিবারে কেউ নেই?' জানতে চাইল র‍্যাবাই।

মাথা নাড়ল বেনন। 'ছিল। ছোটবেলায়।'

ভাবুক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল র‍্যাবাই। 'তোমার কথা শুনে কেন যেন মনে হলো আরও অনেক কিছু বলার আছে তোমার। খুলে বলবে?'

আগুনের দিকে তাকিয়ে ক্ষণিকের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেল বেনন। এই লোকটার কোন স্বার্থ নেই, এমনিই সহানুভূতিবশত জানতে চাইছে ওর অতীত। কই, আর কেউ তো কোন দিন এরকম আন্তরিকতার সঙ্গে ওর সম্বন্ধে জানতে চায়নি! অদ্ভুত একটা একাত্মতা অনুভব করল বেনন লোকটার সঙ্গে। ওরা যেন একই দুনিয়ার মানুষ। শুধু বেড়ে ওঠার পরিবেশটা আলাদা ছিল বলে ও হয়েছে ডাকাত আর এই ইব্রাহিম হয়েছে যাজক।

'বেশ, বলছি তাহলে,' শুরু করল ও, 'বিরক্ত হলে আমাকে থামিয়ে দিয়ো।'

মাথা নাড়ল র‍্যাবাই। বোঝাতে চাইল বিরক্ত হবার কোন কারণ নেই।

'ক্যালিফোর্নিয়ার রকি মাউন্টিনের কোলে ছোট্ট একটা কেবিনে আমার জন্ম। বাবা ছিল হোমস্টেডার। প্রাচুর্য ছিল না, তবে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। আমার মাকে কোনদিন আমি অভিযোগ করতে শুনিনি।' চুপ হয়ে গেল বেনন। ভাবছে অতীতের কথা।

বেনন আর কথা বলছে না দেখে চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল র‍্যাবাই।

আবার শুরু করল বেনন, 'আমার বয়স যখন চার, এক সন্ধ্যায় আমাদের কেবিনে এলো এক কুখ্যাত দস্যু। ডাকোটা জোন্স তার নাম। লোকটা ছিল ধনীদের যম আর গরীবের বন্ধু। পেছনে পাসি ধাওয়া করছিল, ধরতে পারলেই ঝুলিয়ে দেবে, পালাতে হবে তাকে, অথচ ওর ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বাবার কাছে একটা ঘোড়া চাইল ডাকোটা। বাবাও রাজি হয়ে গেল। ডাকোটাকে সাহায্য করতে পারার এই দুর্লভ সুযোগ হেলায় হারাতে রাজি হলো না।'

আঁধারে তাকিয়ে স্মৃতি রোমন্থন করল বেনন। হঠাৎ করেই অসহায় লাগল নিজেকে। মনে পড়ে গেল এই দুনিয়ায় আপনজন বলতে কেউ আর নেই ওর।

'তারপর?' প্রশ্ন করল র‍্যাবাই।

চটকা ভাঙল বেননের। 'এদিকে আমার মা ছিল অসুস্থ। প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে

বিছানায় মড়ার মতো পড়ে ছিল। মাথায় পানি দিতে হচ্ছিল একটু পর পর। আমাকে আর মাকে একা রেখে শহরে ডাক্তার ডাকতেও যেতে পারছিল না বাবা।

'সমস্যাটা বুঝে বাবাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে শহরে পাঠিয়ে নিজে মায়ের সেবা-শুশ্রূষা করল ডাকোটা। চিন্তা করে দেখো কতখানি সাহস, ও জানত পাসি চলে এলে ওকে মরতে হবে। তবুও সেদিন দু'পয়সা দামের এক হোমস্টেডারের জন্যে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছিল ও।' দম নিতে থামল বেনন।

ইব্রাহিম বলল, 'মহৎ লোক।'

'তাতো বটেই।' সায় দিল বেনন। *ও জানে না, একদিন ভাগ্য ওকে ডাকোটার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে।

'তারপর কি হলো বললে না?'

'তারপর বাবা ডাক্তার নিয়ে ফিরতেই তাজা একটা ঘোড়া ধার নিয়ে চলে গেল ডাকোটা। আধঘণ্টা পরই পাসি এলো। একজন দস্যুকে সাহায্য করার অপরাধে বিচার করে বাবাকে জেলে দিল ওরা। জেলেই মৃত্যু হয়েছে আমার বাবার। আমার মাও তারপর আর বেশিদিন বাঁচল না। ভালবাসার মানুষের এই অপমান বেচারি সইতে পারেনি।' চুপ করে আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে থাকল বেনন।

'তারপর?'

'তারপর?' একটুকরো করুণ হাসি ফুটে উঠল বেননের ঠোঁটে। 'তারপর এখানে ওখানে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে ঘুরে বেড়ানো। গির্জার পাদ্রী আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে তাঁকে একদিন টাউন হল থেকে অপমান করে বের করে দেয়া হলো। আমাকে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলেন তিনি। সেদিনই গির্জার আশ্রয় ছেড়ে পালিয়ে এলাম আমি। চাইনি আমার জন্যে ভাল একজন মানুষকে প্রতি পদে কষ্ট আর লাঞ্ছনা পেতে হোক।

'সমাজের চোখে অপরাধীর ছেলেই রয়ে গেলাম আমি। তারওপর এতিম; ফলে যত খুশি দুর্ব্যবহার তো করাই যায় আমার সঙ্গে। চলে গেলাম অন্য শহরে। কিন্তু সেখানেও কাজ করে বেঁচে থাকা সহজ হলো না। আমার পেছন পেছন গেল আমি কে সেই খবর। শুরু হলো সেখানেও অত্যাচার। এভাবেই কেটেছে আমার কৈশোরের দশটা বছর।'

'তারপর দস্যু হয়ে গেলে তুমি?'

'হ্যা...চেষ্টা করেছি, কিন্তু সমাজ আমাকে সৎ থাকতে দিল না। অপমান আর দুর্ব্যবহার সয়ে সয়ে একদিন আউট-ল হয়ে গেলাম।' র‍্যাবাইয়ের দিকে তাকাল বেনন। চিকচিক করছে লোকটার দু'চোখ জমে ওঠা জলে।

বলল র‍্যাবাই, 'কিন্তু এখন তো তুমি সাহসী একজন পুরুষ। এখন কেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছ না? ডাকাতি করা কি ভাল কাজ, বলো?'

খানিক চুপ করে থাকল বেনন। গম্ভীর হয়ে গেছে চেহারা। তারপর বলল,

---

*(দুর্বিপাক দ্রষ্টব্য)

'ডাকাত হতে পারি, তবে নীতি বিসর্জন দিয়েছি তা ভেবো না। ডাকোটা আমার আদর্শ। ওরই মতো রক্তচোষা ধনীদের সম্পদ কেড়ে নিই আমি. বিলিয়ে দিই সমাজের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত দরিদ্রের মাঝে।'

বেননের কথা শেষ হবার পরও দীর্ঘক্ষণ চুপ করে বসে থাকল ইব্রাহিম। তারপর নীরবতা অসহ্য ঠেকায় মৃদু স্বরে বলল, 'আমি সত্যিই দুঃখিত। যদি জানতাম জীবনটা তোমার এত দুঃখে কেটেছে তাহলে অতীত জানতে চেয়ে কষ্টগুলো মনে পড়িয়ে দিতাম না।'

কথাটা মনের মধ্যে নেড়েচেড়ে দেখল বেনন। অচেনা লোকটার সহমর্মিতা অন্তর ছুঁয়ে গেল ওর। বলল, 'জীবনটা এমনই। দুর্বলের ওপর সুযোগ পেলেই অত্যাচার করে সবলরা। সব সয়ে শুধু শক্ত লোকগুলোই মাথা উঁচু করে টিকে থাকে শেষ পর্যন্ত।'

'হয়তো তাই। তবে, কে যে সবল আর কে যে দুর্বল তা সময়ের পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে। আজ যে বাদশা কাল হয়তো সে পথের ফকির। সবকিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' সায় দিল বেনন। 'দেখো না, আগে যারা আমাকে মানুষ বলেই মনে করত না আজ তারা আমার নাম শুনলে ঘরের দরজা এঁটে ঘাপটি মেরে বসে থাকে।'

আরও একঘণ্টা কথা হলো ওদের মাঝে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। দু'জনের কেউই সচেতন ভাবে জানল না কত গভীর বন্ধুত্বে জড়িয়ে গেছে ওরা নিজেদেরই অজান্তে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বেনন দেখল আগেই উঠে পড়েছে যাজক। প্রার্থনা করছে মাটিতে হাঁটু গেড়ে।

এই প্রথম ও খেয়াল করল একটা টুপির নিচে আরেকটা গোল টুপি পরেছে ইব্রাহিম।

প্রার্থনা শেষ হতেই কারণ জিজ্ঞেস করল ও, 'এত গরমেও একটার তলায় আরেকটা টুপি কেন? তাছাড়া দেখে তো মনে হচ্ছে না ওটা ঠাণ্ডা ঠেকাবে।'

'ঠাণ্ডার জন্যে নয়,' বলল ইব্রাহিম, 'এটা ধর্মীয় রীতি। মাথা ঢেকে প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।'

'তাই নাকি!' বিস্মিত হলো বেনন। 'আমি তো জানতাম মাথা থেকে হ্যাট খোলাটাই বরং সম্মান দেখানোর উপায়।'

শ্রাগ করল র‍্যাবাই। 'একেক দেশে একেক রীতি।'

'তাই হবে। দশ বছর বয়স হবার পর আর কোনদিন চার্চে ঢুকিনি তো তাই জানি না, হয়তো গির্জাতেও এই একই নিয়ম আছে। আচ্ছা, তোমাদের মতো যাজকদের কি বলে সম্বোধন করে ইহুদিরা?'

'র‍্যাবাই।'

'তো র‍্যাবাই,' হাসল বেনন। 'সাবধানে থাকতে হবে তোমার এখন থেকে। এদেশে মেপল গাছের মতো মোটা সাপ আছে. আছে তোমার খচ্চরটার মতো বড় পাহাড়ী সিংহ; আর যাদের সবচেয়ে ভয়, সেই হৃদয়হীন

মানুষের সঙ্গে তো আগেই মোলাকাত হয়েছে তোমার।'

'খচ্চর?' মুখ হাঁ হয়ে গেল ইব্রাহিমের। 'আমাকে তো বলল রেস জেতা ঘোড়া!'

'ঠকিয়েছে। ওই একই জাত। ব্যাংকারদের মতো। কখন যে সামনে বসে ফতুর করে দেবে টেরও পাবে না তুমি। হ্যান্ডশেক করলে চোখের আড়ালে গিয়েই আঙুল গুনে নিশ্চিত হতে হবে দু'একটা চুরি করে নিল কিনা।'

আধঘণ্টা পরে ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে এগোল বেনন। পাশে চলল ইব্রাহিমের ল্যাংড়া খচ্চর।

ট্রেইল্ল যেখানে বাঁক নিয়ে দু'দিকে চলে গেছে সেখানে থামল ওরা।

বেনন বলল, 'যেভাবে যা বলে দিয়েছি সব মনে আছে তো? ভুলে গেলে কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলবে।'

'মনে আছে।' হাত বাড়িয়ে দূরের এক সারি পাইন গাছ দেখাল ইব্রাহিম। 'ওই গাছের ওখান থেকে উত্তরে চলতে থাকব, দু'তিন দিন পর পৌঁছে যাব সমতল জমিতে; তারপর বামে মোড় নিয়ে পশ্চিমে এগোব সেই ইন্ডিপেন্ডেনস পর্যন্ত। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর ইন্ডিপেন্ডেনস থেকে টোপেকা যাব আমি। সেখান থেকে লিটল ব্লু রিভার ধরে উত্তর-পশ্চিমে এগোতে এগোতে পৌঁছে যাব ফোর্ট কার্নি। তারপর যদি শাইয়্যান ইন্ডিয়ানদের হাতে মরতে চাই তাহলে রওয়ানা হব সাউথ প্ল্যাট রিভার ধরে। রাপাহোদের হাতে মরতে চাইলে অনুসরণ করব নর্থ প্ল্যাট। যেপথেই যাই না কেন, কপালগুণে যদি বেঁচেই যাই; যদিও সে-সম্ভাবনা নেই বললেই চলে; দেখা পাব ফোর্ট ব্রিজারের। সেখান থেকে রকি মাউন্টিনের মাঝ দিয়ে ফোর্ট হল। তারপর উতে মরুভূমির ভেতর দিয়ে পড়ব গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া ট্রেইলে। এই তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ঠিক পথে আছ তা বুঝবে কি করে?'

'দাঁড়াও দেখি। আঁ...আঁ...হ্যাঁ, এই তো মনে পড়েছে। ভার্জিনিয়া সিটির আগে পর্যন্ত হামবোল্ট রিভার বাঁয়ে রেখে এগোব। তারপর কিট কার্সন পাস ধরে হ্যাঙটাউন। সেখান থেকে শাটার্স ফোর্ট না পৌঁছুনো পর্যন্ত পশ্চিমে। তারপর যেতে থাকব, যেতে থাকব, যেতে থাকব; বাঁয়ে যখন মোড় নেব, খেয়াল রাখব ডান দিকে সমুদ্র যেন থাকে। ওই ট্রেইলে থাকলেই একদিন দেখব হঠাৎ কি করে যেন সান ফ্রান্সিসকো হাজির হয়ে গিয়েছি।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল বেনন।

'কোন ভুল হয়েছে?' জানতে চাইল ইব্রাহিম।

'না। কোন ভুল হয়নি।'

'তাহলে মাথা নাড়ছিলে যে?'

'আমার জীবনে কাউকে এতো ভাল মুখস্থ বলতে দেখিনি,' বলল বেনন। চোখ বুলিয়ে বিচারকের দৃষ্টিতে দেখল যাজকের আপাদমস্তক। 'আবার এটাও ঠিক যে সেই মুখস্থ বিদ্যা কাজে লাগানোর জন্যে এতো খারাপ স্বাস্থ্যের কেউও

আমার চোখে পড়েনি। আমার কথা যদি শোনো তো বলি, ভুলেও পথে নেমো না; মারা পড়বে বেঘোরে।'

'সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে,' প্রধান র‍্যাবাইয়ের বাণী মুখস্থ ঝাড়ল ইব্রাহিম।

'তাহলে যাবেই তুমি?' মারা পড়বে লোকটা, কোন সন্দেহ নেই বেননের মনে।

'যেতেই হবে।'

'অনেকে কিন্তু ওপথে গিয়ে মারা গেছে। কেউ মরেছে না খেতে পেয়ে, কেউ মরেছে তাদের ঘোড়া মারা পড়ায়, কেউ বা জ্বরে; তারওপর আবার আছে ইন্ডিয়ান আক্রমণের ভয়। কয়েক বছর আগে শুধু ক্যালিফোর্নিয়া ট্রেইলেই মরেছে দুই-আড়াইশো লোক। শক্ত লোক ছিল তারা। অভিযানের প্রস্তুতিও ছিল।'

হাত বাড়িয়ে বেননের সঙ্গে করমর্দন করল র‍্যাবাই। খচ্চরের রাস হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'বিদায়, বন্ধু। মরি যদি তো একবারই মরব। তোমার সঙ্গ ভাল লেগেছিল আমার। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে। সান ফ্রান্সিসকোতে এলে আমার সঙ্গে দেখা কোরো কিন্তু।'

ওপ্রসঙ্গে কথা না বলে বিষয় পরিবর্তন করল বেনন। 'আচ্ছা, স্প্যানিশ জানো তুমি?'

'না। কেন?'

'হয়তো মেক্সিকোতে গিয়ে হাজির হবে তুমি।'

'হয়তো। বিদায়, বন্ধু।'

যেদিকে যাবার কথা তার ঠিক উল্টো দিকে রওয়ানা হলো ল্যাংড়া খচ্চর।

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও!' পেছন থেকে চেঁচাল বেনন।

ফিরে তাকাল ইব্রাহিম।

'ওদিকে।' পাইন গাছ দেখাল বেনন। 'ওদিকে যেতে হবে তোমাকে।'

বোকা বোকা চেহারায় থতমত খেয়ে হাসল র‍্যাবাই। 'জানি। আমি শুধু সামনে পড়ে থাকা ওই মরা গাছটাকে চক্কর মারতে যাচ্ছিলাম। এটাই আমাদের দেশের নিয়ম। বড় কোন বাধা পেরবার আগে ছোট একটা বাধা পেরিয়ে মনের মধ্যে জোর আনতে হয়।' মনে মনে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইল ও মিথ্যে বলেছে বলে। একেবারে ভুলেই মেরে দিয়েছিল কোন্‌দিকে যেতে হবে। কিন্তু এত ভাল মুখস্থ বলা এবং প্রশংসা প্রাপ্তির পর একথা স্বীকার করা যায় না। বেনন ভাববে সে একটা রাম ছাগল।

মনের মধ্যে গভীর সন্দেহ আসায় লোকটা করেটা কি দেখতে তাকিয়ে থাকল বেনন।

মরা গাছটাকে একবার চক্কর দিল ইব্রাহিম, তারপর সোজা এগোল বেননকে পাশ কাটিয়ে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে স্যাডলে। একবারও বেননের দিকে তাকাল না। জানে লোকটা ওকে দেখছে।

কিন্তু ভাগ্য ওকে বেননের সঙ্গে গেঁথে ফেলেছে, এত সহজেই মুক্তি মিলবে কেন! পাঁচগজও যেতে পারেনি বেচারা যাজক, মিথ্যে বলার অপরাধেই

হয়তো, স্যাডলটা খুলে গেল চ্যালেঞ্জারের। ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেল ইব্রাহিম।

কোমরে বড্ড চোট লেগেছে, কিন্তু ভুলেও ওজায়গাটা মালিশ করল না ও, এত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল যেন কাঠ-পিঁপড়ের দল পশ্চাদ্দেশে আক্রমণ চালিয়েছে। বেননকে শুনিয়ে বলল, 'আহ্হা! হুম। বকলেসটা। হ্যাঁ, ওটায় খুঁত আছে।' স্রেফ ভুলে যেতে চাইল যে আসলে সে বাঁধেইনি জিনিসটা।

আবার স্যাডল চড়াল ও। এবার খুব সাবধানে। ভাল মতো পরীক্ষা করে দেখল আটকেছে জিনিসটা।

লোকটাকে অস্বস্তি বোধ করতে দেখে নিজের পথে রওয়ানা হয়ে গেল বেনন। কিছুদূর গিয়ে পিছু ফিরে দেখল পাইন সারির দিকে চলেছে পাদ্রির ল্যাংড়া খচ্চর।

অনেকদিন পর একজন খাঁটি লোকের দেখা পেয়েছে বুঝতে পারছে ও। যাজকের মাথায় ঘিলুর একটু অভাব আছে বলে মনে হয়, তবে বেঁচে থাকলে দুনিয়ার নিয়ম ঠিকই একদিন শিখে নিতে পারবে। এরকম লোককে সাহায্য করেও তৃপ্তি আছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই অনুভব করেছে বেনন, এই অসহায় অথচ দৃঢ়প্রত্যয়ী লোকটাকে যতটা সম্ভব সাহায্য না করলে নিজেকে ছোট লাগবে ওর নিজের কাছেই।

পাঁচ

ফোর্ট কার্নির পশ্চিমে, খাড়া টিলাগুলোর মাঝ দিয়ে পথ করে নিচে নামছে ইব্রাহিম আর বেনন। নিচে আলোর বিকিরণে ঝিলমিল করছে প্ল্যাট নদীর জল। নদীটা মিন্টের ঝাঁঝাল গন্ধ মাখা ঘন বন আর টিলার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে দৃষ্টিসীমার ওপারে।

পাঁচ ঘণ্টা পর ট্র্যাক করে যাজককে প্রেয়ারির মধ্যেই পেয়েছে বেনন। খচ্চরের পাশে মাটিতে বসে ছিল লোকটা গালে হাত দিয়ে। ওকে দেখে লজ্জায় লাল হয়ে স্বীকার করেছে যে পথের নির্দেশ সবই বেমালুম মন থেকে মুছে গেছে।

দুপুরে ওরা বিশ্রাম নিতে থামল।

ইব্রাহিমকে বনমুরগি তাড়ানোর কাজে পাঠাল বেনন।

কিছুক্ষণ পরেই শোনা গেল যাজকের চিৎকার।

'বেরো তোরা! এই আমি আসছি তেড়ে! উড়াল দে! উড়াল দে!'

ছুটছে জোব্বা পরা ইব্রাহিম। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে গ্রিজলি ভালুক।

আকাশে উড়ল দুটো বনমোরগ। পরক্ষণেই পড়ে গেল বেননের গুলি খেয়ে।

ওগুলো নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো ইব্রাহিম। মোরগ দুটো

বেননের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আজকে রাতে দারুণ ভোজ খাবে তুমি।'
বিস্মিত হলো বেনন। 'কেন, তুমি খাবে না?'
বিষাদ মাখা হাসি হাসল ইব্রাহিম। মাথা নেড়ে বলল, 'লোভ লাগছে, তবে খেতে পারব না।'
'কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ছে মুরগি, হাঁস, গরু-ছাগল খেতে তোমাদের ধর্মে নিষেধ করেনি। পাখিদের মধ্যে তোমাদের ধর্মের হাত থেকে বেঁচে গেছে শুধু ঈগল আর শকুন।'
'নিয়মটা জটিল। এতোই যে সবগুলো আমি নিজেও জানি না। তবে এটা জানি যে খাবার আগে প্রাণীটাকে সুরা পড়ে জবাই করতে হবে, তা নাহলে হালাল হিসেবে ধরা যাবে না।'
'তুমি যদি সুরা পড়ো আর আমি যদি গুলি করি?'
'হবে না। ওটার কণ্ঠনালী ছাড়া শরীরের আর কোন শিরা ছেঁড়া চলবে না। তাছাড়া কোন হাড় ভাঙা হলেও তা খাবার অনুপযোগী বিবেচিত হবে।'
'তাহলে পরিচয়ের দিন যে বলেছিলে আমার সঙ্গে আগে দেখা হলে বনমুরগির রোস্ট খেতে পারতে?'
'কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। একটা কিছু বলতে হয় তাই...'
'বাঁচবে কি করে তুমি?' মোরগ দুটো নিয়ে জানতে চাইল বেনন। 'তুমি খরগোশ খাবে না, মুরগি খাবে না, এমনকি সবেলিও মানা আছে! শেষে একদিন হয়তো দেখবে আলু আর বীনের পাহাড় তোমার পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে!'
চিন্তিত দেখাল ইব্রাহিমকে। একমত হতে পারল না। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আমার ধারণা এতোদিনে ওগুলো হজম হয়ে গেছে।'
সেরাতে একটা ক্ষীণস্রোতার পাশে ক্যাম্প করল ওরা। চারপাশে খুঁটি গেড়ে তার ওপর কম্বল বিছিয়ে আগুনটা ঢেকে রাখল বেনন। ঝর্নার ওপারে, দুইশো গজ দূরে, চাঁদের আলোয় আবছা ভাবে দেখতে পাচ্ছে ওরা কয়েক ডজন তিন কোণা টীপি।
'পওনীদের গ্রাম,' যাজককে বলল বেনন।
'ওরা কি বিপজ্জনক?' কয়েকজনের আকৃতি দেখতে পাচ্ছে ইব্রাহিম, হেঁটেফিরে বেড়াচ্ছে গ্রামের সীমানায়।
'বলা মুশকিল। আর্মির জন্যে স্কাউটিং করে ওরা। তবে ওদের শরীরে আছে মারাত্মক ব্যাধি যক্ষা। সাদাদের কাছ থেকে ওদের হয়েছে। সাঙ্ঘাতিক ছোঁয়াচে। একবার ধরলে আর রক্ষে নেই।'
বেননের দিকে তাকাল ইব্রাহিম। প্রশংসা করে বলল, 'কত কিছু জানো! তুমি একজন শিক্ষিত লোক, বেনন।'
লজ্জা পেল বেনন। র‍্যাবাই জানে না স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি ও। বলল, 'যতটুকু যা জানি তা দেখে শিখেছি।'
'জানো, তওরাতে লেখা আছে নিজের জন্যে ভাল একজন শিক্ষক খুঁজে ন্যাও? আমার ধারণা আমি তেমন একজন পেয়ে গিয়েছি।'

র‍্যাবাইয়ের খামোকা প্রশংসা করার রোগ আছে বলে সন্দেহ হওয়ায় চুপ করে থাকল বেনন।

পরদিন আবারও বনমোরগ মারার চেষ্টা করল ওরা। কালকে র‍্যাবাই দারুণ রেঁধেছিল। মুখে এখনও স্বাদ লেগে আছে বেননের। প্রতিজ্ঞা করেছে বেনন, আজকে র‍্যাবাইকে গুলি করতে দেবে।

সিক্সগান দিয়ে পারবে না বুঝে ইব্রাহিমের হাতে গুলি ভরা বন্দুক দিয়ে কিভাবে চালাতে হয় শিখিয়ে দিয়েছে ও।

একহাতে কোট ঘোরাতে ঘোরাতে ঘাসের আড়াল থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে বেরিয়ে এলো বেনন। এগোচ্ছে মাটিতে শোয়া ইব্রাহিমের দিকে।

ওর পনেরো গজ বাঁয়ে আকাশে উড়াল দিল একটা নাদুসনুদুস বনমুরগি।

ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই গুলি ছুঁড়ল ইব্রাহিম।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! থামো, থামো!' বিকট আর্তনাদ ছাড়ল বেনন। হতভম্ব র‍্যাবাইয়ের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে দেখল ওর হাতের কোটে গোটা বিশেক ছররা লেগেছে। আর একফুট বামে গুলি করলেই ঝাঁঝরা হয়ে যেত ও।

হ্যাঁ, একজন শিক্ষক পেয়েছি বটে, ভাবল ইব্রাহিম। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, আমাকে ছাত্র হিসেবে পেয়ে জানে বাঁচবে তো মানুষটা?

ওদের ঠিক নিচের ক্যানিয়নে, ওয়াইয়োমিঙের পাহাড়ের মাঝ দিয়ে সর্পিল গতিতে বয়ে যাচ্ছে লারামি নদী।

ক্লিফের কিনারায় ঘোড়া থামিয়ে পঞ্চাশ ফুট নিচে প্রমত্তা নদীটার দিকে তাকাল বেনন আর ইব্রাহিম।

'রাপাঙ্গো ইন্ডিয়ানরা বলে এই নদীর জল এক ঢোক খেলে নাকি বুড়ো বয়সেও যৌবন ধরে রাখা যায়,' জানাল বেনন।

'খাবো নাকি কয়েক ঢোক?' চক চক করে উঠল র‍্যাবাইয়ের চোখ।

'পরে।' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল বেনন। ইব্রাহিমকে অনুসরণ করতে ইশারা করল।

'যাচ্ছ কোথায়?'

'কয়েক মাইল সামনে ক্লিফটা সমতলে মিশেছে, সেখানে নদীটা পার হওয়া যাবে।'

'এখানে পার হলে অসুবিধে কি?'

'এই জায়গাটা মরার জন্যে চমৎকার, কিন্তু নদী পার হবার জন্যে নয়।'

মনে মনে হাসল বেনন। ইব্রাহিম জানেও না যে লারামি ফোর্ট এড়াবার জন্যে বিশ মাইল সরে গেছে ওরা ট্রেইল থেকে।

টিলার মাঝে মাথা উঁচু করা ওই মধ্যযুগীয় চেহারার দুর্গটায় এক গ্যারিসন সেকেন্ড ট্রুপের আবাস। ওখান থেকে হয়ে ক্যালিফোর্নিয়া যায় ওরিগন আর ইউটাহ্‌র অভিবাসীরা। গত বছরের হিসেবে বলা হয়েছে চল্লিশ হাজার লোক, আড়াই হাজার মহিলা, পঁচিশ হাজার ঘোড়া, পঁয়ত্রিশ হাজার ষাঁড় আর দশ হাজার

ওয়্যাগন গেছে দুর্গটাকে পাশ কাটিয়ে।

এই জনস্রোত এড়ানোই বেননের মূল উদ্দেশ্য। তাছাড়া দুর্গটা ওর জন্যে মরণফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়। ওর নামে ওয়ান্টেড পোস্টার ছাপা হয়েছে, বেরিয়েছে স্কেচ, ধরা পড়লে নির্ঘাত ফাঁসি। আর ধরা পড়ার সম্ভাবনা দুর্গেই বেশি।

'আমরা লাফিয়ে পড়লেই পারি,' বেননের চটকা ভাঙল যাজকের আপত্তিতে।

'তারপর কি হবে তা ভেবে দেখেছ?'

'হ্যাঁ। সহজ। সাঁতরে পার হয়ে যাব।' কিনারা থেকে উঁকি দিল ইব্রাহিম।

থামল না বেনন। ঘাড় না ফিরিয়েই বলল, 'মরার ইচ্ছে থাকলে চেষ্টা করে দেখো। আমি এসবে নেই।'

শেষবারের মতো নদীটার দিকে তাকাল ইব্রাহিম। মনে মনে হিসব কষল। ওর মনে হলো সম্ভব। একবার লাফিয়ে পড়লেই হয়। কিন্তু বেনন ওর শিক্ষক। বেননের চেয়ে ভাল আর কে জানবে! কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও চ্যালেঞ্জারকে ঘুরিয়ে বেননের পিছু নিল ও।

এক গজও এগোতে পারেনি, তার আগেই চ্যালেঞ্জারের পায়ের চাপে খসে গেল বড় একটা পাথর। ওটার পাশে বিশ্রাম নিচ্ছিল একটা র‍্যাটল স্নেক। অকস্মাৎ এই হাঙ্গামায় বিরক্ত হয়ে প্রতিশোধের সিদ্ধান্ত নিল ওটা। চ্যালেঞ্জার সরে যাবার আগেই ছোবল মেরে বসল।

ইব্রাহিমের কপাল ভাল, এতোদিন স্বাভাবিক প্রাণীদের কামড়ে এসেছে সাপটা; জানে না ল্যাওড়া খচ্চর কি জিনিস। ভড়কে গেলেও পেছনের খুর দিয়ে লাথি কষিয়ে দিল চ্যালেঞ্জার। নালে ঠোকর খেল র‍্যাটলারের দাঁত। বেমক্কা ঝাঁকিতে চমকে গিয়ে সরসর করে আরেক দিকে রওয়ানা হলো ওটা, মান সম্মান নিয়ে সরে পড়তে চাইছে এখন।

চ্যালেঞ্জার বেঁচে গেল ঠিকই, কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। ইব্রাহিমকে পিঠে নিয়ে তাল হারিয়ে ক্যানিয়নের ভেতর পিছলে পড়ল ওটা ।

কানের পাশে বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ পেল ইব্রাহিম। আপ্রাণ চেষ্টা করল যাতে স্টির‍্যাপ থেকে পা বের করতে পারে। পাক খেতে খেতে নামছে চ্যালেঞ্জার। নড়তে পারল না ইব্রাহিম। হাল ছেড়ে দিয়ে চিন্তা করল, এটা ঈশ্বরের অন্যায়; এতদূর কষ্ট দিয়ে নিয়ে এসে এভাবে ওকে মেরে ফেলার কোন মানে হয় না।

ঝপাস করে নদীতে পড়ল চ্যালেঞ্জার। পাঁজরে চিনচিনে একটা ব্যথা অনুভব করল যাজক। দাঁতে দাঁত লেগে গেল বরফ-শীতল পানির ছোঁয়ায়।

'ব্যথা!' গলা ছেড়ে হেসে উঠল ইব্রাহিম। ব্যথা লাগছে ওর! তারমানে মরেনি ও!

খচ্চরটাও হুঁশ ফিরে পেয়েছে। উল্টোদিকের পাড় লক্ষ্য করে সাঁতরে এগোল ওটা। এই সুবর্ণ সুযোগে আঁজলায় তুলে কয়েক ঢোক পানি গিলে স্বস্তির শ্বাস ফেলল র‍্যাবাই।

পাড়ে উঠেই খচ্চরটাকে বেঁধে মাটিতে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসল ও।

এদিকে সাপটাকে দেখতে না পেলেও ক্লিফের ওপর থেকে চ্যালেঞ্জারকে লাফিয়ে পড়তে ঠিকই দেখল বেনন। আত্মসম্মানে বড় চোট লাগল ওর। র‍্যাবাই যদি পারে তাহলে ওরও পারা উচিত। এভাবে ছোট হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল!

ঘোড়া ছুটিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে ক্লিফ থেকে লাফিয়ে পড়ল বেনন। দু'চোখ বুজে রেখেছে।

শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে পাঁচ মিনিট পরে ওপারে গিয়ে উঠল বেনন।

ইব্রাহিমের প্রার্থনা শেষ হয়েছে। হাত তালি দিল যাজক। 'সুন্দর লাফ!'

'তুমি একটা উন্মাদ!' জবাবে বলল বেনন। চেহারা নির্বিকার, কিন্তু মনে মনে সর্বক্ষণ ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিচ্ছে।

'মনে রেখো,' বলল গম্ভীর যাজক। 'ইব্রাহিম যা বলে তা করে ছাড়ে।'

ছয়

সান ফ্রান্সিসকো।

ক্যালিফোর্নিয়া।

বেন্ডারের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে বেন্ডার, বিয়ালিক আর মিস্টার রোজেনশাইন। তিনজনেরই ভ্রূ কুঁচকে আছে গভীর চিন্তায়।

ওয়াশিংটন জাহাজ পৌঁছে গেছে, অথচ আসেনি র‍্যাবাই। সে ব্যাপারে কথা বলার জন্যেই আজকে একত্র হবে সবাই। বিয়ালিক আর রোজেনশাইন আগেই পৌঁছে গেছে। বাকিরাও চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

'হয়তো মারাই পড়েছে বেচারা!' বলল রোজেনশাইন।

'মুখ সামলে কথা বলো, রোজেনশাইন,' ধমকে উঠল বেন্ডার। 'তুমি আমার জামাইয়ের ব্যাপারে কথা বলছ।'

'একথাটা কাউকে যদি মনে করিয়ে দিতে হয় তো সে তোমার বড় মেয়ে সারা।' উঠোনের দিকে আঙুল তাক করল বিয়ালিক।

বেন্ডার তাকিয়ে দেখল নলকূপের কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে সারা আর জুলিয়াস রোজেনশাইন। দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে সময়টা উপভোগ করছে ওরা। সুযোগ পেলেই সারার হাত ছুঁয়ে দিচ্ছে জুলিয়াস।

জুলিয়াসের বাবার দিকে তাকাল বেন্ডার। 'ছেলের সঙ্গে এখনও কথা বলোনি তুমি? জানাওনি যে সারা আমাদের র‍্যাবাইয়ের বাগদত্তা?'

'একবার? অন্তত একশো বার বলেছি। কে শোনে কার কথা!'

ছোট মেয়ে রোজি বারান্দার এককোণে টেবিলে নাস্তা সাজাচ্ছে। তার সামনে গিয়ে থামল বেন্ডার। রাগ চেপে বলল, 'ওই গাধাটার কাছ থেকে

সারাকে সরিয়ে নিয়ে এসো।'

প্লেটের ওপর থেকে চোখ সরল না রোজির। মৃদু গলায় আপত্তির সুরে বলল, 'আমি ওদের ব্যাপারে নাক গলাব না।'

'কিহ্! আমার কথা শুনবে না তুমি?'

'না।' আরও শান্ত শোনাল রোজির গলা।

মেয়েটার অনুত্তেজিত ভঙ্গি বেন্ডারকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। 'তুমি জানো কে তোমার সঙ্গে কথা বলছে?'

'হ্যাঁ।'

'কে!'

'বাবা।'

দু'হাতে নিজের চুল খামচে ধরল বেন্ডার। 'হায় ঈশ্বর, কেন তুমি আমাকে এরকম অবাধ্য মেয়েদের বাবা করে পাঠালে!'

'সম্ভবত তোমার একগুঁয়েমি টিট করার জন্যে,' মতামত জানাল রোজি।

'বাঁদরামি হচ্ছে!' চড় মারার জন্যে হাত তুলল বেন্ডার।

'মারলে কিন্তু মাটিতে পড়ে সবার সামনে চেঁচাতে শুরু করব আমি,' হুমকি দিল রোজি।

বিয়ালিক আর রোজেনশাইনকে আড় চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল বেন্ডার। ভাঙা গলায় হাল ছেড়ে জানতে চাইল, 'ইয়াংকি হয়ে যাচ্ছ, এই কি তার আলামত?'

'হতে পারে।'

হতাশ হয়ে আকাশের দিকে তাকাল বেন্ডার। আর তাকাতেই র‍্যাবাইয়ের কথা মনে পড়ল তার। একটুর জন্যে নিশ্চিত স্বর্গলাভ কপালে জুটবে না এ হতে দেয়া যায় না। গর্জন ছেড়ে দৌড় দিল সে সারা আর জুলিয়াসের দিকে। চেঁচাচ্ছে, 'সরো, সরে যাও, সারা! একবার তোকে হাতের নাগালে পেয়ে নিই রে বদমাশ ছোকরা, দেখবি স্রেফ গলা টিপেই মেরে ফেলব।'

চট করে সারার কপালে চুমু এঁকে দিল জুলিয়াস। পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল। পলকে হাওয়া হয়ে গেল তিনফুট উঁচু বেড়া টপকে। মিশে গেল রাস্তার ভিড়ে।

হতাশ হয়ে মাঝপথেই থেমে দাঁড়াল বেন্ডার। কড়া চোখের দৃষ্টিবাণে বড় মেয়েকে শাসন করে ফিরে চলল বারান্দার দিকে।

'কন্টিনেন্টাল ডিভাইড' পাঁচ মাইল দূরে থাকতেই ক্যাম্প করল বেনন আর ইব্রাহিম। দূর দিগন্তে দেখা যাচ্ছে, গায়ে বরফের আচ্ছাদন নিয়ে মাথা তুলে জেগে আছে রাজকীয় রকি পর্বত।

বাক্স থেকে সূঁচ-সুতো বের করে ছেঁড়া জুতো সেলাই করতে বসল র‍্যাবাই।

'পনেরো বছর বয়সে এখানে প্রথম ক্যাম্প করি আমি,' বলল বেনন।

'একা?'

'একা।'

'খুব ভয় লেগেছিল নিশ্চয়ই?' কাজ থামিয়ে জানতে চাইল ইব্রাহিম।

'নাহ্। বিপদ বোঝার মতো বয়স তখনও হয়নি।'

জুতো সেলাই শেষ করে বাক্স থেকে হলুদ কাপড়ের মোড়ক খুলে তাওরাতটা বের করল ইব্রাহিম। বইটা দেখে নাক ঝুলে গেল বেননের। বলল, 'আর আমি কিনা ভেবেছিলাম সোনার ইঁট আছে ওটার ভেতর!'

'সেজন্যেই কি আমার সঙ্গে চলেছ?'

'না।' অপ্রস্তুত দেখাল বেননকে। 'যাচ্ছি এমনিই। কেন যে যাচ্ছি তা নিজেও বুঝতে পারছি না।'

'সোনার ইঁট আছে কেন মনে হয়েছিল?'

'যেভাবে তুমি বাক্সটা আগলে রাখো...এমনকি ঘুমের মধ্যেও ওটাকে কাছ ছাড়া করতে দেখিনি আমি।'

'সোনা ছাড়াও এই নশ্বর পৃথিবীতে দামী অনেক কিছুই আছে।'

'তা তো বটেই,' সায় দিল বেনন। 'হিরে-মুক্তো থাকতে পারে তাও কি আমি ভাবিনি! কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেরল কিনা...' কৌতূহলী চোখে তাওরাতটা দেখল বেনন। 'জিনিসটা কি? দেখে তো মনে হচ্ছে কয়েকশো বছরের পুরনো।'

'তাওরাত। হাজার হাজার বছরের পুরনো।'

'তাওরাত মানে কি?' জানতে চাইল বেনন। 'জিনিসটা কি দামী?'

'খুবই দামী।' গম্ভীর চেহারায় জানাল ইব্রাহিম। 'তাওরাতের অর্থ হচ্ছে শিক্ষা। মুসা নবীর পাঁচ আসমানী কিতাব। জেনেসিস, এক্সোডাজ, লেভিটিকাস, নাম্বার্স আর ডিউটারোনমি। পৃথিবী তৈরির আগেই লেখা হয়েছিল এগুলো।'

'কাগজ তো ছিল না, কিসে লিখেছিল ঈশ্বর?'

'কালো আগুনে।'

'ওই নামগুলো কোথায় যেন শুনেছি বলে মনে হচ্ছে!'

'চার্চে শুনে থাকতে পারো। তোমাদের ওল্ড টেস্টামেন্ট আর আমাদের তাওরাত একই গ্রন্থ।'

'তাহলে দুটো ধর্ম আলাদা কেন?'

'মানুষ করেছে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে ধর্মীয় নেতারা নিজেদের স্বার্থে, ক্ষমতালিপ্সার কারণে ধর্ম আর মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের ফায়দা লুটেছে। ধর্মকে ব্যবহার করেছে তারা ক্ষমতায় যাবার হাতিয়ার হিসেবে। দেখো না, ইহুদি র‍্যাবাইরা ঈসাকে নবী বলে স্বীকার করেনি বলেই ধর্ম ভাগ হয়ে গেছে। আবার দেখো, খ্রিস্টান যাজকরা পরবর্তী রাসুলকে মানেনি বলে ইসলাম ধর্ম নামে আলাদা ধর্ম হয়েছে।'

'তাহলে কোন্ ধর্মটা ঠিক?'

'সবগুলোই মানবতার ধর্ম। কোনটা খারাপ নয়। সবই আল্লাহ্‌র প্রেরিত ধর্ম। তাঁর আদেশ ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়ে না।' তাওরাত, বাইবেল আর কোরান থেকে একটা করে সুরা বেননকে শোনাল ইব্রাহিম। ইংরেজিতে

সাধ্যমতো অনুবাদ করে মর্মার্থ জানাল।

ছন্দময় ঐশ্বরিক বানী মোহাবিষ্টের মতো শুনল বেনন। চার্চে যায়নি কত কাল হলো, অথচ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ওর একতিলও কমেনি, এটা অনুভব করে, অবাক হয়ে গেল আউট-ল।

সুরার ব্যাখ্যা শেষে বিষাদ মাখা চেহারায় রকি পর্বতের দিকে তাকাল ইব্রাহিম। কথা যখন বলল, মনে হলো অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে ওর কণ্ঠস্বর।

'সিনাই পাহাড়ে স্বয়ং ঈশ্বর নিজে মুসাকে টেন কমান্ডমেন্ট আর বুক অভ কভেন্যান্ট দিয়েছিলেন। ছিল আমার কাছে টেন কমান্ডমেন্ট। আমি অসহায় বলে ডাকাতরা ওটা কেড়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে।'

'বলেছ তুমি,' ধীরে ধীরে বলল বেনন। প্রতিজ্ঞা করল, যদি সম্ভব হয়, ভাগ্য যদি ওকে ওই শয়তান লোকগুলোর মুখোমুখি করে দেয়, তাহলে ঠিকই যাজকের প্রিয় জিনিসটা উদ্ধার করার চেষ্টা করবে ও। সিদ্ধান্ত নিয়ে ইব্রাহিমের দিকে তাকাল বেনন। অনুরোধ করল, 'আরও কয়েকটা সুরা পড়ে শোনাও না।'

শুরু করল ইব্রাহিম। পটপট করে আগুনে পুড়ছে শুকনো কাঠ। আজ রাতে ঠাণ্ডা পড়েছে বেশ। দূরে আবছা দেখা যাচ্ছে রকি পর্বতমালা। রকির গা ছুঁয়ে পাইনের সুবাস বয়ে নিয়ে ভেসে আসছে মৃদু বাতাস। অদ্ভুত এক প্রশান্তি মাখা পরিবেশে একে একে পড়ে গেল ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা আর মুহাম্মদ এই তিন রাসুলের কাছে সমর্পিত কাব্যগুলো।

মাঝে মাঝেই ইতস্তত করে মানে জানতে চাইল বেনন। আন্তরিকতার সঙ্গে সাধ্য মতো ব্যাখ্যা করে বোঝানোর চেষ্টা করল ইব্রাহিম।

নিমগ্ন হয়ে গেল ওরা দু'জন দুই দুনিয়ার মানুষ।

তেলাপোকাকে পক্ষী বললে পাখি সমাজের যে অবমাননা করা হয়, স্টিংকিং ক্রীক শহরকে শহর বললে শহরেরও তেমনি অপমান লাগার কথা। বসতিটা আসলে একটা গ্রামের মর্যাদা পাবারও যোগ্য নয়।

উত্তর আর পশ্চিমে যারা যাচ্ছে তাদের জন্যে স্টিংকিং ক্রীক শুধুই একপল বিশ্রামের জায়গা। যারা গ্রেট প্লেইন পার হতে গিয়ে মত পরিবর্তন করে ক্যালিফোর্নিয়ার বদলে অরিগন যাবার চিন্তা করছে, তারাও এখানে থামে।

স্টিংকিং ক্রীকের বড় রাস্তাটা কাদাময়। একমাত্র কাঠের বাড়ি হচ্ছে সেলুন, জেনারেল স্টোর, হোটেল আর স্টেবল। বাকি সব তাঁবু গোছের। কোনটা ক্যানভাসের, কোনটা ব্ল্যাংকেটের আবার কোনটা বা ঝোপঝাড়ে তৈরি। পাথরের বাড়িও আছে কয়েকটা, কাদা গেঁথে তৈরি। বৃষ্টি হলেই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। প্রায়ই বৃষ্টির তোড়ে স্টিংকিং ক্রীকের অর্ধেকের বেশি ভেসে যায়।

রাতের আশ্রয় আর খাবারের সন্ধানে এই *চমৎকার* বস্তিতে এসে হাজির হলো বেনন আর ইব্রাহিম। হোটেলের সামনে ঘোড়া বেঁধে নামল ওরা। পকেট একদম ফাঁকা, কাজেই বেনন গেল হোটেলের ভাড়া জানতে।

ইব্রাহিমও বেননের পিছু পিছু যেত, কিন্তু থেমে গেল নির্জন রাস্তার উল্টো

পাশে নজর পড়তেই।

একটা হিচনেইলের সামনে দাঁড়িয়ে আলাপ করছে চারজন লোক। তাদের তিনজন ইব্রাহিমের অতি চেনা। ওদের মুখ জীবনেও ভুলবে না ও।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ইব্রাহিম। এতই মগ্ন হয়ে আছে যে আরেকটু হলে একটা ওয়্যাগনের তলায় চাপা পড়ত। ড্রাইভারের গালাগালিও শুনতে পেল না ও। ওর উৎকর্ণ কানে ধরা পড়ল চতুর্থ লোকটার অনভ্যস্ত ইংরেজি। পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল লোকটা!

'এই যে তুমি!' চেঁচাল র‍্যাবাই। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও!'

আলাপ থামিয়ে ফিরে চাইল লোকগুলো। দুই ডিগস ভাই আর বুড়ো স্টেবল মালিকের চেহারা দেখে মনে হলো না ওকে তারা চিনতে পেরেছে। বিদেশি লোকটার কনুই ধরে কয়েক কদম সরে এলো ইব্রাহিম। লোকটা কথা বলার জন্যে হাঁ করতেই তাড়াতাড়ি বলল, 'মস্ত বিপদে পড়ে গেছ তুমি। ওই লোকগুলো, যারা তোমার সঙ্গে কথা বলছিল, আসলে ডাকাত।'

'কিহ্!'

'হ্যাঁ!'

'আমার তো ওদের কথা শুনে তেমন মনে হলো না।'

'আমারও মনে হয়নি। কি বলেছে ওরা তোমাকে? বলেনি যে ওদের মা নিউমোনিয়ায় মারা যাচ্ছে, সান ফ্রান্সিসকোয় তাকে দেখতে যেতে হবে?'

'না। অসুস্থ মাকে দেখতে সল্ট লেকে যাবে ওরা।'

'আমার বেলায় বলেছিল সান ফ্রান্সিসকো।'

দ্বিধান্বিত দেখাল বিদেশিকে। স্পষ্টতই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

'দয়া করে বিশ্বাস করো আমার কথা,' অনুনয় করল ইব্রাহিম। 'চলে যেতে বলো ওদের। ওরা বাটপার ছাড়া আর কিছুই নয়।'

একবার ডিগস আর বুড়োকে দেখে নিয়ে ইব্রাহিমের দিকে তাকাল লোকটা। আগেও শুনেছে এরকম ঘটনা আমেরিকাতে প্রায়ই ঘটে, কাজেই অবিশ্বাস দূর হয়ে গেল মন থেকে। ফিসফিস করে ধন্যবাদ দিয়েই পেছাতে লাগল সে। ডিগস ভাইদের এগোতে দেখে কয়েক কদম গিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল।

ডিগসদের পথ আগলে দাঁড়াল ইব্রাহিম। বুকে সাহস এনে বলল, 'ভেবো না ওকেও আমার মতোই ঠকাতে পারবে!'

'দাঁড়াও, মিস্টার!' পেছন থেকে পলায়নপর লোকটার উদ্দেশে চেঁচাল ডেরিল।

'দেরি হয়ে গেছে এখন,' জানাল র‍্যাবাই।

ওর সামনে থেমে দাঁড়াল ক্ষিপ্ত ডেরিল। চোখ গরম করে তাকাল। 'কি বলেছ ওকে তুমি?'

ডেরিলের পাশে এসে দাঁড়াল মিস্টার জোন্স। 'কে এই লোকটা?'

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ম্যাট। চোখ কুঁচকে চিন্তা করছে। হঠাৎ বলল, 'মনে পড়বে এক্ষুণি। ওকে আমি চিনি। চিন্তাটা পেটে আছে; মুখ পর্যন্ত এলেই

হয়।'

'আমার টাকা ফেরত দাও,' বলল ইব্রাহিম। ভয়ে বুক কাঁপছে ওর, কিন্তু চেহারা দেখে কে বলবে। বুক টানটান করে দাঁড়িয়েছে।

'তুমিই সেই কাঙ্গাল ইহুদি!' হঠাৎ ওকে চিনতে পারল ম্যাট।

'আমার রুপোর পাতটাও ফেরত দিতে হবে তোমাদের,' শান্ত স্বরে বলল ইব্রাহিম।

'বলে কি ব্যাটা!' ছোটখাট একটা গর্জন ছাড়ল ডেরিল।

'জার্মান লোকটাকে কি বলেছ তুমি?' জানতে চাইল মারমুখো ডেরিল।

'যা সত্যি তাই বলেছি।' এক পা পিছাল ইব্রাহিম। 'বলেছি তোমরা আসলে ডাকাত, ঠক, বাটপার–মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নাও।'

'তবে রে শালা!' ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেরিল ইব্রাহিমের ওপরে। বাকিরা ডেরিলকে সাহায্য করল।

ম্যাটের ঘুসিতে ঠোঁট কেটে গেল ওর। ডেরিল ওকে পেছন থেকে শক্ত করে ধরে থাকল দু'হাতে। এদিকে দমাদম ঘুসি মারছে জোন্স আর ম্যাট। জোন্স পেটে মেরে সরে দাঁড়ালেই ম্যাট আঘাত করছে ওর মুখে। দুটো মাড়ির দাঁত নড়ে গেল ইব্রাহিমের। ঘনঘন ঝাঁকি খেল মাথাটা। আশা করল বেনন চলে আসবে। সাহায্য চেয়ে চেঁচাতে চাইল ও; কিন্তু পারল না।

জ্ঞান হারিয়ে কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ও।

ওর চুলের মুঠি ধরে চেহারাটা ভাল করে দেখল ডেরিল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এই ব্যাটাই নিউ ইয়র্কে আমাদের ঠকিয়েছিল। ভেবেছিলাম টাকাওয়ালা রসাল আদমি, কিন্তু পরে দেখা গেল প্রায় ফক্কা!'

'চলো, কেটে পড়ি; কেউ এসে পড়তে পারে,' বলল ম্যাট।

সায় দিয়ে রওয়ানা হলো ডেরিল। পেছনে চলল বাকি দু'জন। দূরে রেখে আসা ওয়্যাগনের দিকে ফিরে চলেছে ওরা।

ইব্রাহিমের চেতনা ফিরল স্টেবলে। উঠে বসতে গিয়েও ব্যথা পেয়ে আবার শুয়ে পড়ল ও। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। মনে হচ্ছে উদ্ধত ফেরাউনের মাথা, ভেতরে ঢুকে কামড়াচ্ছে মশা।

'ওঠার দরকার নেই, শুয়ে থাকো, দোস্ত,' বেননের পরিচিত গলা শুনতে পেল ও।

ইব্রাহিমের চোখ মোমের হলদে আলোয় বেননকে খুঁজে নিল। ওর পাশেই ঝুঁকে বসে আছে আউট-ল। কপালে জলের পট্টি দিয়ে দিচ্ছে।

'কেমন লাগছে এখন?'

চারপাশে তাকাল ইব্রাহিম। বোঝার চেষ্টা করল কোথায় আছে।

'হোটেলে ভাড়া বেশি, তাই স্টেবলেই আপাতত আস্তানা গেড়েছি আমরা,' জানাল বেনন।

'ওরা আমার টেন কমান্ডমেন্ট দেয়নি,' ফিসফিস করে বলল ইব্রাহিম।

'মাইনারদের মুখে শুনেছি কি ঘটেছে,' বলল বেনন। 'ওরা বলল দূর

থেকে দেখেছে তিনজনের বিরুদ্ধে একা লড়েছ তুমি।'

'আমি লড়িনি, যা আমার তাই শুধু চেয়েছিলাম ওদের কাছে।'

'ডিগসদের ছোট ভাইটার বয়স কত?'

'চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে।'

'আর মিস্টার জোন্স?'

'আরও বেশি। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন।'

'সেই তুলনায় খারাপ মারেনি দেখা যাচ্ছে!' মাথা নেড়ে পানিতে ভিজিয়ে কাপড়টা আবার ইব্রাহিমের কপালে রাখল গম্ভীর বেনন। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে র‍্যাবাইয়ের। 'না, খারাপ একে কিছুতেই বলা যাবে না।'

'আমি ইহুদি তো…ওরে বাবা…মরে গেছি…তাই মানুষ বলেই মনে করেনি।'

'ওদের মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড় যে তার আকৃতি কেমন?'

'আমার দ্বিগুন। কেন? কি আসবে যাবে তোমার এসব জেনে?'

'অনেক কিছু। গায়ের জোরে না পারলে ওই লোকটাকে গুলি করতে হতে পারে আমার।'

'আমি খুনোখুনী চাই না।' দাঁতে দাঁত চেপে উঠে বসল ইব্রাহিম। যথেষ্ট শীত, তবুও এটুকু পরিশ্রমেই কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেল ওর।

'কখনও কখনও গোলাগুলিতে না গিয়ে উপায় থাকে না।'

'উপায় খুঁজে নিতে হয়।'

'তুমি চাও না আমি প্রতিশোধ নিই?'

'না। প্রতিশোধ নেয়ায় মহত্ত্ব নেই। মহত্ত্ব আছে ক্ষমায়। তোমাকে তো আমি টেন কমান্ডমেন্ট শুনিয়েছি, মনে নেই?'

'আছে মনে। তাই বলে কয়েকটা বদমাশকে এমনি এমনি ছেড়ে দেব?'

'একটা কাজ করতে পারো। চেষ্টা করে দেখতে পারো গোলমালে না জড়িয়ে ওটা উদ্ধার করা যায় কিনা।' বসে থাকার পরিশ্রম সহ্য না হওয়ায় শুয়ে পড়ল ইব্রাহিম। চোখ বুজে আসছে ওর ঘুমে। হাই তুলে জানতে চাইল, 'কয়টা বাজে?'

'বারোটা।'

'রাত বারোটা? তা কি করে হয়!'

হাসল বেনন। 'তুমি আট ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলে। আমি তো ভেবেছিলাম মরেই যাবে।'

'এতো শিগগির নয়!' খড়ে মাথা এলিয়ে দিল ইব্রাহিম। 'আমাকে আরও অনেক দূর যেতে হবে। কালকে ভোরে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ো, বন্ধু।'

'গত কয়েক ঘণ্টায় আকাশের কি হাল হয়েছে দেখোনি তুমি,' আপত্তি জানাল বেনন। 'বাইরে বের হওয়া যাবে না কালকে।'

'কথা দিয়েছি, কাজেই যেতে আমাকে হবেই; আবহাওয়া যেমনই হোক আমাকে কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল র‍্যাবাই।

'সেক্ষেত্রে একাই যেতে হবে তোমাকে,' বলল বেনন। বুঝতে পারছে

লোকটা জানে না কি বিপদে পড়তে হবে তুষার ঝড়ের কবলে পড়লে। একে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচানো দরকার। ওকে ছাড়া নিশ্চয়ই রওয়ানা হতে চাইবে না র‍্যাবাই! 'কালকে আমরা বিশ্রাম নেব, কেমন?'

'না।'

রেগে গেল বেনন অবুঝ লোকটার বোকামিতে। বলল, 'ঘুসি খেয়ে নিশ্চয়ই মাথাটা বিগড়ে গেছে তোমার।'

'ব্যথা করছে বটে, তবে বিগড়ায়নি। কালকেই যাব।'

'অতই যদি তোমার তাড়া তাহলে শনিবার দিন তুমি এগোলে না কেন?'

'ধর্মে মানা আছে। শনিবার সাবাথ, ওদিন কোথাও যাওয়া চলবে না।'

'আমি মরতে রাজি নই, কাজেই যাচ্ছি না তোমার সঙ্গে।'

'দীর্ঘদিন বেঁচে থাকো, আমার দোয়া রইল।'

'এলাকাটা চিনি আমি। বলছি টিকবে না তুমি দু'ঘণ্টাও।'

'সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে।'

'বেশ,' রেগে মেগে বলল বেনন, 'ইচ্ছে হলে তুষার চাপা পড়ে মরোগে যাও। ভুলেও আশা কোরো না কষ্ট করে ভোরে উঠে তোমাকে জাগিয়ে দেব আমি।'

চোখ বুজল ইব্রাহিম। 'এতোদূর পথ আমার সঙ্গে এসেছ বলে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর হ্যাঁ, কাল সকালে ঘুম থেকে উঠিয়ে আর বিরক্ত করব না, এখনই বরং বিদায় নিয়ে রাখি। বিদায়, বেনন! সান ফ্রান্সিসকোতে এলে দেখা কোরো কিন্তু।'

'অতদূর তুমি পৌঁছতে পারবে না, বন্ধু!'

দেয়াল লাগোয়া একটা স্টলের পাশে বিছানা পাতল বেনন। শুয়ে পড়ে বিরক্ত চেহারায় বিড়বিড় করে বলল, 'বোকা গাধাটা নিজেও মরবে, ওর সঙ্গে যে থাকবে তাকেও মারবে; কপাল ভাল যে নির্বোধটার ব্যাপারে আমার চোখ খুলে গেছে!'

'কিছু বলছ?'

'তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি।' মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল বেনন। ঘুটঘুটে আঁধারে ডুবে গেল গোটা স্টেবল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই ইব্রাহিম দেখল খচ্চর আর ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে বেনন।

সাত

দু'হাজার মাইল বিস্তৃত রকি পর্বতে বেশ কয়েকটা পাস আছে। বিখ্যাত অভিযাত্রীদের নামে ওগুলোর বেশিরভাগের নাম। যেমন করোনাযো পাস, লাগ্লোরিয়েটা পাস, মিডানো পাস ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে বড় যে পাসটা, ওটার

নাম কোন মানুষের নামে নয়। সাউথ পাস আঠারো মাইল চওড়া। ওটাই একমাত্র পাস যেটা ধরে এগোলে রকি পর্বতে আরোহণ না করে পার হওয়া সম্ভব।

সাউথ পাস ধরে ভ্রমণ করলে পানির অভাবে মরার আশংকা কম। তবে পশ্চিম যাত্রী সাদা মানুষদের জন্যে দুঃখের কথা হলো, একথা তাদের আগে ইন্ডিয়ানরাই জেনেছে।

পোড়া ওয়্যাগনটার সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর চেহারায় লাশগুলো দেখল বেনন। সব মিলিয়ে নয়জন। প্রত্যেকের মাথার ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে ইন্ডিয়ানরা। কুঠারের আঘাতে কাটা পড়েছে কারও কারও হাত-পা। মরার আগে শরীরে বেঁধা তীরগুলো বের করার চেষ্টা করেছিল, বুকের কাছে মুঠো হয়ে আছে সবার হাত। কষ্ট পেয়ে মরেছে লোকগুলো।

ষাঁড়গুলোও রেহাই পায়নি। জবাই করা হয়েছে ওগুলোকেও।

বেশ কয়েকদিন আগের ঘটনা। পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এখন লাশগুলো।

'ক্রো ইন্ডিয়ান,' ইব্রাহিম পাশে এসে দাঁড়ানোয় বলল বেনন। 'ষাঁড়ের দরকার নেই ওদের।'

'কি নৃশংস!' বেশ কিছুক্ষণ লাগল ইব্রাহিমের কথা খুঁজে পেতে।

'এটাই স্বাভাবিক,' বলল বেনন, 'মশা মাছির মতো মরে এখানে মানুষ। কিছুদিন আগেও নর্থ প্ল্যাট নদী পেরুতে গিয়ে প্রতিদিন গড়ে দু'জন করে মারা যেত।'

'চলো, চলে যাই এখান থেকে,' কাঁপা-কাঁপা স্বরে বলল র‍্যাবাই। 'ভয় লাগছে আমার।'

মাথা নাড়ল বেনন। 'কবর দিতে হবে লোকগুলোকে। এটুকু ওদের প্রাপ্য।'

দু'ঘণ্টা লাগল ওদের বরফে গর্ত খুঁড়ে সবাইকে কবর দিতে।

ইব্রাহিম এগোবার কথা বলতেই দ্বিমত পোষণ করল বেনন, 'ইন্ডিয়ানরা সামনেই কোথাও আছে। আগে বাড়লেই ওদের খপ্পরে পড়ব আমরা।'

'তাহলে কি করা উচিত?'

'ফিরে যাব, আবহাওয়া ভাল না হওয়া পর্যন্ত স্টিংকিং ক্রীক থেকে নড়ব না।'

'বেরিয়েছি যখন ফিরছি না আমি,' একগুঁয়েমি ইব্রাহিমের চেহারায়। 'আর কোন উপায় থাকলে বলো।'

মাথা চুলকাল বেনন। আনমনে বিড়বিড় করল, 'দাঁড়াও, ভেবে দেখি।...দক্ষিণে কন্টিনেন্টাল পিক; ওটার মাইল খানেকের মধ্যে গেলেই ক্রোদের হাতে ধরা পড়তে হবে। উত্তরে উইন্ড রিভার রেঞ্জ। অত উঁচু পাহাড় পেরনো যাবে না। তবে যদি ওটার পুব দিক দিয়ে এগোই, তাহলে হয়তো ইউনিয়ন পাসে পৌঁছুতে পারব।'

'কিরকম সময় লাগতে পারে ওখানে পৌঁছাতে?'

'কয়েক সপ্তাহ, যদি আগেই বরফে জমে না মরি।'

'আর কোন পথে যাওয়া যায় না?'

'যায়, তবে ঝুঁকি বেশি।'

'সবখানেই ঝুঁকি আছে। তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে যে-পথে সে-পথেই যাব আমরা।'

'বেশ, তাহলে সুইটওয়াটার রিভার ধরে এগোব আমরা। মাইল খানেক আগে যে ঝর্নাটা পেরিয়ে এলাম আবার ফিরে যেতে হবে সেখানে। পাহাড়ের মাঝ দিয়ে পথ করে এগিয়েছে ওটা। ওটার কিছুদূর পশ্চিমেই লিট্‌ল্ স্যান্ডি ক্রীক। আমি যখন ওদিকে ট্র্যাপ করতাম তখন শুনেছিলাম গোপন একটা পাস আছে ওদিকে কোথাও।' ইব্রাহিমের দিকে তাকাল বেনন। 'তবে আগেই বলে রাখছি, আমি কিন্তু খুঁজে পাইনি ওটা।'

খচ্চরের পিঠে উঠে বসল ইব্রাহিম। উৎসাহ ভরে বলল, 'যাই তো চলো, দেখবে ঠিকই পাসটা খুঁজে বের করে ফেলেছি আমি।'

র‍্যাবাইয়ের পাশে পাশে চিন্তিত মনে চলল বেনন।

পেঁজা তুলোর মতো তুষার পড়ছে। সেই সঙ্গে শোঁ-শোঁ বয়ে চলেছে কনকনে ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া। মাঝে মাঝেই শুরু হচ্ছে বৃষ্টি। মাটিতে পড়ে বরফ হয়ে যাচ্ছে ফোঁটাগুলো। জঘন্য একটা পরিবেশ। যতক্ষণ সম্ভব সুইটওয়াটার অনুসরণ করে এগিয়েছে বেনন আর ইব্রাহিম। এখন এগোচ্ছে আন্দাজে ভর করে। দৃষ্টিসীমা তিন ফুটেরও কম, তবে বেনন জানে সামনেই কোথাও আছে তেরো হাজার ফুট উঁচু উইন্ড রিভার পিক।

'বাপরে, কি ঠাণ্ডা!' সবগুলো কাপড় পরেও ঠকঠক করে কাঁপছে ইব্রাহিম।

দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে বেননের। সায় দিল ও। 'তা ঠিক।' তারপর বলল, 'তবে শীত আসলে এখনও পড়েনি। পড়লে বুঝতে!'

পরদিন ওরা গাছের সারি পেছনে ফেলে পর্বতের অনেকটা ওপরে উঠে এলো। খুঁজছে এমন একটা পাস যে পাসের অস্তিত্ব আছে কিনা সে ব্যাপারে ওরা নিজেরাই নিশ্চিত নয়।

বেড়েছে তুষার ঝড়ের প্রচণ্ডতা। ঘোড়ার রাস ধরে পায়ে হেঁটে ওপরে উঠছে বেনন খাড়া ট্রেইল ধরে। পেছনে আসছে ইব্রাহিম।

সহসা খেয়াল করল বেনন, অজান্তেই দূরে সরে যাচ্ছে র‍্যাবাই। কিছুক্ষণ এভাবে চললে পথ হারিয়ে শীতে জমে মরবে লোকটা।

'খচ্চরের রাস ছেড়ো না,' পরামর্শ দিল বেনন। 'ওটাই তোমাকে আমার পিছু পিছু নিয়ে আসবে।'

ঝড়ের মধ্যে আবছা ভাবে শুনতে পেয়ে নির্দেশ পালন করল যাজক।

আধঘণ্টা পরে সত্যিকার তাণ্ডব শুরু হলো। ঘোড়া আর খচ্চরটাকে মাটিতে শুইয়ে ওগুলোর আড়াল নিতে বাধ্য হলো ওরা। ব্ল্যাংকেটে গা মুড়ে নিল যাতে শীতে মারা না যায়।

তিন ঘণ্টা পরে থামল ঝঞ্ঝা। ততোক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে ওরা।

ঘুম ভাঙার পরে ইব্রাহিমের কয়েক সেকেন্ড লেগে গেল বুঝতে যে বেনন

ক্যাম্পে নেই। তাড়াতাড়ি ব্ল্যাংকেট সরিয়ে চারপাশে তাকাল ও। আবছা সাদাটে আভা ছড়াচ্ছে বরফের বিস্তৃতি। এখনও হালকা তুষারপাত হচ্ছে, তবে সন্ধের ধূসর আকাশের বুকে দেখা যাচ্ছে দু'একটা তারা। চ্যালেঞ্জারকে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নাকে হাত বুলিয়ে আদর করে দিল ইব্রাহিম। বলল, 'সময়টা তোর খারাপ যাচ্ছে তা বুঝতে পারছি না এতো বোকা তুই আমাকে মনে করিস না যেন।'

থরথর করে কেঁপে উঠল চ্যালেঞ্জার।

'বিশ্বাস কর,' বলল ইব্রাহিম, 'আমারও ইচ্ছে করছে গরম গরম স্যুপ খেয়ে ফায়ার প্লেসের তাপ গায়ে মেখে আরামে ঘুম দিতে।' চ্যালেঞ্জারকে একদলা চিনি দিল সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'চলে গেছে বেনন। এখন শুধু তুই আর আমি রে, চ্যালেঞ্জার! ওকে তুই দোষ দিতে পারিস না। একা বেঁচে থাকা ওর পক্ষে অনেক সহজ হবে।'

পাহাড়ের চুড়ো টপকে একটা পাখিকে উড়ে যেতে দেখে চ্যালেঞ্জারকে ও বলল, 'ভেবে দেখ, তোর পাখা থাকলে আজকে এই অবস্থায় পড়তে হয় না তোকে আর আমাকে।'

বরফে ঢাকা দুর্গম এই পর্বত। কোথাও কোন শব্দ নেই। নিঃসীম নির্জনতা। হতাশ লাগল ওর। বসে পড়ল তুষারে। সূর্য নেই, কাজেই জানে না পশ্চিম কোন্‌দিকে। কালকে যদি ঘন তুষার না পড়ে, যদি সূর্য দেখা যায়, তাহলে রওয়ানা হতে পারবে ও।

বসে বসেই প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল, ইব্রাহিমের ঝিমানি কাটল জোরাল শব্দের প্রতিধ্বনিতে। 'উইপ্পি! উইপ্পি! ইয়াহুহু!'

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল ইব্রাহিম। ইন্ডিয়ান! আসছে ওরা রণহুঙ্কার ছেড়ে! সাউথ পাসের কাছে দেখা মৃতদেহগুলোর কথা মনে পড়তেই বুকের খাঁচায় লাফাতে লাগল ওর হৃৎপিণ্ড।

দেখতে পেল ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত ছুটে আসছে একজন লোক। পালাবার পথ নেই! হাল ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকল র‍্যাবাই। মরতেই যখন হবে তো পালাবার চেষ্টায় খামোকা পরিশ্রম করে লাভ কি!

লোকটা কাছে আসতেই চিনতে পারল ও। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। ধারণা করল পাগল হয়ে যাচ্ছে ও, নাহলে এ কি করে সম্ভব!

ওর পাশে ঘোড়া থামিয়ে নামল বেনন। র‍্যাবাইকে উজবুকের মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসতে হাসতে বলল, 'বললে বিশ্বাস করবে? খুঁজে পেয়েছি আমি পাসটা! মাত্র মাইল খানেক দূরে। আফসোসের কথা আমার নামে নাম রাখবে না ওটার কেউ।'

'বেনন!' এতোক্ষণে কথা ফুটল ইব্রাহিমের মুখে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল বন্ধুকে। ভেবে পেল না ভুল বুঝেছিল বলে কিভাবে ক্ষমা চাইবে ওর কাছে।

'আবিষ্কারক বেনন বলো!'

ওর সম্বন্ধে কি ভেবেছিল শুকনো মুখে জানাল ইব্রাহিম। মনে করেছিল

দুঃখ পাবে বেনন। কিন্তু হাসল আউট-ল। বলল, 'যে কেউই এরকম ভাববে। এতে দোষের কিছু নেই। তোমার জায়গায় আমি হলেও একই চিন্তা দোলা দিয়ে যেত আমার মাথায়।'

বেননের মহত্ত্বে অভিভূত হয়ে পড়ল ইব্রাহিম। হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসল। ঈশ্বরের কাছে দোয়া চাইল, যেন একদিন সুস্থ জীবনে ফিরতে পারে, মানুষের সম্মান পেয়ে যেন অনেক বড় হয় বেনন।

পরদিন সকালটা এলো সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে। সাধারণত বড় ঝড়ের পরে এরকম পরিষ্কার আবহাওয়া দেখা যায় এ অঞ্চলে।

আকাশে নীল আর গোলাপী রঙের খেলা। একফোঁটা মেঘ নেই।

ওয়াইয়োমিঙের দক্ষিণ-পশ্চিমের ঢেউ খেলানো বৃক্ষহীন ন্যাড়া টিলাগুলো পেরিয়ে সাবলেট কাটঅফের ট্রেইল ধরল ওরা। লিট্‌ল্ স্যান্ডি পেরিয়ে বিগ স্যান্ডি; সেখান থেকে গ্রীন রিভারের উজান বেয়ে ফন্টেনেলি ক্রীক। এক নাগাড়ে পথ চলল ওরা। 'গ্রিন রিভার–বিয়ার রিভার ডিভাইড' পার হয়ে পৌঁছে গেল আজকের আইডাহোয়, বেয়ার লেকের উত্তর প্রান্তে।

বালুকাবেলায় কাপড় চোপড়, মহিষের চামড়া, আর ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় কয়েকটা মরচে পড়া আগ্নেয়াস্ত্র পেল ওরা। একটু খুঁজতেই চোখে পড়ল একসারি কবর।

ব্যথিত চেহারায় বিড়বিড় করল বেনন, 'কিভাবে মরেছে তা জানার কোন উপায় নেই। হয়তো জ্বর হয়েছিল, বা ইন্ডিয়ান; বা, বলা যায় না, হাজার হাজার মাইল পথ পেরিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিল হয়তো। অনেকেই হাল ছেড়ে দেয়।'

হৃদয় দিয়ে কথাটা বুঝল ইব্রাহিম। বেনন পাশে না থাকলে সন্দেহ নেই যে আজকে ওর নিজের পরিণতিও এরকমই হতো।

'খুব দুঃখজনক,' অবশেষে বলল ও।

কয়েকটা কবর খুঁড়ে লাশ টেনে বের করা হয়েছে। হাড় পড়ে আছে শুধু। আঙুল তুলে একটা ভাঙা করোটি দেখাল বেনন। 'নেকড়ের কাজ।'

কয়েক ঘণ্টা পথ চলার পরে উত্তরে, বেয়ার নদী যেখানে ইউয়ের মতো বাঁক নিয়েছে, সেখানে একটা শহর পেল ওরা। ইব্রাহিম জানল না বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে বেনন।

শহরের রাস্তাটা পাকা না হলেও বেশ বড় শহর। অনেকগুলো কাঠের বাড়ি আছে রাস্তার দু'ধারে। কোন কোনটা দোতলা। এছাড়া আছে বেশ কয়েকটা স্টোর। সাইনবোর্ড পড়তে পড়তে এগোল ইব্রাহিম। এপিসকোপাল চার্চ, স্কুল হাউজ, জুড্‌স্ মীট মার্কেট, অ্যাডভোকেট জর্জের অফিস, ওভারবের ড্রাই গুড্‌স্, পাওয়েলস সেলুন ইত্যাদি।

নাপিতের দোকান পেরিয়ে ফার্স্ট ব্যাংক অভ সোডা স্প্রিংসের সামনে থামল ওরা। রাস্তার উল্টোদিকে আরও একটা ব্যাংক আছে–জেরেমিজ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক। ওটার চাকচিক্য আরও বেশি। ঘোড়ার রাশ ইব্রাহিমের হাতে ধরিয়ে দিল বেনন। বলল, 'এখানেই অপেক্ষা করো, আমি যাচ্ছি; দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে আসি।'

'ঘোড়া বেঁধে আমিও আসি?'

'না। তিন-চার মিনিটের বেশি লাগবে না। নোড়ো না এখান থেকে।'

সোজা গিয়ে ফার্স্ট ব্যাংক অভ সোডা স্প্রিংসে ঢুকল বেনন।

ভেতরে কাস্টোমার আছে ছয়জন। লাইন পাশ কাটিয়ে টেলারের কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল বেনন। কাঁচের পেছনে বসে আছে বুড়ো টেলার। বেননকে দেখে চশমাটা ঠিক করে তাকাল। 'কি করতে পারি তোমার জন্যে, ইয়ং ম্যান?'

'আপনাদের রক্তচোষা সুদখোর মালিক কি অফিসে আছে?'

'হ্যাঁ, মানে…না।'

'তাকে দরকারও নেই আমার।' হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের করে সবার ওপর ঘুরিয়ে এনে বুড়োর দিকে তাক করল বেনন। 'প্রতি বৃহঃস্পতি বারের মতো কালকেও নিশ্চয়ই টাকার চালান এসেছে? নম্বরও নিশ্চয়ই এখনও টুকে রাখা হয়নি? আপনাদের থলেটা বের করুন। সাবধান, চালাকি করতে যাবেন না, আমি এখানে মশকরা করতে আসিনি। একটু বেচাল দেখলেই গুলি করে দেব।'

খদ্দেররা সবাই মধ্যবয়স্ক। অস্ত্র ঝোলায়নি, কাজেই ঝামেলায় জড়াবার লোক নয় কেউ। বলতে হলো না, আপনিই মাথার ওপরে হাত উঠে গেল তাদের।

'কে তুমি? তুমি কি ম্যাককয় দলের লোক?' কাঁপা স্বরে জানতে চাইল টেলার।

চোখ গরম করে তাকাল বেনন। 'অত কথায় আপনার কাজ কি? যা বলেছি তাই করুন। আমি পাঁচ গুনব, তার আগেই থলেটা হাতে না পেলে খারাবি আছে আপনার কপালে।'

'পার পাবে ভেবো না তুমি,' বলল একজন কাস্টোমার। 'ম্যাককয়ের ডানহাতকে কদিন আগে গুলি করে মেরেছে আমাদের শেরিফ।'

চুপ করে থাকল বেনন। বুড়ো টেলার টাকার থলেটা কাঁচের এপারে ঠেলে দিতেই আদর করে নেড়ে দিল ও টেলারের ছাগলা দাড়ি। তারপর থলে হাতে নিয়ে দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে এলো ব্যাংক থেকে।

বাইরে এসেই সিক্সগান খাপে পুরল বেনন। থলেটা গুঁজে নিল কোটের পকেটে।

'টাকা তুলেছ?' জানতে চাইল ইব্রাহিম। বেনন মাথা দোলাতেই বলল, 'রাস্তার উল্টোপাশে ভাল একটা রেস্তোরা আছে। এসো দুপুরের খাওয়াটা এখানেই সেরে নিই।'

'এই শহরে আর এক মুহূর্তও থাকব না আমি।' ইব্রাহিমের খচ্চরের পেটে একটা খোঁচা দিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসল বেনন। রাসে ঝাঁকি দিল। ল্যাংড়া খচ্চরের পেছনে ছুটতে লাগল ওর ঘোড়াটা। বিস্মিত হয়ে গেল ও চ্যালেঞ্জারের গতি দেখে। মালিকের বিপদ বুঝে জান বাজি রেখে ছুটছে ওটা।

কোনমতে তাল সামলে চেঁচিয়ে আপত্তি জানাল ইব্রাহিম। 'কিন্তু কেন!'

'কারণ এই শহরে ভদ্রলোক থাকে না।'

ওদের পেছনে হৈ-হল্লা শোনা গেল। গর্জে উঠল কয়েকটা সিক্সগান। বেশিরভাগ বুলেটই বালিতে নাক গুঁজল। দু'একটা চলে গেল ওদের কানের পাশ দিয়ে।

'ওরা গুলি করছে কেন!' চেঁচাল আতঙ্কিত ইব্রাহিম।

আর গোপন রাখা যাবে না বুঝে বেনন স্বীকার করল, 'ওদের ব্যাংকটা আমরা ডাকাতি করে এলাম যে!'

'ডাকাতি! আমরা?' চোখ কপালে উঠল যাজকের। 'আমরা মানে?'

'তুমি আর আমি।'

'পাগল হয়ে গেছ তুমি!'

মাথা নাড়ল বেনন।

দু'মিনিট পরে জটলার মধ্যে শোনা গেল শেরিফের গলা। 'লোকটা ম্যাককয় দলের। পাসি লাগবে ওদেরকে ধরতে। কে কে যাবে হাত তোলো।'

একটা হাতও উঠল না। মরার সখ হয়নি কারও।

'জাহান্নামে যাও তুমি,' বলল একজন।

'কে! কে বলল ওকথা?' রাগে লাল চেহারায় ভিড়ের মধ্যে নজর বোলাল শেরিফ।

'আমি।' কয়েকজনকে ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল দৈত্যাকৃতি এক লোক। নাম তার জন। খালিহাতে পিটিয়ে মানুষ মেরে ফেলতে পারে বলে নাম আছে।

'ও, তুমি!' ঠাণ্ডা মেরে গেল শেরিফ। বোঝাবার সুরে বলল, 'তুমি শোনোনি যে লোকটা ব্যাংক ডাকাতি করেছে?'

'শুনেছি। ওই হারামি লোকটার ব্যাংকে আমার এক পয়সাও নেই। তারওপর আমার র‍্যাঞ্চটা মর্টগেজের সময় কমিয়ে দিয়ে দখল করেছে ও।"

'তাই বলে ডাকাতি সহ্য করে নেবে তোমরা?' হাড্ডিসার এক চিমসে লোক কথাটা বলল। সে-ই ব্যাংকের মালিক।

'তোমার ডাকাতি সহ্য করতে পারলে ওরটা পারব না কেন,' বলল জন।

লাল হয়ে গেল ব্যাংক মালিকের চেহারা। অসহায় চোখে শেরিফের দিকে তাকাল।

'তুমি যাবে না, বিলি?' সামনে দাঁড়ানো তরুণকে অনুরোধ করল শেরিফ।

'না।' এক কথায় জবাব এলো। কেউ দু'চোখে দেখতে পারে না অত্যাচারী লোভী ব্যাংকারকে।

'স্যাম?' আরেকজনের দিকে তাকাল শেরিফ।

'আজকে অন্তত নয়।' মাথা নাড়ল স্যাম। আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্যে বলল, 'পকেটে অনেক খুচরো পয়সা আছে। ঘোড়া দ্রুত ছোটালে সব পড়ে যাবে।'

'কাপুরুষ!' বিড়বিড় করল শেরিফ। ঘন কালো কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে

বলল, 'ঠিক আছে, শুনে রাখো তোমরা; যদি ওদের ধরতে পারি তো পাসির প্রত্যেক সদস্যকে উস্টারের ব্যাংক থেকে প্রতিদিন পাঁচ ডলার করে দেয়া হবে। যারা যাবে হাত তোলো।'

দু'হাত তুলে শেরিফকে নিরস্ত করতে গিয়েও থেমে গেল ব্যাংক মালিক।

এবারও একটা হাত উঠল না।

'সাত ডলার পঞ্চাশ সেন্ট!' নিলামদারের মতো হাঁকল শেরিফ।

সাড়া নেই কোন। তারপর স্যাম বলল, 'দশ ডলার পেলে যেতে পারি, যদিও পকেটে রাখা পয়সাগুলো পড়ে যাবে।'

'ঠিক আছে, হাড়-হারামি জোঁকের দল, দশ ডলার করেই দেব আমি,' জানাল ব্যাংকার উস্টার। হিসেব করে দেখেছে, দশজনকে দশ ডলার করে একশো ডলার দিলেও ক্ষতি নেই; ডাকাতটা দুই হাজার ডলার কেড়ে নিয়ে গেছে।

আটজন লোক এগিয়ে এসে দাঁড়াল শেরিফের সামনে। প্রতিদিন দশ ডলার অনেক টাকা। ডাকাতকে ধরতে গিয়ে তিনদিন পার করে দিতে পারলেই একমাসের রোজগার উপার্জন করা যাবে।

আট

উঁচু একটা ব্লাফের ওপরে থেমে চারপাশে নজর বুলিয়ে নিল ইব্রাহিম আর বেনন। পুবে, অনেক দূরে ধুলো উড়ছে। আসছে পাসি।

'নাহ্, ওরা আমাদের শান্তিতে থাকতে দিল না,' বিরক্ত হয়ে বলল বেনন।

ফোঁশ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইব্রাহিম। 'এরকম একটা কাজ কি করে করলে তুমি?'

'সহজ,' বলল বেনন। 'অস্ত্র তাক করে চাইতেই দিয়ে দিল।'

'আমি তা বলিনি।' রেগে গেল যাজক। 'তুমি আমাকেও ব্যাংক ডাকাত বানিয়ে ছেড়েছ!'

'তুমি তো ডাকাতি করোনি, শুধু ঘোড়া ধরে দাঁড়িয়ে ছিলে।'

'বললে সে-কথা শুনবে ওরা?' পাসির ওড়ানো ধুলোর দিকে তাকাল ইব্রাহিম। ভাবছে পাসির সদস্যদের বুঝিয়ে বলবে যে সে ওই ডাকাতির সঙ্গে কোনমতেই জড়িত নয়।

'কেন শুনবে না; নিশ্চয়ই শুনবে,' জোর দিয়ে বলল বেনন।

'তাহলে তাই করব। থাকব না আমি তোমার সঙ্গে।'

ইব্রাহিমকে খচ্চরের মুখ ঘোরাতে দেখে এবার বাকি কথা শেষ করল বেনন, 'শুনবে; তারপর শোনা শেষ হলে পরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে।'

চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ইব্রাহিম। দ্বিধা করে বলল, 'ওরা আইনের লোক। অমন কাজ ওরা করতেই পারে না।'

'পারে। আমি বলছি। বিশ্বাস করো। পারে।' হাসল বেনন। 'এদিকে আইন বলতে কিছু নেই। টাকার লোভে আমাদের পিছু নিয়েছে ওদের বেশিরভাগ লোক। আবার কেউ কেউ এসেছে ফাঁসিতে ঝোলানোর মজা পেতে। তারচেয়ে আমার কথা শোনো; আমি বলি কি, বিশভাগের একভাগ দিয়ে দেব তোমাকে। অর্ধেকই দিতাম, কিন্তু আমি নিজেও ওই বিশভাগের একভাগই নেব।'

রেগে গেল যাজক। 'চাই না আমি তোমার নোংরা টাকা!'

'বেশ, নিয়ো না তাহলে। পুরো টাকাই আমি রাফায়েলকে বুঝিয়ে দেব।'

'রাফায়েলটা কে?'

'হোমস্টেডার। ওর মতো আরও অনেক মানুষকে পথের ফকির করে দিয়েছে ওই রক্তচোষা ব্যাংকারটা। সেজন্যেই ওর ব্যাংকে ডাকাতি করেছি আমি। যাদের টাকা তাদেরই ফিরিয়ে দেব।'

'বিশ্বাস করতে পারলাম না আমি তোমার কথা।' রাগ একটু কমল র‍্যাবাইয়ের। চিন্তা করে দেখল মিথ্যে বলছে না আউট-ল। রাস্তার উল্টোদিকের ব্যাংকটা অপেক্ষাকৃত বড় হলেও ফার্স্ট ব্যাংক অভ সোডা স্প্রিংসেই ঢুকেছিল বেনন। 'বেশ,' বলল ইব্রাহিম, 'যদি তোমার কথা সত্যি হয় তাহলে তোমার সঙ্গে আছি আমি। আর যদি দেখি তুমি মিথ্যে কথা বলেছ, সাধারণ দস্যু ছাড়া আর কিছুই নও, তাহলে পথ আলাদা হয়ে যাবে আমাদের।'

'আমি রাজি।' লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসল বেনন। তাড়া দিয়ে বলল, 'কাছে চলে আসছে ওরা। চলো, তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি।'

ব্লাফের উল্টোপাশ দিয়ে নেমে গেল ওরা। চোখের আড়ালে পড়ে গেল পাসির ধুলো।

বেনন আর ইব্রাহিম ব্লাফ ছেড়ে চলে যাবার আধঘণ্টা পরে ওখানে উপস্থিত হলো পাসি। তরুণ বিলি ঘোড়া থেকে নেমে জমি পরীক্ষা করে দেখল। নামল শেরিফ ও আরও কয়েকজন।

'একটু আগেও এখানে ছিল ওরা,' বলল বিলি।

'ওদের একজন খোঁড়া একটা খচ্চর চালাচ্ছে,' বলল চোখ ট্যারা ফ্র্যাঙ্ক। আর্মির স্কাউট ছিল সে। পরে তাকে বের করে দেয়া হয় অযোগ্যতার অভিযোগে। এখনও যে তথ্য সে দিল তা ট্র্যাকিং করে নয়। ডাকাতির সময় রাস্তার উল্টোপাশে দাঁড়িয়ে ইব্রাহিমকে দেখেছে সে। বলল, 'বিলি ভুল বলেছে। লোকগুলো এখানে ছিল গতকাল।'

পনেরো মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার রওয়ানা হলো পাসি। এগিয়ে চলল বেনন আর ইব্রাহিমের ট্র্যাক অনুসরণ করে।

আড়াই ঘণ্টা একনাগাড়ে পথ চলে পাইন বনের ধারে ছোট্ট একটা জীর্ণ কুটিরের সামনে থামল বেনন আর ইব্রাহিম।

খুরের শব্দ পেয়ে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এলো বয়স্ক একজন কুঁজো

লোক। ভাল দেখতে পায় না সে চোখে। কাছে এসে ঝুঁকে দেখল বেননকে। চিনতে পেরে চওড়া হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

'কেমন আছ, বাছা?'

'ভাল।...এদিকের খবর কি?'

'আগের মতোই। চলে যাচ্ছে কোনরকমে।'

'আর সবার কি খবর?'

'ভাল নয়। জন আর রিচার্ডের হোমস্টেডটাও ঋণে ডুবে গেছে। শুনলাম জনেরটা নাকি কেড়ে নিয়েছে ব্যাংকার।'

'সামান্থা ভাল আছে?' বৃদ্ধের স্ত্রীর নাম সামান্থা। বেনন যখন ট্র্যাপিং করত প্রায়ই স্নেহময়ী মহিলার রান্না খাবার সুযোগ হতো ওর। তখন রাফায়েলের আয় রোজগার ভাল ছিল। দোরে এসে খালিমুখে ফিরতে পারত না অতিথি। তারপর এলো খরা। বাধ্য হয়ে জমি বন্ধক রেখে উস্টারের ব্যাংক থেকে ধার নিল রাফায়েল। চড়া হারের সুদ আর শোধ করতে পারল না। মর্টগেজের সময়ও কমিয়ে দিল ব্যাংকার। দখল করে নিল হোমস্টেডটা।

ট্র্যাপিং ছেড়েছে বেনন তিনবছর হলো। কিন্তু প্রিয়জনদের খবর রাখা ছাড়েনি। অন্যসময় এরকম খারাপ সংবাদ পেলে ব্যাংকারের ওপরে রেগে যেত, কিন্তু আজকে রাগল না ও। হাসল। থলেটা বের করে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এতে তোমাদের সবার জমি কেনার টাকা আছে। মানা করতে পারবে না। তোমাদের এক পুরনো বন্ধু পাঠিয়েছে!'

ধীরে ধীরে ইব্রাহিমের কাছে পরিষ্কার হচ্ছে বেননের চরিত্র। ছোট চোখে আর আউট-লকে দেখতে পারছে না ও। ডাকাতি করা অন্যায়, তবু মন থেকে সায় আসছে দেখে ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর।

'কে দিয়েছে, বেনন?' জানতে চাইল রাফায়েল। থলে নেবার জন্যে হাত বাড়াল না।

'তা বলা যাবে না। গোপনীয়। নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে তো তাই সে চায় না তোমরা ওর পরিচয় জানো।' হাসল বেনন। 'কি হলো, ভেতরে ডাকবে না? সামান্থার রান্না না খেয়েই চলে যাব?'

'সামান্থা মারা গেছে, বেনন।' অনেক দূরে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল বুড়ো রাফায়েল। অশ্রু নেমে ভিজে গেল দুই গাল। স্ত্রীকে লোকটা কতখানি ভালবাসত বুঝে মোচড় মেরে উঠল ইব্রাহিমের বুকের মাঝটা।

'ওকে কবর দিয়েছ কোথায়?' জানতে চাইল বেনন।

'ওই যে ওখানে।' উঠানের কটনউড গাছটা দেখাল রাফায়েল। উদাস হয়ে গেল মানুষটা। 'সন্ধেয় কাজ থেকে ফিরলে আমার জন্যে ওখানেই অপেক্ষা করত ও। জানো, বেনন, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কাছেই কোথাও আছে ও; আমাকে ছেড়ে চলে যায়নি।'

'টাকাটা সবাইকে প্রয়োজন মতো ভাগ করে দিয়ো, রাফায়েল; তোমাকে আর বিরক্ত করব না।' থলেটা বৃদ্ধের হাতে দিয়ে কটনউড গাছের নিচে কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল বেনন। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

সদাহাস্যময়ী সামান্থার মধ্যে নিজের মাকে দেখতে পেত ও।

আধঘণ্টা পর রাফায়েলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার ট্রেইলে উঠল বেনন আর ইব্রাহিম। রাতটা থেকে যেতে অনুরোধ করেছিল রাফায়েল; তবে থাকেনি বেনন। ও চায় না একদিন ডাকোটা জোন্সকে সাহায্য করে ওর বাবার যে পরিণতি হয়েছিল তেমনটা ঘটুক রাফায়েলের ভাগ্যে।

অগভীর নদী আর ঝর্নার ভেতর দিয়ে পথ করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগোল বেনন। ভাগ্য ভাল হলে ওদের ট্র্যাক হারিয়ে ফেলবে পাসি। তবে পানির ওপর দিয়ে এগিয়ে ট্র্যাক লুকাবার খারাপ একটা দিকও আছে। এদিকের নদী আর ক্রীকগুলো প্রায়ই শুকিয়ে যায়। ওদের বেলায় তেমনটা যদি ঘটে, কাদায় দীর্ঘদিনের জন্যে রয়ে যাবে খুরের চিহ্ন।

তবু ঝুঁকিটা বেনন নিয়েছে। চারপাশে ট্র্যাক গোপন করার তেমন কোন সুযোগ নেই আর।

নিরাপদেই গ্রেট সল্ট ডেজার্ট এড়িয়ে উতে টেরিটোরিতে, অর্থাৎ আজকের নেভাডায় পৌঁছুল ওরা। মরুভূমিটাকে একপাশে রেখে একে একে পেরল গুজ ক্রীক, স্যামন ফলস ক্রীক, মেরিজ রিভার আর টাসকারোরা পর্বতের ম্যাগি ক্রীক।

ম্যাগি ক্রীকের একটা অগভীর শাখা ধরে তিনশো গজ এগিয়ে ঘোড়া থামাল বেনন।

'তুমি কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ?' জানতে চাইল ইব্রাহিম।

'না।' মাথা নাড়ল বেনন। 'এবার প্রধান ক্রীকটা ধরে আবার ফিরে যাব আমরা।'

হাসল ইব্রাহিম। 'ধরা না পড়ার কৌশল, তাই না? খুবই বুদ্ধিমানের কাজ।'

'বলা যায় না এই বুদ্ধি কাজে লাগবে কিনা,' বলল গম্ভীর বেনন। 'ওদের ট্র্যাকার কেমন তার ওপর আমাদের সফলতা নির্ভর করবে। বাজে ট্র্যাকার হলে হয়তো খেয়ালই করবে না যে প্রধান ক্রীক থেকে সরে গেছি আমরা। সেক্ষেত্রে সোজা এগোবে সে। কাজে লাগবে না আমাদের চালাকি। আর ট্র্যাকার যদি দক্ষ হয় তাহলে কিছুদূর চলে সে বুঝতে পারবে আমরা আগের পথেই ফিরে গেছি। তাহলেও কাজে লাগবে না আমাদের বুদ্ধি।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের একমাত্র আশা মাঝারি দক্ষতার ট্র্যাকার,' কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল ইব্রাহিম।

'এতোক্ষণে বুঝেছ তুমি,' সায় দিল বেনন।

ফেলে আসা পথ ধরে ফিরে চলল ওরা।

ঠিক একঘণ্টা পরে ম্যাগি ক্রীকের ওই জায়গাটায় এসে হাজির হলো দশজনের পাসি। হাত তুলে সবাইকে থামাল ট্যারা চোখ ফ্র্যাঙ্ক।

'কোন্দিকে গেছে?' জানতে চাইল শেরিফ ড্যানিয়েল।

ঘোড়া থেকে নামল ট্যারা ফ্র্যাঙ্ক। সবজান্তার ভঙ্গিতে বলল, 'কোন একটা

ঘাপলা আছে এখানে।'

'সময় নষ্ট না করে কোন্‌দিকে গেছে সেটা বলো,' তাড়া দিল শেরিফ।

জবাব না দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল ফ্র্যাঙ্ক। পানির নিচে হাত ডুবিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে কি যেন বোঝার চেষ্টা করল।

'বুঝতে পারছ কিছু?' জানতে চাইল উদগ্রীব উস্টার।

'না,' সাফ জবাব দিল ফ্র্যাঙ্ক। 'হাতটা ধুয়ে নিচ্ছি।'

'ব্যাটা বদমাশ!' রেগে গিয়ে সিক্সগান বের করল শেরিফ। 'এক গুলিতে তোর মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।'

'থাক, থাক,' বাধা দিল ব্যাঙ্কার। 'ও-ই আমাদের একমাত্র ট্র্যাকার।'

'চলে তো এসেছি অনেকদূর,' বলল বিলি, 'যা ট্র্যাকার! পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পারব তো?'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল শেরিফ, কিন্তু ওই মুহূর্তে অস্ফুট স্বরে কথা বলে উঠল ফ্র্যাঙ্ক। ঝর্নার পাড়ের একটা ভাঙা ডাল চোখে পড়েছে ওর।

'কি! কি দেখেছ?' জানতে চাইল উস্টার।

'চালাক আছে লোকগুলো,' বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'ভেবেছিল আমাকে ঠকাতে পারবে। ভাব দেখিয়েছে এখান থেকে ফিরে গেছে ক্রীকে। কিন্তু আসলে এগিয়েছে সোজা। সামনেই কোথাও আছে ওরা।'

'চলো তোমরা!' হুঙ্কার ছেড়ে সামনে বাড়ল ব্যাঙ্কার।

ফ্র্যাঙ্ক ঘোড়ায় চড়তেই তাকে অনুসরণ করল পাসি।

আট দিনের দিন হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরতি পথ ধরল তারা। ব্যাঙ্কার হিসেব কষে দেখেছে আরও এগোলে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

নিচু কতগুলো টিলার পেছনে রাতের মতো ক্যাম্প করল ইব্রাহিম আর বেনন। বড় বড় আলগা পাথরের চাঁইয়ের কারণে খুব সাবধানে টিলা পেরিয়ে এখানে আসতে হয়েছে ওদের। পাসির আক্রমণ আশা করছে না বেনন। পাথুরে এলাকায় কোনরকম ছাপ না ফেলেই এখানে পৌঁছেছে ও।

রাফায়েলের কাছ থেকে সংগ্রহ করা শুকনো বিস্কুটে কামড় দিয়ে গোল একটা পাথর দেখাল বেনন। 'ওটাকে দেখতে মানুষের কানের মতো লাগছে না? আমি ওটার নাম দিলাম কান পাথর।'

'নাম নিয়ে ভাবছি না আমি,' শীতে কেঁপে উঠে জবাব দিল যাজক। 'একটা আগুন জ্বালা যায় না? হাত-পা যে জমে গেল!'

'উপায় নেই। পাসির চোখে ধরা পড়ে যেতে পারি।' নিজের ব্ল্যাংকেটটাও র‍্যাবাইকে দিয়ে দিল বেনন। গায়ে চাপিয়ে নিল শতখানেক ফুটোওয়ালা কোট।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে বেনন দেখল উত্তর দিকে মুখ করে প্রার্থনায় বসেছে ইব্রাহিম।

স্যাডলব্যাগ থেকে বিস্কুট, চিনি আর মহিষের শুকনো মাংস বের করল

বেনন। ইচ্ছে হলো কফি খেতে। কিন্তু আগুন জ্বালানো উচিত হবে না। দিনের বেলাতে আভা দেখা না গেলেও অনেকদূর থেকে দেখা যাবে ধোঁয়া।

নিজের ভাগেরটা দশমিনিট ধরে চিবিয়ে খেল ও। তারপর উঠে গেল ঘোড়ায় স্যাডল চড়াতে। তখনও বিড়বিড় করে দোয়া পড়ছে ইব্রাহিম।

স্যাডল চাপিয়ে বেনন দেখল এই মাত্র প্রার্থনা শেষ করে খেতে বসেছে যাজক। লোকটার সামনে বসে পড়ল ও। মন্তব্যের সুরে বলল, 'দেখে তো মনে হলো আজকে একটু যেন বেশিক্ষণ দোয়া করলে।'

'নতুন একটা অধ্যায় ধরেছি আজকে,' বলল ইব্রাহিম। 'মুসাফ আমিদা।'

'বেশ করেছ। তোমার দোয়া আমাদের কাজে আসবে। এখন তাড়াতাড়ি যাত্রার জন্যে তৈরি হও। আমার ধারণা খুব একটা আর পেছনে নেই পাসি।'

নড়ল না ইব্রাহিম।

'কি হলো?' অধৈর্য স্বরে জানতে চাইল বেনন।

'আজকে কি বার?'

'তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাইছ না...' চোখ বড় বড় হয়ে গেল বেননের। 'তা কি করে হয়! আজকে কিছুতেই শনিবার হতে পারে না!'

হাসল পাদ্রি। 'আজকে শনিবারই। বিশ্রামের দিন। কোন কাজ করা বা কোথাও যাওয়া চলবে না আজকে।'

'কি বলছ এসব!'

'ধর্মের মানা।'

'কিন্তু পাসি...'

'ঈশ্বর চাহেন তো ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

'আর ঈশ্বর না চাহেন তো?'

'সবই ভবিতব্য।'

যাজক সেধে মরতে চাইছে একথা বেনন বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, 'একথা বোলো না যে তুমি আসলেই রওয়ানা হবে না।'

'ঠিক আছে, মানা করলে বলব না।'

হতাশা প্রকাশ করতে বাতাসে ঘুসি ছুঁড়ল বেনন। রাগ সামলে বলল, 'তোমার জানা উচিত যে আজকের শনিবারটা অন্যান্য শনিবারের মতো নয়। আজকে এমন এক শনিবার যে শনিবারে আমাদের পেছনে তেড়ে আসছে ফাঁসুড়ে পাসি!'

শ্রাগ করল ইব্রাহিম। 'তবুও নিয়ম ভাঙব না আমি। ম্যাকাবিনের বিদ্রোহে হাজার হাজার ইহুদি নিজেদের জীবন দিয়েছিল, কিন্তু পাল্টা অস্ত্র ধরেনি।'

'নিজেদের জীবন দেবে না তো কি অন্যের জীবন দেবে? ওই বিদ্রোহে কি হয়েছিল তাতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমার।' বলল বিরক্ত বেনন, 'আমি শুধু জানি তেড়ে আসছে পাসি। ধরতে পারলেই গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেবে।'

'বড় জোর খুনই নাহয় করবে আমাদের!' উদাস হয়ে গেল যাজক। 'ম্যাকাবিনের ইহুদিদের মতো আমরাও তাহলে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করে স্বর্গে...'

'চাই না আমার স্বর্গ! জানো তো না তাই ভাবছ খুন করেই ছেড়ে দেবে। খুন করার আগে যত রকমের অত্যাচার আছে সবই সইতে হবে, এতে ভুল নেই কোন। মোট কথা, এখান থেকে সরে না পড়লে কপালে খারাবি আছে।'

'আমি তা মনে করি না। তোমার কৌশল নিশ্চয়ই ওদের বোকা বানিয়ে দিয়েছে।'

'আমার ওপর তোমার আস্থা দেখে খুশি হলাম। কিন্তু, বিশ্বাস করো, ওরা অত বোকা নয়। বাজি ধরতে পারি ওরা এতোক্ষণে আমাদের মাইল পাঁচেকের মধ্যে চলে এসেছে।'

মরে যাওয়ার চিন্তা মাথায় আসাতেই সম্ভবত দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইব্রাহিম। বলল, 'আধফুটের মধ্যে ওরা চলে এলেও আমার কিছু করার নিই। শনিবারে কোথাও যাব না আমি।'

'ঈশ্বরের কাছেও নয়?' তীব্র ব্যঙ্গ ঝরল বেননের কণ্ঠে। 'ওরা যদি ধরতে পারে তাঁর কাছে তোমাকে যেতেই হবে।'

চিন্তিত দেখাল যাজককে। তবে গা নড়াল না। বেশ কিছুক্ষণ ভেবে শেষ পর্যন্ত বলল, 'ঠিক আছে, জন্তুর পিঠে চাপব না, তবে হাঁটতে পারি আমি। এটাকে বোধহয় কাজের মধ্যে ফেলা যায় না।'

'তাই সই,' হাঁপ ছাড়ল বেনন। 'তবুও তো এগোই চলো!'

নয়

নদীর তীর পর্যন্ত নেমে গেছে সবুজ সেজব্রাশের ঘন ঝাড়। মাঝখানে ফুট তিনেক চওড়া বন্য প্রাণীর তৈরি ট্রেইল। এপথে পানি খেতে আসে বনের সমস্ত জীব–মেঠো ইঁদুর, জ্যাক র‍্যাবিট, র‍্যাকুন থেকে শুরু করে অতিকায় বাফেলো পর্যন্ত।

নদীটার নাম হামবোল্ট। নেভাডার মরুভূমির মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে জন্তু জানোয়ারের ঘাস-পানির ব্যবস্থা করেছে। ক্যালিফোর্নিয়া ট্রেইলে পানির প্রধান উৎসও হচ্ছে হামবোল্ট।

চ্যালেঞ্জারকে বিশ মিনিট ঘাস খেতে দিল ইব্রাহিম। তারপর হেঁটে এগোল আবার। পাশে বেনন।

দুপুরের পরে নদী অনুসরণ করে দক্ষিণে চলল ওরা। হামবোল্ট এখানে বয়ে চলেছে ট্রিনিটি রেঞ্জের ভেতর দিয়ে। টিলাময় রুক্ষ এলাকা। মেসকিট, চোলা আর প্রিকলি পেয়ারের ছড়াছড়ি। দোতলা সমান উঁচু দানবাকৃতি ক্যাকটাসও চোখে পড়ল কয়েকটা। পানি ছাড়াও বছরের পর বছর বেঁচে থাকতে পারে ওগুলো; রাতের সামান্য শিশিরই অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে যথেষ্ট।

একটা টিলার ওপরে উঠে পেছনে তাকাতেই বহুদূরে যেন ধুলোর রেশ দেখতে পেল বেনন। ইব্রাহিমকে দেখাল ও।

'কি বুঝছ?'

'ধূলিঝড় হচ্ছে ওখানে।'

মাথা নাড়ল বেনন। 'নড়ছে দেখতে পাচ্ছ না?...পাসি। আসছে ওরা।'

'বেশ, আসছে ওরা। তো আমরা কি করব?'

'পালাব স্বভাবতই। প্রশ্ন হচ্ছে তুমি তখন আমার সঙ্গে থাকবে কিনা।'

পা বাড়াল ইব্রাহিম। 'সূর্য ডুবুক। তার আগে চ্যালেঞ্জারের পিঠে চাপব না আমি।'

আকাশে হালকা কুয়াশা ঢাকা ডিম পোচের মতো সূর্য। ভর দুপুরেও একটা শীত শীত ভাব। দূরের টিলাগুলোর গায়ে জড়িয়ে আছে ধোঁয়া ধোঁয়া ধূসর কুয়াশা। চারপাশে কোন শব্দ নেই। এই নীরবতাই সম্ভবত বেননের মাথা খুলে দিল। হঠাৎ ও বুঝতে পারল যে আপাত অকাট্য যুক্তি থাকতেও আত্মঘাতি, বোকা এবং সম্ভবত পাগল যাজকটার সঙ্গে খামোকা তর্ক করেছে এতোক্ষণ।

বলল ও, 'আমি তোমাকে এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি যে অযৌক্তিক আচরণ করছ তুমি। আসলে শনিবারে কোথাও যেতে কোনরকমের কোন বাধাই নেই।'

কথার জালে জড়িয়ে ধরা খেতে কোনমতেই রাজি নয় ইব্রাহিম। বলল, 'যুক্তির সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মের সম্পর্ক বিশ্বাসের সঙ্গে। আমাকে বোঝাতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট কোরো না; বলেছি তো তোমাকে, সূর্য ডুবলেই রওয়ানা হব আমি।'

'কিন্তু ধরো, সূর্য যদি নাই ডোবে?'

'কি যাতা বলছ! পাগল হয়ে গেলে নাকি!'

হাত তুলে চালিয়াতি হাসি দিল বেনন। 'আগে আমার কথা শোনো। আমরা তো পশ্চিমে যাচ্ছি, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু...'

'সূর্যও পশ্চিমেই যায়, তাই না?'

সূর্য পুবে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায়, সান ফ্রান্সিকো যাবার চিন্তায় এই একটা কথাই আমেরিকায় আসার পর থেকে মনে রাখার আন্তরিক চেষ্টা করেছে ইব্রাহিম; কাজেই অস্বীকার করতে পারল না যে বেনন সত্যি কথা বলছে। তবুও সন্দিহান হয়ে উঠল ও এসব কথার ভেতরে চালাকির আঁচ পেয়ে। 'কথাটা মিথ্যে নয়,' অবশেষে বলল ও।

এতোক্ষণ দেহ শিথিল করে স্যাডলে বসে ছিল বেনন। যাজকের এই কথায় এবার পিঠ সোজা করে বসল। বিজয়ীর সুরে বলল, 'যেহেতু একই দিকে যাচ্ছি, তোমার কথা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে আমরা সূর্যের নিচেই রয়ে যাব। ডুববে না সূর্য!'

'অসম্ভব! বোকা পেয়েছ আমাকে?' তা কি করে হয়, মনে মনে ভাবল র‍্যাবাই। বেননের সবজান্তা হাসি দেখে দ্বিধায় পড়ে গেল। তারপরই প্রশ্নটা জাগল তার মাথায়। 'আচ্ছা, তোমার কথাই যদি সত্যি হতো তাহলে এতোদিন সূর্য ডুবল কেন?'

'আরে, সাধারণ ব্যাপারটা বুঝলে না!' চোখ টিপল বেনন। 'আমরা আগে কখনোই সোজা পশ্চিমে চলিনি। যতবার দক্ষিণে সরেছি অমনি একটু একটু করে আমাদের ছাড়িয়ে পশ্চিমে চলে গেছে সূর্য।'

ব্যাপারটা ভেবে দেখে মাথা নাড়ল ইব্রাহিম। বলল, 'তবুও ধর্ম ধর্মই; নিয়ম ভাঙার ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।'

'কিন্তু যেহেতু আমরা সূর্যের সঙ্গে পথ চলছি তাই আধবেলা ছাড় দেয়া যায় না?'

'না।'

'তুমি খোঁয়াড়ে আটকে রাখা ধেড়ে শুয়োরের মতোই গোঁয়ার,' হাল ছেড়ে বলল বেনন।

শ্রাগ করল ইব্রাহিম। বেননের ঘোড়ার পাশে হাঁটতে লাগল ঘাড় গোঁজ করে।

একটার পর একটা টিলা পেরিয়ে গেল ওরা, চ্যালেঞ্জারের পিঠে কিছুতেই চাপল না যাজক। লোকটার হাঁটার ক্ষমতা বিস্মিত করল বেননকে।

দশ

ক্যালিফোর্নিয়ার সিয়েরা নেভাডা থেকে নেমে এসেছে ট্রুকি, কার্সন আর ওয়াকার নদী; মিশেছে এসে হামবোল্টের সঙ্গে। নদীগুলোর সঙ্গমস্থলের কাছেই বৃষ্টি আর পর্বতের বরফ গলা পানি জমে সৃষ্টি হয়েছিল লেক লাহোট্যান। উত্তর-দক্ষিণে ওটা দুশো মাইল লম্বা আর পুব-পশ্চিমে একশো পঁচাত্তর মাইল চওড়া ছিল।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়েছে। জলীয় বাষ্প কমে গেছে, বেড়েছে উত্তাপ। আগেকার সেই বিশাল লেক লাহোট্যান আর নেই। গভীরতা বেশি বলে এখনও পানি রয়ে গেছে শুধু পিরামিড আর ওয়াকার লেকে। বাকি জায়গা ধীরে ধীরে রুক্ষ শুষ্ক অনুর্বর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

শনিবার মাঝরাতে চল্লিশ মাইল দীর্ঘ মরুভূমির পাঁচ মাইল অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ল বেনন আর ইব্রাহিম। থামতে রাজি হলো না বেনন। পাসির সঙ্গে দূরত্ব বাড়ানো যেমন দরকার তেমনি দরকার দিনের খর রোদকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাওয়া। পারলে রাতের মধ্যেই পেরিয়ে যেতে হবে ভয়াবহ এই মরুভূমি।

বেননের পাশে চলছে ইব্রাহিমের চ্যালেঞ্জার। ক্যান্টিন থেকে গলায় পানি ঢালল ইব্রাহিম। কয়েক ঢোক খেয়ে মুখ বিকৃত করে বলল, 'পানিতে সাজ্ঘাতিক কষ!'

সায় দিল বেনন। 'এদিকের সব পানিই তেতো। বিষাক্ত ওয়াটারহোলও আছে। ওই পানি খেলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।'

'আমার মনে হয় না কোনদিন আমরা ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছতে পারব,'

বলল হতাশা আক্রান্ত ইব্রাহিম। 'একের পর এক বিপদ লেগেই আছে সেই আমেরিকা এসেছি তক।'

'ক্যালিফোর্নিয়া তো প্রায় চলেই এসেছি,' সাহস দিল বেনন। 'মনটা শক্ত করো। একদিন দেখবে সান ফ্রান্সিসকোতে হাজির হয়ে গেছি।'

'তোমার আত্মবিশ্বাস দেখে ভরসা হয়,' বলল যাজক। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল হঠাৎ। 'তুমি এতো কষ্ট করে এতো দূরের পথ পাড়ি দিচ্ছ কেন, বেনন?'

'দুটো কারণে,' বলল বেনন। 'প্রথমত, তোমাকে ভাল লেগেছে আমার। ভাল মানুষ বলে মনে হয়েছে। আমি চাইনি বেমক্কা মারা পড়ো তুমি। দ্বিতীয়ত, তুমি ক্যালিফোর্নিয়া যাবে শুনেই ছোটবেলার সেই শহরে ফিরে যাবার তাগিদ অনুভব করলাম আমি অন্তরে। জানো, র‍্যাবাই,' দূরে তাকাল বেনন, উদাস গলায় বলল, 'একটা মেয়ে আমাকে পছন্দ করত। মুখ ফুটে কখনও ওকে বলতে পারিনি আমিও ওকে ভীষণ, ভীষণ পছন্দ করি। ঠিক করেছি ওকে খুঁজে বের করব আমি। যদি দেখি বিয়ে হয়ে গেছে ওর, তাহলে ওকে জানতেও দেব না আমি গিয়েছিলাম। দূর থেকে দেখব। আর ওর বিয়ে না হয়ে থাকলে দেখা করব হয়তো। আমি তো এখন আউট-ল…আমার কোন অধিকার নেই…তাছাড়া অযথা ওকে বিপদে জড়ানো হবে।' চুপ হয়ে গেল বেনন।

মানুষটার হৃদয়ে এখনও কোমল অনুভূতি আছে, বুঝতে পারল ইব্রাহিম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল, একদিন যাতে বেনন এই অভিশপ্ত ফেরারী জীবন থেকে মুক্তি পায়, যাতে খুঁজে পায় প্রেমময়ী জীবনসঙ্গিনী। প্রার্থনা শেষে নিজের চিন্তায় ডুবে গেল যাজক। ভাবল সান ফ্রান্সিসকোর কথা। সেখানে অপেক্ষা করছে মস্ত দায়িত্ব। শুধু ধর্মীয় নয়, সাংসারিক দায়িত্বও পালন করতে হবে ওকে। পারবে তো ও? ছবি দেখে সারা বেন্ডারের তুলনায় রোজি বেন্ডারকে বেশি ভাল লেগেছে ওর। কিন্তু বিয়ে তো করতে হবে সারাকে। আচ্ছা, কোনমতে কনে বদল করা যায় না? সান ফ্রান্সিসকোয় তো র‍্যাবাই নেই, বিয়েটা পড়াবে কে? নিজের বিয়ে কি নিজেই পড়ে নেয়া যায়? যায় না বোধহয়। তাহলে?

ওদের মধ্যে কথাবার্তা হলো না আর। এগিয়ে চলল ওরা। একসময় ঝাপসা হয়ে গেল তারাগুলো। ফিকে হলো আকাশ। সূর্য উঠল টকটকে লাল আগুনের গোলার মতো। বাতাসও থেমে গেল।

চলার গতি কমাল ওরা। ঘামছে দরদর করে। মৃত্যুপুরির পথে যেন চলেছে ওরা। ট্রেইলে পড়ে আছে ষাঁড় আর মহিষের কঙ্কাল। ট্রেইলের ধারে সারি সারি কবর, দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের ব্যর্থতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। পড়ে থেকে থেকে রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে নষ্ট হয়ে গেছে ওয়্যাগন আর আসবাবপত্র।

'উনচল্লিশের অভিযানের চিহ্ন,' বলল বেনন। 'লাখ লাখ লোক এসেছিল সেবার। এদিকের পথ-ঘাট সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না বেশিরভাগের। ফলে মরেছে কাতারে কাতারে।'

'কি দুঃখজনক!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইব্রাহিম। বেননের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল ওর মনটা। আজকে বেনন না থাকলে এই একই পরিণতি হতো ওর

নিজেরও।

'তিন বছর আগে ডোনার পার্টি এপথ দিয়ে যায়,' বলে চলল বেনন। 'অর্ন্তদ্বন্দ্বের শেষ ছিল না ওদের। এই মরুভূমিতে অসুস্থ এক বুড়োকে ফেলে রেখে গেছিল ওরা মরতে। ভেবেছিল নিজেরা বেঁচে যাবে। কিন্তু সিয়েরায় গিয়ে শীতের কবলে পড়ল ওরা। আটকে গেল বরফে। খিদের জ্বালায় কুকুর পর্যন্ত খেয়েছে ওরা। কুকুর ফুরিয়ে গেলে শেষদিকে নিজেদের মাংসও খেয়েছিল। মাত্র কয়েকজন সেযাত্রা রক্ষা পায়।'

মানুষের মাংস খাওয়ার কথা ভাবতেই অসুস্থ বোধ করল ইব্রাহিম। মুখ ফিরিয়ে নিল কবরের দিক থেকে।

ট্রেইলের ধারে একঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার রওয়ানা হলো ওরা। ছায়া পাবার মতো কোনকিছু নেই। যেদিকে চোখ যায় দিগন্ত বিস্তৃত ঢেউ খেলানো হলদে বালির সাগর।

সন্ধের আগেই ওদের পানি শেষ হয়ে গেল। এতো ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওরা যে রাতে পথ চলা থামানো উচিত নয় জেনেও আটঘণ্টা একটানা ঘুমাল দু'জন।

যুক্তি হিসেবে বেনন বলল, 'আগে পৌঁছতে গিয়ে মরে যাবার কোন মানে হয় না।'

পরদিন ভোরে আবার এগোল ওরা। মাঝেই মাঝেই পেছন ফিরে তাকাচ্ছে ইব্রাহিম। অনেকক্ষণ পরে বলল, 'পাসির ধুলো কিন্তু আমার চোখে পড়ছে না।'

'হয়তো তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে গেছে।'

'অতি জরুরী ব্যাপার না হলে ঈশ্বর কোন ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন না,' দ্বিমত পোষণ করল ইব্রাহিম।

'তুমি বলতে চাও আমাদের ব্যাপারটা জরুরী ছিল না?' আহত গলায় বলল বেনন। 'জীবন-মরণ সমস্যাকে তুমি আর কি বলবে শুনি? তুমি কি মনে করেছ পাসি আমাদের ধরতে পারলে ছেড়ে দিত?'

জবাব দিল না যাজক।

ঘোড়া আর খচ্চর, দুটোই পরিশ্রান্ত। হাঁটতে হচ্ছে ওদের। বিকেল নাগাদ পায়ে ফোস্কা পড়ে গেল দু'জনের। শুকিয়ে ফেটে গেছে ঠোঁট। রক্ত গড়াচ্ছে। মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘা হিসেবে বিগড়ে গেছে ইব্রাহিমের পেট।

ব্যাপারটা টের পেতেই বেনন বলল, 'হামবোল্টের পানি। ওই পানি অনেকেরই সহ্য হয় না।'

'কিন্তু গতকালের পর থেকে পানি আর খাইনি আমি,' প্রতিবাদ করল ইব্রাহিম।

'তাহলে দেখা যাচ্ছে সময় লাগে প্রতিক্রিয়া করতে।'

গোল হয়ে একজায়গায় জন্মেছে দোতলা উঁচু গোটা বিশেক ক্যাকটাস। ওখানে বিশ্রাম নিতে থামল ওরা। ইব্রাহিম প্রাকৃতিক কর্ম সেরে বেননের পাশে বসল। বলল, 'প্রাচীন মিশরে মরুভূমির ওপর দিয়ে ইহুদিদের তাড়া করেছিল

ফেরাউন।'

যাজক কি বলতে চাইছে বুঝতে না পেরে জানতে চাইল বেনন, 'আমাদের যেমন করা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। কাঁচা আটার রুটি খেতে হয়েছিল ওদের; কিন্তু পেট খারাপ করেনি। তাছাড়া পানির অভাব হয়েছিল বলেও শুনিনি।'

উঠে দাঁড়াল বেনন। একটা ক্যাকটাসের সামনে গিয়ে গোল মতো মোটা একটা ডাল কাটল ছুরি দিয়ে। ডালের কাটা অংশ তুলে ধরল মুখের ওপরে।

চোখে আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে ইব্রাহিম।

কিছুই ঘটল না।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিরে এসে বসে পড়ল বেনন। লজ্জা পেয়ে বলল, 'একজন মানুষ সবকিছুই জানে তেমনটা তুমি আশা করতে পারো না।'

'সেতো বটেই,' সায় দিল হতাশ পাদ্রি।

তৃতীয় দিন মরুভূমির বুকে তুমুল আলোড়ন তুলে বালিঝড় শুরু হলো। তীরের মতো ওদের মুখে বিঁধতে লাগল আলকালি বালুকণা। বাতাসে বালুর পরিমাণ এতোই বেশি যে শ্বাস নেয়া দুষ্কর হয়ে উঠল। উত্তপ্ত বালি। পুড়ে যাচ্ছে ওদের গায়ের চামড়া। চোখ দিয়ে পানি ঝরছে দরদর করে, থামানো যাচ্ছে না কোনমতে। ঝোড়ো বাতাসে পচা শবদেহের দুর্গন্ধ। কোন্‌টা বেশি কষ্ট দিচ্ছে; দুর্গন্ধ, ফোস্কা, বালির আঘাত, নাকি পেট ব্যথা; স্থির করে উঠতে পারল না ইব্রাহিম।

অন্ধের মতো আধঘণ্টা এগোল ওরা, তারপর থেমে গেল ঝড়।

'এর শেষ কোথায়?' জানতে চাইল ইব্রাহিম।

'মরুভূমির শেষ? আর সাত-আট মাইল, তার বেশি নয় বলেই আমার ধারণা।' কাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে যাজকের দিকে চেয়ে হাসল বেনন। বলল, 'এত অল্পেই কাহিল হয়ে পড়েছ! গ্রীষ্মে এদিকে এলে তবে বুঝতে পৃথিবীতেও দোজখ আছে।'

'দেখতে আসব হয়তো কোন এক দিন। পৃথিবীতে দোজখ দেখলে পরলোকে স্বর্গ জুটেও যেতে পারে।'

দু'মাইল পেরিয়ে ছোট একটা গরম পানির ঝর্নার সামনে উপস্থিত হলো ওরা। বালুর বুকে বুদ্বুদ উঠছে ঝর্নার উৎসস্থল হতে।

ঘোড়া থেকে নেমে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পানিতে আঙুল ভিজিয়ে জিভে ছোঁয়াল বেনন। ঠোঁটের দু'কোণ বেঁকে গেল ওর। 'তেতো,' বলল ও, 'বিষাক্তও হতে পারে।'

পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছে ইব্রাহিম। জানতে চাইল, 'বিষাক্ত হলে আশেপাশে জন্তু-জানোয়ারের হাড়গোড় পাওয়া যেত না?'

মাথা নাড়ল বেনন। 'বলা যায় না, বিষ হয়তো দেরিতে কাজ করে। ঝুঁকি নেব না আমরা। ট্রুকিতে পৌঁছবার আগে পানি খাবার কথা ভুলে যাও। এতোদূর এসে একটু ভুলে মরে যাওয়ার কোন মানে হয় না।'

ওদের কথার ফাঁকে পানিতে মুখ চুবিয়ে সড়াৎ সড়াৎ খেতে লেগেছে

চ্যালেঞ্জার। দেখতে পেয়েই খচ্চরটাকে সরিয়ে আনল ইব্রাহিম। ওটাকে কাঁপতে দেখে বলল, 'চ্যালেঞ্জারকে কেমন দুর্বল দুর্বল লাগছে না দেখতে?'

'জন্তু-জানোয়ার বোঝে কোন্ পানি খাওয়া যাবে,' বলল বেনন। 'এখন মনে হচ্ছে এই ওয়াটারহোলটা বিষাক্ত নাও হতে পারে। দেখব নাকি খেয়ে?'

'ভুলেও ওকাজ কোরো না,' তাড়াতাড়ি বলল ইব্রাহিম। 'চ্যালেঞ্জারের মাথার ঠিক আছে? এতোদিন আমার সঙ্গে থেকে থেকে ইহুদি হয়ে গেছে ওটা।' আরও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল যাজক। হাত তুলে ডানপাশ দেখাল। ধুলো উড়ছে দিগন্তে। বড় বড় হয়ে গেল ওর চোখ। তুতলে উঠে বলল, 'ওরা...ও...ওরা আসছে! ওই যে ধুলো দেখা যায়!'

চ্যালেঞ্জারের দিক থেকে চোখ সরাল না বেনন। দেখতে চায় খচ্চরটা সুস্থ থাকে কিনা। থাকলে এই পানিতে পিপাসা নিবারণ করা যাবে। দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও, 'চোখে ভুল দেখছ তুমি। আসতেই পারে না ওরা।'

'অত নিশ্চিত হচ্ছ কি করে?'

'ডাকাতি করেছি তিনদিন আগে। বাড়ি থেকে শতখানেক মাইল সরে এসেছে ওরা। ওদের ঠেকা পড়েনি আমাদের পিছু নিয়ে নিয়ে এই জঘন্য নরকে আসবে। জানের ভয় আছে না ওদের!'

'পাসি না হোক, কেউ না কেউ আসছে ঠিকই!'

'মরীচিকা দেখছ তুমি। গরমে ধাঁধা লেগে গেছে তোমার চোখে।'

'তাহলে বলতে হবে ধাঁধাটা ক্রমেই বড় হচ্ছে!'

'দুশ্চিন্তা বাদ দাও তো। বিশ্রাম নিয়ে নাও যতটা পারো। একটু পরেই রওয়ানা হব আমরা।'

'এখন শুনতেও পারছি। দলে সাতজন ওরা।'

এবার ইব্রাহিমের নির্দেশিত দিকে তাকাল বেনন। 'ইন্ডিয়ান!' আঁতকে উঠে দাঁড়াল ও। গলার রগ ফুলিয়ে অভিযোগের সুরে বলল, 'এতোক্ষণ আমাকে বলোনি কেন!'

একশো গজের মধ্যে চলে এসেছে লোকগুলো।

'বলিনি তোমাকে?' পাল্টা চেঁচাল ইব্রাহিম।

'তাড়াতাড়ি স্যাডলে ওঠো!' তাড়া দিল বেনন।

লাফ দিয়ে স্যাডলে উঠে বসল দু'জন। ছুটতে লাগল বেননের ঘোড়া। এবারও ওটাকে পেছনে ফেলে দিল চ্যালেঞ্জার। মালিকের বিপদ বুঝলেই খোঁড়ামি দূর হয়ে যায় ওটার।

দশমিনিট ওদের ধাওয়া করে হাল ছেড়ে দিল ইন্ডিয়ান যোদ্ধার দলটা। ততোক্ষণে ফেনা উঠে গেছে ওদের জন্তুগুলোর মুখে।

ইন্ডিয়ানদের পেছনে ফেলে আধঘণ্টা এগোনোর পর পানির দেখা পেল ওরা।

'উইপ্পি! ইয়াহুহু!' চেঁচিয়ে উঠল বেনন। ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'মরুভূমি পেরিয়ে গেছি আমরা। আর বিপদের ভয় নেই। সামনেই ওটা ট্রাকি নদী।'

'ঈশ্বরের অশেষ কৃপা,' বলল ইব্রাহিম। কথাটা মাত্র মুখ ফুটে বলেছে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল চ্যালেঞ্জার। দাঁড়ানোর শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই ওটার দেহে। বুজে গেল চোখ।

খচ্চরটা পড়ে যাবার আগেই লাফ দিয়ে মাটিতে নেমেছে ইব্রাহিম। বেননও নামল ঘোড়া থেকে। চ্যালেঞ্জারের নাকের কাছে হাত নিয়েই বুঝে গেল যা বোঝার। গম্ভীর চেহারায় বলল, 'ভাল খচ্চর ছিল চ্যালেঞ্জার।'

অবিশ্বাসের চোখে তাকাল ইব্রাহিম। 'ছিল? এখন আর নেই? তুমি কি বলতে চাও...'

আস্তে আস্তে মাথা দোলাল বেনন। ভাবতেও পারেনি কতখানি আঘাত পাবে যাজক। দু'হাতে মুখ ঢেকে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল ইব্রাহিম।

ওকে ধরে ধরে নদীর দিকে এগোল বেনন। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে ওর।

একটু পরে পানি খেয়ে এসে খচ্চরটার গা থেকে স্যাডল খুলে নিল বেনন। ইব্রাহিম ওটার পাশে বসে দীর্ঘ প্রার্থনা করল যাতে চ্যালেঞ্জারকে ঈশ্বর স্বর্গে স্থান দেন। প্রার্থনা শেষে চ্যালেঞ্জারকে বালি দিয়ে ঢেকে দিল ওরা। এখন আর শকুন বা কয়োটির কবলে পড়বে না লাশটা। অনুগত একটা অবোধ জানোয়ারের এটুকু অন্তত প্রাপ্য, এতে দ্বিমত নেই ওদের। ইব্রাহিমকে বাঁচাতে গিয়ে সাধ্যের অতীত পরিশ্রম করাতেই মারা গেছে চ্যালেঞ্জার।

কবর দেয়া শেষে দ্বিতীয় দফা পানি খেল ওরা।

'কি চাইছিল ওরা?' জানতে চাইল ইব্রাহিম। বুকের ভেতর প্রশ্নটা খচখচ করছে ওর, কেন মরতে হলো চ্যালেঞ্জারকে?

'ইন্ডিয়ানরা? ওরা আমাদের কেন ধরতে চাইছিল তা নিশ্চিত ভাবে বলার উপায় নেই। কোন্ জাতির ইন্ডিয়ান তার ওপর ব্যাপারটা নির্ভর করে। কেউ চায় ঘোড়া, করোটির চামড়া; কারও বা পছন্দ অস্ত্র বা মুণ্ডু—যার যেটা দরকার।'

'কিন্তু মানুষ মেরে কি লাভ ওদের?'

'প্রতিশোধ,' বলল গম্ভীর বেনন। 'এদেশটা ওদের ছিল। সাদা মানুষরা ওদের জমি কেড়ে নিয়েছে, উচ্ছেদ করেছে বাড়ি-ঘর থেকে, খুন করেছে নির্বিচারে নারী-শিশু-বৃদ্ধ; কাউকে বাদ দেয়নি। এখন সুযোগ পেলে শোধ তোলে ওরা। ওদের আমি দোষ দিই না। ইন্ডিয়ানদের জায়গায় আমি হলেও একই কাজ করতাম।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইব্রাহিম। 'আমি ওদের অনুভূতিটা বুঝতে পারছি।'

'বাগে তো আমাদের পায়নি ওরা, পেলে অনুভূতিটা আরও ভাল করে বুঝতে পারতে,' বিজ্ঞ অভিমত জানাল বেনন।

'কোন জাতের ইন্ডিয়ান ছিল ওরা?'

'অত [illegible] চিনতে পারিনি। শোশোন বা মোহাভি হতে পারে।'

'মুখে [illegible] রং মেখেছিল ওরা।'

[illegible]ন ওরা ছিল ওয়ার পার্টি।'

[illegible]র্টি কি জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল, কিন্তু স্যাডল ব্যাগ আর

জিনিসপত্রের ওপরে চোখ পড়তেই চোয়াল ঝুলে পড়ল ইব্রাহিমের। ওর বাক্সের মুখটা খোলা। খুলে গিয়েছিল ইন্ডিয়ানদের তাড়া খাবার সময়। কোরান শরীফ আর বাইবেলটা ঠিকই আছে, তবে কখন যেন পড়ে গেছে তাওরাতটা!

'আমার তাওরাত!' হাহাকার করে উঠল ইব্রাহিম। পাগলের মতো বাক্স হাতড়াল ও। নেই! কোথাও নেই ওটা।

মরুভূমির দিকে দৌড় দিল যাজক।

'দাঁড়াও! ওদিকে ইন্ডিয়ানরা আছে!'

বেননের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ছোটার গতি আরও বাড়াল ইব্রাহিম।

'আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাচ্ছি না!' সাবধান করল বেনন। তারপর পাগলাটে লোকটা শুনছে না দেখে পেছন পেছন দৌড়তে লাগল।

মরুভূমির বালিতে দৌড়ের গতি কমে গেল ওদের।

টেরও পেল না ওরা, তার আগেই ক্যাকটাসের পেছনে লুকানো ইন্ডিয়ান যোদ্ধাদের বেষ্টনীতে ঢুকে গেল। চারপাশ থেকে ওদের ঘিরে দাঁড়াল মুখে রং মাখা সাতজন ব্রেভ। তিনজনের হাতে রাইফেল। বাকিদের কাছে তীর ধনুক। হাতের অস্ত্র তা‌ক করে রেখেছে তারা ওদের দু'জনের দিকে।

এগারো

এক ঘণ্টা পর একটা ইন্ডিয়ান গ্রামে বেনন আর ইব্রাহিমকে হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হলো।

শুকনো ঝোপে কাদা লেপে তৈরি ছোট ছোট গোল কুটিরগুলো দেখলে মনে হয় আফ্রিকার বুশম্যানদের শিকারের ক্ষণস্থায়ী ঝুপড়িগুলোর মতো, যেন ওগুলোই তুলে এনে মরুভূমির বুকে বসিয়ে দিয়েছে কেউ। গ্রামের মাঝখানে আঙ্গিনা সমৃদ্ধ কুটিরটা অপেক্ষাকৃত বড়। ওটাই সম্ভবত সর্দারের বাড়ি। সামনের উঠানে চারটে কাঠের খুঁটি দেখে গলা শুকিয়ে এলো বেননের। ওই খুঁটিতে বেঁধেই বন্দীদের অত্যাচার করে ইন্ডিয়ানরা।

বাড়িটার প্রাঙ্গণে ওদের দু'জনকে দাঁড় করানো হলো।

'কেন যে তোমার পিছু নিলাম!' মাথায় টোকা দিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করল বেনন। বোকার মতো ইন্ডিয়ানদের হাতে ধরা পড়ার পর থেকে নিজেকে দোষারোপ করছে ও। আজকেই জীবনের শেষ দিন, ভাবতে গেলেই ভয়ও লাগছে।

ওদের দু'জনের আগমনে সাড়া পড়ে গেছে গ্রামে। কুটিরগুলো থেকে একে একে বেরিয়ে আসছে নারী, পুরুষ, শিশু আর বৃদ্ধের দল। গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল তারা ওদের।

সর্দারের বাড়ি থেকে দু'জন যুবক বেরিয়ে এলো হট্টগোল শুনে। সর্দারের ছেলে বোধহয়। পরনে তাদের অ্যান্টিলোপের মোলায়েম চামড়া।

তারা হাত তুলতেই থেমে গেল সমস্ত কথাবার্তা।

'আমাকে কথা বলতে দেবে,' ঠোঁটের ফাঁকে বলল বেনন।

মাথা ঝাঁকাল ইব্রাহিম। 'ওদের ভাষা জানো তুমি?'

'না। তবে সব ইন্ডিয়ানই আকার ইঙ্গিত বোঝে। লক্ষ রাখো, নিজেই বুঝতে পারবে।'

ভিড়ের ওপরে চোখ বোলাল ইব্রাহিম। সর্দারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা যুবক দু'জন ছাড়া প্রায় বাকি সবাই অর্ধ উলঙ্গ। মহিলাদের মুখে উল্কির ছাপ। কাদাও মাখিয়ে রেখেছে কেউ কেউ। বেননকে হাত নেড়ে বিভিন্ন ভঙ্গি করতে দেখল যাজক।

ইব্রাহিমকে বোঝানোর জন্যে মুখেও বলছে বেনন।

'আমরা শান্তিকামী। কোন ঝামেলায় নেই।'

দুই যুবকের নিস্পৃহ চেহারায় কোন পরিবর্তন এলো না।

'আমরা তোমাদের জমি কেড়ে নিতে আসিনি।'

পরস্পরের দিকে তাকাল যুবকদ্বয়।

'আমরা তোমাদের বাফেলো মারতে আসিনি।'

এ কথায় কনুই ভাঁজ করল দু'জনের মধ্যে বয়স্ক যুবক।

'আমরা তোমাদের ঘোড়াও চাই না।'

বেননের কথা থামতেই নেমে এলো পিনপতন নীরবতা।

'আমরা তোমাদের মহিলাদের পটিয়ে নিতেও আসিনি।'

গভীর মনোযোগে বেননকে দেখল এবার ইন্ডিয়ান লোকগুলো। ভাবল হয়তো, যা চেহারা, এর সঙ্গে যাবে কোন্ মেয়ে!

'বিশ্বাস করো, আমরা তোমাদের কিছুই চাই না।' হতাশ লাগছে বেননের। কোন কথাতেই কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না লোকগুলো। খোদা জানেন কি চলছে ওদের মনের গভীরে।

ভাঁজ করা কনুই সিধে করল যুবক। ওটা ছিল ইশারা। বড় ভাইয়ের অনুমতি পাওয়া মাত্র হাতের ডাণ্ডা দিয়ে বেননের চোয়ালে এক বাড়ি বসিয়ে দিল ছোট ভাই। একটা মাত্র বাড়ি, কিন্তু মারে জোর ছিল; কি হলো কিছু বোঝার আগেই জ্ঞান হারাল বেনন। ড্রামে টোকা দিয়ে গুরুগম্ভীর আওয়াজ তুলল কেউ একজন।

টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে একটা খুঁটির সঙ্গে বেনন আর ইব্রাহিমকে বাঁধা হলো। ইব্রাহিমের গায়ে থুতু দিল কয়েকটা বাচ্চা ছেলে।

ছেলেগুলোর পেছনে দাঁড়ানো উর্ধাঙ্গ উন্মোচিত মহিলাকে বাচ্চাদের মা ধরে নিয়ে অভিযোগের সুরে ইব্রাহিম বলল, 'ওদের আপনার ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া উচিত, মিসেস!'

জবাবে মহিলার তরফ থেকে বড় এক দলা থুতু জুটল ইব্রাহিমের কপালে।

বাচ্চাদের সরিয়ে দিয়ে এবার ইব্রাহিমের সামনে এসে দাঁড়াল কয়েকজন ব্রেভ। চোখা লাঠি দিয়ে খোঁচা মারতে লাগল ওর গায়ে।

'আরে আরে করো কি! কি করছ এসব! এমন করে না! আহা আহা!' চেঁচাল যাজক।

গুঙিয়ে উঠল বেনন। জ্ঞান ফিরছে ওর।

ইব্রাহিমের সামনে দাঁড়িয়ে ফোকলা মুখে হাসল তিন-চার বছরের একটা ছেলে।

পাল্টা হাসতে ইচ্ছে হলেও হাসতে পারল না ইব্রাহিম। গলা শুকিয়ে আসছে ওর ইন্ডিয়ানদের কর্মতৎপরতা দেখে। ওদের সামনে শুকনো ঝোপঝাড় জড় করছে কয়েকজন মহিলা। মতলবটা কি, আগুনে ঝলসাবে নাকি ওদেরকে?

বাচ্চাটার সঙ্গে খাতির জমানোর চেষ্টা করা উচিত। তাহলে ইন্ডিয়ানরা হয়তো বুঝবে যে আসলে ভাল মানুষ ওরা। 'কি, বাবু, নাম কি তোমার?' গলায় মধু ঢেলে জানতে চাইল ও।

মাঠে মারা গেল ওর পরিকল্পনা। কঙ্কালসার লোকটাকে ওর দিকে তাকিয়ে কথা বলতে দেখে ভ্যাঁ করে কেঁদে দিল শিশু। কঠোর হয়ে গেল মহিলাদের চেহারা। আগের চেয়ে বেশি করে খড়কুটো জড় করতে লাগল তারা ওদের সামনে।

চোখ মেলল বেনন। ব্যথায় কপাল কুঁচকে উঠল ওর। বুঝতে চেষ্টা করল চারপাশে কি ঘটছে।

ওকে চোখ মেলতে দেখে মরিয়া ইব্রাহিম ফিসফিস করল, 'বেনন, ওদেরকে বোঝাও যে আসলে আমরা কারও ক্ষতি চাই না।'

'কি করে?' পাল্টা ফিসফিস করল বেনন। 'দেখছ না আমার হাত বাঁধা? ইশারা-ইঙ্গিতের কোন উপায় নেই। তাছাড়া শুনবে না ওরা। ওরা আমাদের আগুনে ঝলসানোর বন্দোবস্ত করছে!'

'সত্যিই পোড়াবে?' কেঁপে গেল ইব্রাহিমের গলা।

'তা আর বলতে!'

এরইমধ্যে বেনন আর ইব্রাহিমের কোমর ছাড়িয়ে উঠেছে শুকনো ডালপালা।

ভয়ে মুখ বিকৃত হয়ে গেল যাজকের। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঈশ্বর, এভাবে না; এভাবে আমাদের মেরো না, ঈশ্বর! দয়া করো, করুণাময়!'

কয়েকজন ব্রেভ পরিবেষ্টিত হয়ে বড় কুটিরটা থেকে বেরিয়ে এলো লোলচর্ম এক অশীতিপর বৃদ্ধ। বৃদ্ধের ডানহাতে একটা জ্বলন্ত মশাল। উৎসর্গীকৃত বন্দী শত্রুদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার মহান দায়িত্ব ট্রাইবের সর্দার হিসেবে তার ওপরেই বর্তেছে। তার হাত থেকে মশাল নিয়ে আগুন জ্বালাবে কোন একজন ব্রেভ।

ব্যাপার বুঝে হিব্রুতে যত দোয়া-দরূদ জানে সব আওড়াতে লাগল ইব্রাহিম। দিশে হারিয়ে ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে ধর্মীয় গান গাইতে লাগল গুনগুন করে। ভয়ের চোটে ঘামছে দরদর করে।

'কৃপা করো, ঈশ্বর; আমার ওপর দয়া করো। যারা আমার জীবন কেড়ে

নিতে চায় তাদের একই সঙ্গে লজ্জা আর দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দাও। ওদের ফিরিয়ে দাও এবং অসম্মানিত করো, যারা আমার হৃদয়কে দখল করতে চায়।...

জ্বলন্ত মশাল হাতে ওর সামনে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধ। কৌতূহলে চকচক করছে বৃদ্ধের চোখ। 'কে তুমি?' কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে ইব্রাহিমকে দেখে ভারী গলায় জানতে চাইল সে।

'কে আমি...' অবিশ্বাসের সঙ্গে আওড়াল ইব্রাহিম। তারপর সর্দার ইংরেজি বলছে একথা মাথায় ঢুকল তার। তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি র‍্যাবাই। ইহুদি ধর্মযাজক।'

'সেজন্যেই তুমি ইংরেজি ভাল বলতে পারো না,' মতামত জানাল বৃদ্ধ। 'তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু জানি আমি।' পাশ ফিরে কি যেন বলল সে এক ব্রেভকে।

সর্দারের কুটিরের উদ্দেশে দৌড়াল ব্রেভ।

'বয়স্ক লোকটাই এদের চীফ,' ইব্রাহিমের উদ্দেশে ফিসফিস করল বেনন। তারপর মানুষটা ইংরেজি জানে খেয়াল হতেই খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে ইব্রাহিমকে দেখিয়ে সর্দারকে বলল, 'এই মানুষটা অত্যন্ত পবিত্র মনের মানুষ, চীফ। মহা-আত্মার সঙ্গে রাতে দিনে অনেকবার কথা হয় এর।'

'ও!' সমঝদারের মতো মাথা দোলাল বৃদ্ধ। 'এ তাহলে ওঝা।'

'হ্যাঁ।' ঘনঘন মাথা ঝাঁকাল বেনন। 'ঠিক ধরেছ তুমি।'

'মাথার টাক সারাতে পারে এ?' জানতে চাইল চীফ। মাথা জোড়া টাক তার।

'পারো?' জবাব কি হবে জেনেও প্রশ্নটা করল বেনন। মনে মনে বলছে: বলে ফেলো যে পারো, ইব্রাহিম। বাঁচার এই একমাত্র সুযোগটা চিনতে ভুল কোরো না। এই ব্যাটার মাথায় নির্ঘাত বিয়ের চিন্তা ঢুকেছে। জোয়ান হতে চাইছে, চাইছে আবার চুল গজাক। একবার লোভ দেখিয়ে একে বাজাতে পারলে পালাবার একটা না একটা সুযোগ মিলেও যেতে পারে।

হতাশ চেহারায় মাথা নেড়ে বেননের আশার পাতে ছাই ঢেলে দিল ইব্রাহিম।

'একবার এক কাথালি এসে বলেছিল সে মাথায় চুল গজিয়ে দিতে পারে,' বলল বৃদ্ধ। 'পাগল ছিল লোকটা। টাকমাথাওয়ালা লোক দেখলেই বিড়বিড় করে কিসব যেন বলে তার গলা লক্ষ্য করে অটারের লোম ছুঁড়ে দিত সে। কাজ না হওয়ায় ছাল ছাড়িয়ে ওকে উৎসর্গ করা হয়েছিল।'

'এ তেমন কোন ক্যাথলিক নয়,' থুতনিটা ইব্রাহিমের দিকে তাক করে জানাল বেনন। 'একে মোটেও পাগল বলা চলে না। এ খুবই দয়াশীল। শুধু তাই না, ভদ্র, শান্ত, খুবই সৎ প্রকৃতির লোক।'

চিন্তিত দেখাল বৃদ্ধ সর্দারকে। 'তাহলে একে মেয়েমানুষের সঙ্গে তুলনা দেয়া চলে?'

'না,' মাথা নাড়ল বেনন। 'তা দেয়া চলে না। কোনমতেই একে মেয়েমানুষ বলা যাবে না। আমাকে একটা ব্যাংক ডাকাতি করতে সাহায্য

করেছে ও। বললে বিশ্বাস করবে না, চীফ; আমাদের পেছনে পাসি লেগেছিল, ধরতে পারলেই ফাঁসি দিত; কিন্তু তবুও শনিবার দিনে ঘোড়ায় চড়েনি ও।'

'ইহুদি ধর্মের সাবাথ,' বলল চীফ। 'আমি জানি। আগেও অনেক সাদামানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। তাদের মধ্যে এর মতো ইহুদিও ছিল। বলেছে তারা।'

'তাহলে তো তুমি জানোই কত ভাল মানুষ হয় এরা!' ভয় গোপন করে চেষ্টাকৃত হাসি হাসল বেনন। 'এরা কোনমতেই মহা-আত্মাকে রাগাতে চায় না। এরা বিশ্বপ্রেমী। ইন্ডিয়ানদের ভালবাসে এরা।' নিজের কথা বাদ পড়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'আমিও ইন্ডিয়ানদের খুব ভালবাসি। কারও কোন ক্ষতি চাই না আমরা।'

কথাটা গভীর ভাবে চিন্তা করল চীফ। তারপর জানতে চাইল, 'বৃষ্টি নামাতে পারে এই ওঝা?'

এবার আর ইব্রাহিমকে জড়ানোর ঝুঁকি নিল না বেনন। তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। 'বৃষ্টি? হাহ্! এ এমন জোর বৃষ্টি নামায় যে দেখলে তাজ্জব লেগে যাবে।'

'কেন বলছ এসব!' আপত্তির সুরে বলল ইব্রাহিম।

ওর কথাকে বোধহয় বিনয় ধরে নিল চীফ। বেননের উদ্দেশে বলল, 'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে তুমি?'

'দিনের পর দিন বৃষ্টি ঝরাতে পারে ও ইচ্ছে করলে,' বলে চলল বেনন। 'যেমন তেমন বৃষ্টি? বন্যা হয়ে যায় শেষতক! একবার তো নিজের বন্যায় নিজেই ডুবে যাচ্ছিল ও। সেবার ওকে কোনমতে একটা গাছে ঠেলে তুলি আমি। আরেকটু হলে আমি নিজেও ভেসে যেতাম।'

'এই মরুভূমিতেও বৃষ্টি ঝরাতে পারবে ও?' তীক্ষ্ণ চোখে বেননের দিকে তাকাল চীফ।

'যেখানে ইচ্ছে। যখন ইচ্ছে।'

'বেশ।' ইব্রাহিমের দিকে তাকাল চীফ। 'তোমরা আমাদের অতিথি।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ইব্রাহিমের। স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, 'অতিথি? তাহলে আমাদের পোড়াবে না তোমরা? বেঁধে রেখেছ কেন তাহলে?'

ভ্রূ নাচাল সর্দার। গম্ভীর হয়ে গেল চেহারা। বলল, 'তোমার নির্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হচ্ছি আমি।'

বোকা বোকা চেহারায় তাকিয়ে থাকল ইব্রাহিম। 'দুঃখিত,' বলল বিভ্রান্ত বেনন, 'কিন্তু তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না!'

'বুঝলে না?' বিরক্তিতে গলা চড়ে গেল অধৈর্য সর্দারের। 'সম্মানিত অতিথিরা মহাজাগতিক পবিত্র শক্তির আশ্রয় পাবে তেমন সুযোগ তাদের অত্যাচার না করে আর কোন্ উপায়ে আমরা করে দিতে পারি? কি করে পবিত্র হবে তাদের মন?'

'আমার মনে হয়...' মতামত জানাতে যাচ্ছিল বেনন। কিন্তু হাত উঁচিয়ে ওকে থামিয়ে দিল সর্দার। মনোযোগ তার ইব্রাহিমের দিকে।

'ওহে ওঝা, তুমি হয়তো নতুন কোন পরীক্ষার কথা জানাতে পারবে আমাকে,' বলল সে। 'বলো কিভাবে তুমি মহাত্মার সঙ্গে মিশে যেতে চাও। অনেক জাতির ইন্ডিয়ানদের গ্রাম ঘুরে দেখেছি আমি। দেখেছি একেক জাতি একেক ভাবে বন্দীদের সম্মানিত করে। যেমন আমাদের সমতলের ভাইদের কথাই ধরো না; ওরা পিঠের দু'দিকের মাংসল জায়গায় কাঠের পেরেক গেঁথে সেই পেরেকের সঙ্গে কাঁচা চামড়ার ফিতে বাঁধে। ফিতের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয় খুঁটি। একটু কাত করে মাটিতে গাঁথা হয় খুঁটিটা। বন্দীর ওজনে একসময় মাংস থেকে উপড়ে আসে পেরেকগুলো।' চুপ করে কিছুক্ষণ ইব্রাহিমের দিকে ভাবুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সর্দার। তারপর ভারী গলায় জানতে চাইল, 'অনুষ্ঠানটা যদি আমাদের সমতলের ভাইদের মতো করেই সম্পাদন করি তাহলে আপত্তি আছে তোমার?'

ভয় পেয়ে চোখ বন্ধ করল ইব্রাহিম। অনুভব করল বুড়োর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে ওর মুখের ওপর। নীরবতা অসহ্য ঠেকায় ঢোক গিলে বলল, 'আমি জানি না, চীফ! আমি ভাবছিলাম...'

'থাক, কষ্ট করে ভাবতে হবে না তোমাকে,' তাকে থামিয়ে দিল সর্দার। 'যা ভাবার আমিই ভাবতে পারব।...নির্বাণ লাভের যে উপায়টা আমার সবচেয়ে প্রিয় সেটা বলি শোনো। বন্দীর শরীর থেকে সমস্ত কাপড় খুলে নিয়ে পবিত্র মধু মাখানো হবে। বেশি মাখানো হবে নিম্নাঙ্গে। তারপর হাত-পা বেঁধে রেখে আসা হবে লাল পিঁপড়ের পাহাড়ে। বাকি কাজ পিঁপড়েই করবে। আস্তে আস্তে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ওরা শিকারকে।' বর্ণনা করতে গিয়ে চোখ চকচক করে উঠল চীফের। হাসি হাসি হয়ে গেল চেহারা। 'কি রাজি আছো? রাজি থাকলে বলো। যদিও আমাদের পিঁপড়ের যোগানই বেশি, মধু বেশি নেই, তবুও ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে যাবে।'

'আমি বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলব,' বেননকে বলল ইব্রাহিম।

জবাব দিল না বেনন। খুঁটিতে গা এলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল শুধু।

'আবার আমাদের কোন কোন ভাইরা অন্য ভাবেও বন্দীর মোক্ষ লাভের ব্যবস্থা করে,' বলে চলল ইন্ডিয়ান চীফ। 'লতাগুল্মের তৈরি কালো সরবত খাইয়ে মরুভূমিতে পাঠিয়ে দেয়া হয় তাদের। সাত দিন সাত রাত্রি এক নাগাড়ে বমি আর পায়খানা করে তারা। এতে করে বন্দীর মন থেকে যাবতীয় নোংরামি দূর হয়ে যায়। আত্মা মহাত্মার সঙ্গে মিশে যাবার জন্যে তৈরি হয়।'

'আমি এভাবেই আমার মনকে পবিত্র করব, চীফ!' হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল বেনন। মরুভূমিতে কোনমতে সাত দিন টিকে গেলে বেঁচেও যেতে পারে। কিন্তু অন্য অত্যাচারের মুখোমুখি হলে বাঁচার কোন সম্ভাবনাই নেই। হাঁ করল বেনন। 'দাও, এক্ষুণি আমাকে কালো সরবত খাইয়ে মরুভূমিতে পাঠিয়ে দাও!'

'ওই নিয়মটা আমার কাছে নোংরামি মনে হয়,' জানাল চীফ। 'ওই নিয়ম আমরা প্রয়োগ করি না।'

চীফের পাঠানো ব্রেভ ফিরে এসেছে। তার হাতে শোভা পাচ্ছে ইব্রাহিমের

তাওরাত। বইটা সর্দারের হাতে দিল সে।

সেটা নিয়ে ইব্রাহিমকে দেখাল সর্দার। 'তুমি এটার জন্যে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'এই বইটা পড়েছি আমি।'

বিস্মিত চোখে বৃদ্ধ সর্দারকে দেখল ইব্রাহিম।

মাথা নাড়ল সর্দার। 'কিছুই বুঝিনি।'

'আমিও বুঝিনি,' বলল বেনন। 'কিন্তু আমার পাশের এই লোক বইটা পড়তে পারে। ওকে বললেই ও...' চীফের চোখে কড়া দৃষ্টি দেখে থেমে গেল বেনন।

'নাম কি এই বইটার?' জানতে চাইল চীফ।

'তাওরাত।'

'এই তাওরাতের বদলে তুমি কি তোমার ঘোড়া দিয়ে দেবে?'

'আমার খচ্চর মারা গেছে।'

'কিন্তু যদি বেঁচে থাকত তাহলে ওটা কি তুমি এই বইয়ের বদলে দিয়ে দিতে?'

'হ্যাঁ,' নির্দ্বিধায় জানাল ইব্রাহিম।

'সঙ্গে বুট জুতোও দিতে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কাপড়?'

'দিতাম।'

'বাকি যা কিছু আছে সব দিতে?'

'দিতাম–বইগুলো ছাড়া।'

'এমনকি তোমার ছুরিটাও দিতে?'

'আমার কোন ছুরি নেই।'

হতভম্ব চীফ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ওকে দেখল। 'তোমার কোন ছুরি নেই?'

'না।'

মাথা দোলাল চীফ। 'ছুরিও নেই ঘোড়াও নেই! তুমি তো খুবই গরীব লোক দেখছি!'

'অর্থের পরিমাপে দারিদ্র্য নির্ধারিত হয় না,' প্রধান র‍্যাবাইয়ের লেকচার মুখস্থ বলল ইব্রাহিম, 'দারিদ্র্যের সত্যিকার পরিমাপ হয় হৃদয়ের অপবিত্রতায়।'

'তুমি খুব সাহসী কথা বলছ, গরীব মানুষ! আমি যদি তোমাকে তোমার এই তাওরাত ফেরত দিই তাহলে কি তুমি আগুনে পুড়ে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে রাজি আছ?'

বেননের কপালের শিরা দপদপ করে লাফাতে দেখল ইব্রাহিম। দেখল ফুলে উঠেছে বেননের চোয়াল। ব্যথায় চোখ কুঁচকে রেখেছে।

চোখ সরিয়ে নিল ও। বড় করে দম টেনে বলল, 'হ্যাঁ, আমি রাজি আছি।'

কয়েকবার ঢোক গিলে চোখ বন্ধ করল বেনন। দেখতে পেল না চীফের ইশারায় ওদের পায়ের কাছে জড় করা শুকনো ঝোপে আগুন ধরিয়ে দিল

একজন ব্রেভ।

পটপট আওয়াজে ডালপালা পুড়িয়ে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

বারো

দ্রুতই ওদের মুখের কাছে উঠে এলো আগুনের শিখা।

গলায় ধোঁয়া ঢুকতেই কাশতে শুরু করল বেনন। ইব্রাহিমের কপালে জমল বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'তোমাকে যদি ছেড়ে দিই, তাহলে তাওরাতটা রাখতে দেবে আমাকে?' জানতে চাইল চীফ।

'ওকে ছেড়ে দাও।' বেননকে দেখাল ইব্রাহিম। অসহ্য হয়ে উঠেছে আগুনের তাপ। চামড়া ঝলসে দিতে শুরু করেছে।

'তাহলে তাওরাতটা দেবে?' ভ্রূ নাচাল চীফ।

'হ্যাঁ।'

'না, ইব্রাহিম,' আপত্তি করল বেনন, 'বিশ্বাস থেকে কখনও পিছু হোটো না।'

'আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, তাওরাতের মালিক,' বলল চীফ। 'কি হলো, দেবে তাওরাত?'

বেননের দিকে তাকাল ইব্রাহিম। মাথা নাড়ল বেনন।

'না।' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল যাজক।

'কথার নড়চড় হবে না তো?'

লেলিহান শিখা ইব্রাহিম আর বেননের হাত-পায়ে কামড় বসাতে শুরু করেছে। ফোস্কা পড়ছে ওদের দেহে। শরীর মুচড়ে সরে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে ওরা নিজেদেরই অজান্তে। সামনে নাচছে কমলা-নীল আগুনের দেয়াল। ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ। লোম পোড়ার গন্ধ পেল ওরা নাকে।

আমি আসছি তোমার কাছে, হে ঈশ্বর, মনে মনে বলল ইব্রাহিম, আমি আসছি তোমার কাছে। প্রার্থনা শেষে শরীরের সব শক্তি জড় করে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'না, চীফ, কোনকিছুর বিনিময়েই আমার কোন বই স্বেচ্ছায় তোমাকে দেব না আমি।'

সামনে থেকে জ্বলন্ত ডালপালা সরিয়ে নেয়া হচ্ছে, আগুনের তাপ কমতেই টের পেল ওরা। চীফের আদেশে কয়েকজন ব্রেভ ওদের সামনে থেকে স্তূপিকৃত খড়কুটো সরিয়ে দিচ্ছে। অ্যান্টিলোপের চামড়া দিয়ে ঢেকে আগুন নিভিয়ে ফেলছে আরও কয়েকজন।

কি ঘটছে বুঝতে পারল না ওরা কেউ।

তারপর চীফের বজ্রকণ্ঠ শুনতে পেল, 'ছুরিহীন র‍্যাবাই, তুমি অত্যন্ত সাহসী একজন মানুষ। শুধু কথায় নয়, কাজেও তার প্রমাণ পেয়ে খুবই খুশি

হয়েছি আমি।'

'ধন্যবাদ, চীফ,' বিড়বিড় করল ইব্রাহিম।

'আর তুমি,' বেননের দিকে তাকাল চীফ, 'যদিও তুমি ইন্ডিয়ানদের বোকা মনে করে যা মনে আসে বানিয়ে বলো, তবুও তোমার আছে পাহাড়ী সিংহের মতোই বড় একটা হৃদয়।'

বুড়োর কাছে বুদ্ধিতে হেরে মুখ নিচু করে থাকল বেনন।

'যদিও তোমার হৃদয় পাহাড়ী সিংহের মতো বড়,' বলে চলল চীফ, 'তবে সেই বড়ত্ব তোমার পাহাড়ের সমান বড় মিথ্যেগুলোর ধারেকাছে লাগে না। কিন্তু তোমাদের দু'জনেরই আছে সত্যিকার বন্ধু হবার সমস্ত গুণ। সেজন্যেই তোমাদের ছেড়ে দেব আমি।'

চীফের নির্দেশে অচিরেই বাঁধনমুক্ত হলো দু'জন। ইব্রাহিমকে ফিরিয়ে দেয়া হলো ওর তাওরাত।

'এবার আমার উইকিআপে চলো, সেখানে আলাপ করা যাবে,' হাতের ইশারায় ওদের পথ দেখিয়ে বলল চীফ।

বুড়ো সর্দারের পিছু পিছু বড় কুটিরটাতে গিয়ে ঢুকল ওরা। আগেই সেখানে মাটিতে কাঁথা পেতে বসে আছে গাঁয়ের কয়েকজন প্রবীণ।

সর্দারের পাশে বসার সুযোগ হলো ওদের।

'ছ'সাত চাঁদ আগে আমরা প্রথম ইহুদি দেখি,' বলল সর্দার। 'ওরাও মাথায় গোল টুপি পরত। ইংরেজিও বলতে পারত না ভাল।'

'ওরা কি ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছিল?' জানতে চাইল উদগ্রীব ইব্রাহিম।

'হ্যাঁ,' বলল চীফ। 'সেরকমই ইচ্ছে ছিল তাদের।'

'তারপর?' কৌতূহল আরও বাড়ল যাজকের।

'তারপর ওরা আর যেতে পারল না। ওদের আমরা পুড়িয়ে মেরেছি।' ইব্রাহিমকে আড়ষ্ট হয়ে যেতে দেখেও দেখল না চীফ। বুড়ো ওঝার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কোত্থেকে যেন এসেছে বলেছিল ওরা?'

'জার্মানি।'

'মেয়েলোকটার মধ্যে ঘৃণা বেশি ছিল,' বলল চীফ। 'আমাদের বুনো জানোয়ার বলেছিল সে। লোকটা বলেছিল আমরা নিচু জাতের মানুষ। তারপরও ওদের আমরা আগুনে পুড়িয়ে আত্মা পরিশুদ্ধ করার সুযোগ দিয়েছিলাম। ওদের বাচ্চাগুলোকে আমরা বেচেছিলাম ব্যানোকের কাছে। তবে তার আগে কেড়ে নিয়েছিলাম ওদের নাম।'

বুঝতে না পেরে চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ইব্রাহিম।

'নাম কেড়ে নেয়া হয়েছিল যাতে ওরা আত্মার জগতে নামহীন নগণ্য হয়,' ব্যাখ্যা করল ওঝা। 'নাম কেড়ে নেয়াতে নিজেদের ডেকে জড় করে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু আর করতে পারবে না ওরা।'

'যেমন আমার আসল নাম হচ্ছে নটিমোল্লা,' বলল চীফ, 'কিন্তু আমার ইহুদি নাম হচ্ছে সলোমন কোহেন।' উল্টোদিকে বসা কালো মতো এক বুড়িকে দেখাল সে। 'ওই যে আমার বউ। ওর ইহুদি নাম লিন্ডা কোহেন। আর

আমাদের ছেলেমেয়েদের নাম মাইকেল, ডেবরা আর জেফরি কোহেন।'

'আমার ধারণা ইহুদি আর ইন্ডিয়ান সবাই একই জাতি,' বলল ইব্রাহিম। 'মানুষ জাতি।'

'ঠিক,' সায় দিল নটিমোল্লা। 'আমি দেখেছি ইহুদিদের মধ্যেও নাক বড় লোক আছে।'

আলাপ চলতে লাগল। এদিকে পাটে বসেছে সূর্য। ব্যাপারটা খেয়াল হতেই একজন ব্রেভকে ইশারায় কোথায় যেন পাঠাল নটিমোল্লা।

একটু পরেই দুটো বড় বড় বাটি হাতে কুটিরে প্রবেশ করল সে। বাটি দুটো নামিয়ে রাখল ইব্রাহিম আর বেননের সামনে।

চীফ বলল, 'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তোমরা আমার মেহমান।' বাটির দিকে আঙুল তাক করল সে। 'খাও যার যত খুশি।'

'আবার অতিথি?' জানতে চাইল বেনন। 'মরতেই হবে আমাদের, তাই না?'

হাসল চীফ। 'না। অতিথি হলো যে এক তিথির বেশি থাকে না। আর মেহমান থাকতে পারে যতদিন খুশি।'

বাটির দিকে তাকিয়েই চেহারাটা প্যাঁচার মতো হয়ে গেল ইব্রাহিমের। ব্যাপারটা খেয়াল করল নটিমোল্লা। বিস্মিত চেহারায় জানতে চাইল, 'ভাজা ঘাস-ফড়িং পছন্দ করো না তুমি?'

'আসলে ব্যাপারটা তা নয়,' সাবধানে শব্দ চয়ন করছে ইব্রাহিম যাতে রেগে না যায় চীফ। 'আসল ব্যাপারটা হলো খাবার ব্যাপারে ইয়ে...কতগুলো নিয়মকানুন পালন করতে হয় ইহুদিদের।'

মাথা দোলাল নটিমোল্লা। 'শুনেছি আমি সেসব। তাহলে বরং তোমাকে গুবরে পোকার কেক বা কেঁচোর ভর্তা দিতে বলি?'

'না চীফ,' অনেক কষ্টে উগরে আসা বমি ঠেকাল ইব্রাহিম। 'কিছু লাগবে না আমার। পেটটা ভাল নেই।'

'কিছু না কিছু তো খেতেই হবে। খরগোসের গোস্ত দিতে বলি?'

'না, চীফ। নিয়ম মতো জবাই না করলে সেই জন্তুর মাংস খাওয়া আমাদের ধর্মে নিষেধ আছে। তাছাড়া খুর নেই যেসব চারপেয়ে প্রাণীর সেগুলোও খাওয়া চলবে না।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল নটিমোল্লার চেহারা। 'ও, এতোক্ষণে বুঝেছি। অ্যান্টিলোপ চারপেয়ে। খুরও আছে তার। অ্যান্টিলোপ খেতে তোমাদের ধর্মে নিশ্চয়ই নিষেধ নেই?'

'তা নেই। তবে জবাই করতে হবে নিয়ম মতো।' ইব্রাহিম টের পেল লালা জমে গেছে ওর জিভের গোড়ায়। এই ইন্ডিয়ানরা নিশ্চয়ই অ্যান্টিলোপ পালে, নাহলে এভাবে মাংসের কথা বলত না। এখন একটা অ্যান্টিলোপ জবাই করে তারপর আগুনে সেঁকে...ওয়াহ্! সড়াৎ করে লালা টেনে নিল ইব্রাহিম।

'দুঃখের কথা আমাদের কাছে অ্যান্টিলোপ নেই।' ইব্রাহিমের আশার বৃক্ষে তীক্ষ্ণ করাত চালিয়ে দিল নটিমোল্লা। বেননের দিকে তাকাল সে। বলল,

'তোমার নিশ্চয়ই খাবার ব্যাপারে অত বাছবিচার নেই?'

দ্বিধান্বিত চোখে ভাজা ঘাস-ফড়িঙের দিকে তাকাল বেনন।

'আরে খেয়ে দেখো না!' উৎসাহ দিল নটিমোল্লা।

নটিমোল্লা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে চেহারা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘাস-ফড়িঙের একটা টুকরো মুখে পুরে চিবিয়ে গিলে ফেলল বেনন। মাথা নেড়ে বলল, 'ভাল খুবই কড়মড়ে।'

'খেতে মোটেও ভাল নয়, তবে খেলে অন্তত খিদের জ্বালায় মরতে হয় না,' ওকে অপ্রস্তুত করে বলল চীফ। ইব্রাহিমের দিকে তাকাল। 'পাইনের বাদাম চলবে, নাকি তাতেও নিষেধ আছে?'

'না, ফলফলারিতে মানা নেই।'

বউয়ের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল নটিমোল্লা। উঠে ঘরের কোনায় চলে গেল মহিলা। একবাটি বাদাম এনে রাখল ইব্রাহিমের সামনে।

একটা বাদাম মুখে পুরে চিবাল ইব্রাহিম। বলল, 'খেতে ভাল। খুব সুস্বাদু।'

'তোমার ঈশ্বর খুব নিষ্ঠুর,' বলল চীফ, 'তা নাহলে এতো খাবার থেকে তোমাকে বঞ্চিত করত না।'

'হয়তো।' তর্কে যেতে চাইল না ইব্রাহিম। কিন্তু কিছু একটা সাফাই গাওয়া দরকার অনুভব করে বলল, 'কিন্তু আমাদের এই ত্যাগের বদলে অনেক কিছুই আমাদের দিয়েছেন তিনি।'

'কয়টা ঈশ্বর তোমার?'

'একটা।'

'তাহলে সে নিশ্চয়ই খুব একা। সেজন্যেই বোধহয় নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।'

'কিরকম?'

'বৃষ্টি দেয় না কেন তাহলে?'

সর্দারের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধের অন্ধকার চিরে ঝিকিয়ে উঠল বিদ্যুৎ। কড়-কড়-কড়াত শব্দে বাজ পড়ল। তারপরই শুরু হয়ে গেল মুষলধারে বৃষ্টি।

সর্দারকে কি যেন বলে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল ওঝা।

ওরা নটিমোল্লার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাতেই সে বলল, 'পন্যান্ট গেছে আমাদের ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করতে। এতো উৎসর্গ পেয়েও কেন সে আজ এতোগুলো চাঁদ বৃষ্টি দিতে পারেনি তা জানা দরকার।'

উঠে দাঁড়াল সর্দার। তার দেখাদেখি বাকিরাও দাঁড়িয়ে গেল।

'তোমরা নিশ্চয়ই ক্লান্ত,' বলল নটিমোল্লা। 'আর বিরক্ত করব না। পাশের ঘরেই বিশ্রাম নিতে পারো তোমরা।' একজন ব্রেভকে ডাকল সে। 'এই, এদের ঘর দেখিয়ে দাও।'

সর্দারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা। মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে, কিন্তু আকাশ ঘন কালো। ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে–ধুলোহীন।

*

পরদিন সকালে চীফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল ওরা

ইব্রাহিমকে একটা ঘোড়া দিয়েছে চীফ। চমৎকার একটা কালো স্ট্যালিয়ন। দৌড়ের তালে তালে কিলবিল করছে ওটার শক্তিশালী পেশি।

কোমরে গোঁজা ছোরায় হাত বোলাল ইব্রাহিম। এটাও চীফের উপহার। হাতলটা মোষের শিঙের তৈরি। কারুকাজ করা। পাতটা চওড়া এবং ধারাল।

এক নাগাড়ে ঘোড়া ছোটাল ওরা। চারটা দিন কেটে গেল নির্বিঘ্নে।

ওয়াকার পাস আর সিয়েরা নেভাডা পেরিয়ে এলো ওরা; তারপর স্ট্যানিস্লওস নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চলল পশ্চিম-দক্ষিণে।

মাঝে একবার মডেস্টোতে ক্যাম্প করল। তারপর সান জ্যাকুইন ভ্যালি হয়ে পৌঁছল সান হোসে শহরে।

গোল্ডরাশ শুরুর আগে সান হোসে ছিল ঘুমন্ত একটা স্প্যানিশ শহর। এখন শহরটা প্রসপেক্টরদের সাপ্লাই বেজ। জনসংখ্যা তিন হাজার। কিন্তু ড্রিফটারের সংখ্যা স্থায়ী বাসিন্দার তিনগুণ। ব্যস্ত শহর। রাস্তায় এই ভর সন্ধেতেও অসংখ্য লোকের আনাগোনা। কালো হ্যাট পরা মেক্সিকান, পুব থেকে আসা ব্যবসায়ী, দক্ষিণের ট্র্যাপার, দাড়িওয়ালা মাইনার, ইন্ডিয়ান শ্রমিক, ফরাসী পতিতা আর চাইনিজ ব্রথেল মাস্টার—সব পেশার মানুষই এশহরে উপস্থিত।

বাড়িগুলো বেশিরভাগই কাঠের, ফলসফ্রন্ট দেয়া। সামনে কাপড়ে বিজ্ঞাপন লিখে রেখেছে ব্যবসায়ীরা। সব পণ্যই উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে এশহরে মেলে। দোকানগুলোর বিজ্ঞাপন দেখলে মনে হয় দুনিয়ার সব কিছুই আছে ওখানে। জেনারেল স্টোরের সামনে টাঙানো ক্যানভাসে লেখা আছে: এখানে সব ধরনের মদ, পর্ক, ময়দা, বীন, পিকলস, সাবান, বসটন ক্র্যাকার্স, ম্যাট্রেস, ব্ল্যাঙকেট, মাইনারের কোট আর প্যান্ট, ফ্ল্যানেল শার্ট, ড্রয়ার্স, গার্নসি ফর্কস, রাবার ওয়েডার্স, ক্র্যাডলস, শাবল, কোদাল, কুড়াল, অষুধ, খবরের কাগজ, বই ইত্যাদি যাবতীয় দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

একটা সেলুনের সামনে ঘোড়া থেকে নামল বেনন। ঘোড়াটাকে বাঁধল হিচর‍্যাকের সঙ্গে।

ইব্রাহিম ঘোড়া থেকে নামতে গড়িমসি করে বলল, 'কি করতে এখানে এসেছি আমরা?'

'পথে পড়েছে শহরটা। ভাবলাম একটু ঘুরেই যাই। তাছাড়া এখান থেকে তুমি সান ফ্রান্সিসকোয় চিঠি পাঠিয়ে জানাতেও পারবে যে তুমি আসছ।'

'ঠিক বলেছ!' লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল ইব্রাহিম। পাশ দিয়ে এক মাইনারকে যেতে দেখে হাত তুলে তাকে দাঁড় করিয়ে জানতে চাইল, 'বলতে পারো পোস্ট অফিসটা কোনদিকে?'

'এই রাস্তার শেষ মাথায়,' জানাল লোকটা। 'মার্ডারার্স বার পেরিয়ে কাট আইয়ের বার। অফিসটা তার পরেই।'

'ধন্যবাদ।'

লোকটা চলে যেতেই আবার ঘোড়ায় চড়ল ওরা। দুই মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল দোতলা একটা কাঠের বাড়ির সামনে। ওটাই পোস্ট অফিস: বিকেলেই বন্ধ হয়ে গেছে, ফলে ইব্রাহিমের চিঠি পাঠানো পিছিয়ে দিতে হলো।

ফিরে এসে অক্সিডেন্টাল সেলুনের উল্টোদিকের বোর্ডওয়াকে বসল ইব্রাহিম। বেনন গেল রাতে থাকার বন্দোবস্ত করতে। অর্থ সংকটে আছে, কাজেই পারলে স্টেবলেই থাকার ব্যবস্থা করবে ও।

উদাস হয়ে গেল ইব্রাহিম সেলুন থেকে ভেসে আসা পিয়ানোর কোমল সুরে। কিছুক্ষণ পরে সেলুনের পাশের গলিটাতে ঢুকল ও। আগেই দেখেছে গলিতে সেলুনের জানালা আছে। সেলুনের ভেতরে তাকাতে পারে কেউ ইচ্ছে করলে। জানালায় নাক ঠেকিয়ে দাঁড়াল ইব্রাহিম।

ঘরের মাঝখানে ঝোলানো ঝাড়বাতির আলোয় ভেতরটা একেবারে ঝলমল করছে। চার দেয়ালে ঝুলছে বড় বড় আয়না। আলো প্রতিফলিত হচ্ছে ওগুলো থেকে। আয়নার পাশে দেয়ালে সেঁটে রাখা হয়েছে অর্ধউলঙ্গ নারীদেহের পোস্টার।

টেবিলে কয়েকরকম জুয়ার ব্যবস্থা। ক্র্যাপস, ফারো বা মন্টে–খেলছে যার যেটা খুশি।

কিছুক্ষণ ভেতরের আমোদ দেখে ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়াল ইব্রাহিম। ওই একই সময়ে কাছের একটা দরজা দড়াম করে খুলে গেল। গোলাপী আন্ডারপ্যান্ট আর বওলার হ্যাট পরা এক বয়স্ক লোক ছিটকে বেরিয়ে এলো। চেঁচাচ্ছে সে মহাফূর্তিতে।

'ইয়াহু! ইয়াহুহু!'

গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতেই প্রধান সড়ক ধরে দৌড়তে দৌড়তে চলে গেল লোকটা।

অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখল ইব্রাহিম। ওদের দেশে বয়স্য কারও কাছ থেকে এরকম আচরণ কল্পনার অতীত। আপন মনে মাথা নেড়ে ভাবল ও, দারুণ একটা দেশে এসে পড়েছি আমি কপাল গুণে। এখানে পাগলামি করলেও ফাটকে আটকে রাখে না। অজান্তেই মাতাল লোকটাকে অনুকরণ করল ও। প্রায় রাস্তার কাছে চলে এসেছে এমন সময় ওর পথ আটকে দাঁড়াল বিশালদেহী একজন লোক। লোকটার বুক পকেটের ওপর ঝুলছে একটা টিনের তারা।

'ইভনিং!' জলদগম্ভীর স্বরে লোকটা সম্ভাষণ জানাল।

'হ্যালো।' মাথা দোলাল ইব্রাহিম।

'রাস্তায় আমরা কাউকে নাচতে দিই না,' বলল শেরিফ। 'নাচতে ইচ্ছে হলে সেলুনে গিয়ে নাচবে।'

'ধন্যবাদ,' ঢোক গিলে বলল ইব্রাহিম। লোকটা চলে যেতেই স্বস্তির শ্বাস ফেলল। এখানেও দেখা যাচ্ছে নিয়ম কানুন আছে!

তবে ভাল পরামর্শই দিয়েছে শেরিফ। পকেটে যদিও পয়সা নেই, তবুও সেলুনে যাওয়া যেতে পারে। কিছু না কিনলেই হলো। নাচতে গেলে তো আর

পয়সা লাগে না।

সোজা গিয়ে অক্সিডেন্টাল সেলুনে ঢুকল ইব্রাহিম। ভেতরের জাঁকজমক দেখে একটু ভড়কে গিয়ে দরজার কাছে কাছে থাকল ও। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেই ব্যাটউইং ঠেলে সটকে পড়বে।

পিয়ানোর সঙ্গে সঙ্গত করছে এখন একটা ব্যাঞ্জো। উৎসবের পরিবেশ সেলুনের ভেতরে। পকেটে পয়সা থাকলে জীবনটা উপভোগ করা যায় এটা অনুভব করতে চাইলে এমন জায়গাতেই যাওয়া প্রয়োজন।

ব্যস্ত হয়ে টেবিলে টেবিলে হাঁস আর খাসির রোস্ট, স্যামন আর বিয়ার সার্ভ করছে ওয়েইটাররা। বিনে পয়সায় খদ্দেরদের দেয়া হচ্ছে রেড ওয়াইন, হোয়াইট ওয়াইন, স্যাম্পেন আর কনিয়াক মিশিয়ে তৈরি পানীয়।

টেবিলে সোনার গুঁড়ো বাজি রেখে চলছে জুয়া।

ঘরটা ভরে আছে সিগারেটের ধোঁয়ায়। দূরে দেখা যায় না ভাল মতো। সেজন্যেই লোকটাকে দেখতে পেল না ইব্রাহিম। কিন্তু গলার আওয়াজটা শুনেই চিনতে পারল নিমেষে।

আক্ষেপ করেছে লোকটা। 'শালার কপালটাই খারাপ আমার!'

ঘাড় ফিরিয়ে লোকটাকে খুঁজল ইব্রাহিম। দেখতে পেল একটা রুলেত টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাট ডিগস। তার পাশেই মিস্টার জোন্স আর ডেরিল ডিগস—টেবিলে ঝুঁকে ক্রুপিয়ের কাছ থেকে চীপস নিচ্ছে।

ঝামেলায় যেত না ইব্রাহিম, গতবারের শিক্ষা ভোলেনি ও; কিন্তু এখানে অনেক লোক উপস্থিত। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা, ম্যাট ডিগসের গলার চেইনে ঝুলছে ওর টেন কমান্ডমেন্ট। দ্বিধা না করে হনহন করে হেঁটে লোকটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল ও। একটানে চেইন ছিঁড়ে খুলে নিল রুপোর পাতটা।

ঘুরে দাঁড়াল বিস্মিত ম্যাট। চোখ কুঁচকে চেনার চেষ্টা করল ওকে। চিনতে পারল না। ইব্রাহিমকে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে আসা মাতাল মনে করে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, মিস্টার?'

জবাব না দিয়ে পিয়ানোর ওপরে রুপোর প্লেটটা রাখল ইব্রাহিম। প্লেয়ারকে বলল, 'এটা দেখে রাখো।' তারপর ঘুরে তাকাল ম্যাটের দিকে। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'এবার আমার টাকা ফেরত দাও।'

'কে তুমি?' জানতে চাইল জোন্স।

'ব্যাটা নিশ্চয়ই বেশি গিলে ফেলেছে,' বলল ডেরিল।

ওদের কথায় কর্ণপাত করল না ইব্রাহিম। ম্যাটের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, 'চুরি করেছিলে তোমরা। সেই টাকা ফেরত চাই আমি।'

'ইয়ার্কি মারা হচ্ছে, নাহ্!' ওর বুকে ধাক্কা দিল ম্যাট।

এবার কি ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে ধারণা আছে ইব্রাহিমের। ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল ও। তারপরই সামনে বেড়ে ঘুসি বসিয়ে দিল ম্যাটের নাকে। শান্ত গলায় বলল, 'টাকা ফেরত দাও।'

নাক থেকে রক্ত মুছে ইব্রাহিমের দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকাল ম্যাট।

থেমে গেছে সেলুনের স্বাভাবিক গুঞ্জন। সবাই দেখছে ওদের। বাজনা থেমে গেল।

'আমি ঝামেলা চাই না,' বলল ইব্রাহিম। 'আমার টাকা ফেরত দাও, চলে যাচ্ছি।'

'খুন করে ফেলব তোকে আমি!' জবাবে চাপা গর্জন ছেড়ে ইব্রাহিমের চোয়ালে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ম্যাট।

ছিটকে গিয়ে একটা পোকার টেবিলের ওপরে পড়ল ইব্রাহিম। সেখান থেকে একজন প্লেয়ারের পায়ের পাশে মাটিতে। প্লেয়ার নিচু গলায় তাকে উপদেশ দিল, 'ভান করো মারাত্মক আহত হয়েছ, নাহলে স্রেফ মারা পড়বে, বাছা। কাউকে চোর বলা আর নিজের মৃত্যুর পরোয়ানা নিজে লেখা একই কথা।'

হাসছে মিস্টার জোন্স আর ডিগস ভাইরা। তৈরি হয়ে আছে ম্যাট। ডেরিল তার পেছনে। প্রয়োজনে সর্বতো সাহায্য করবে।

চোয়াল গুঁড়ো হয়ে গেছে বলে মনে হলো ইব্রাহিমের। মনে হলো আগুন ধরে গেছে মাথার ভেতরে। তবুও উঠে দাঁড়াল ও। টলতে টলতে এগোল ম্যাটের দিকে।

ইব্রাহিমকে একেবারে গায়ের কাছে আসতে দিল ম্যাট। তারপর বামদিকে সরে ঘুসি মারল যাজকের নাকে। পা বাধিয়ে ওকে ফেলে দিল ডেরিল। দাড়ি ধরে মুখটা উঁচু করে দেখল। দেখা শেষে মাথাটা ঠুকে দিল সে কাঠের মেঝেতে। একটা চেয়ার ইব্রাহিমের পিঠে ভাঙল জোন্স। অজ্ঞান হয়ে গেল ইব্রাহিম।

'ওকে বারের ওপরে শোয়াও,' বলল ম্যাট। সাঙ্ঘাতিক রেগে গেছে ও ইব্রাহিমের ঘুসি খেয়ে। দফারফা করে ছাড়বে ও যাজকের। লোকটা সবার সামনে ওকে চোর বলেছে, কাজেই পিটিয়ে মেরে ফেললেও কারও কিছু বলার নেই।

জোন্স আর ডেরিল মিলে চ্যাংদোলা করে ইব্রাহিমকে বার কাউন্টারের ওপরে শুইয়ে দিল। এক বাড়িতে লোকটার চেহারা ভর্তা করে দেবার ইচ্ছেয় কাঠের একটা বিয়ার মগ ইব্রাহিমের মুখের ওপরে তুলল ম্যাট।

মগটা গায়ের জোরে নামিয়ে আনবে এমন সময় গুলির আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল ওটা।

চমকে ফিরে তাকাল সবাই।

দেখল ব্যাটউইঙের পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে আয়েসী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণ। তার হাতে ধরা সিক্সগানের নল থেকে নীলচে ধোঁয়া বেরচ্ছে।

'নড়বে না কেউ,' শান্ত গলায় সাবধান করল বেনন। সিক্সগানের নল ম্যাটের দিকে তাক করল। 'এই যে তুমি। দেড়শো ডলার চুরি করেছিলে তোমরা এই নিরীহ লোকটার কাছ থেকে। ভাল চাইলে টাকাটা ফেরত দাও।'

দ্বিধান্বিত চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল তিন দস্যু। ড্র করবে কিনা

মনস্থির করতে পারল না। বয়স কম হলেও তরুণের আচরণে কোনরকমের চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এধরনের পরিস্থিতি কিভাবে সামলাতে হয় তা সে জানে। ওদের ধারণাটা আরও পাকাপোক্ত করে দিল বেনন। ওর পরবর্তী গুলি ম্যাটের প্যান্টে আঁচড় কেটে দুই উরুর মাঝ দিয়ে চলে গেল।

চোখে ভয় নিয়ে নিম্নাঙ্গের দিকে তাকাল ম্যাট। শিউরে উঠল ডেরিল।

'এর পরের গুলিটা কোথায় লাগবে তা তুমি জানো,' বলল বেনন।

জোন্সকে ইশারা করল ম্যাট। কোটের ভেতরে হাত ভরে একটা থলে বের করে কাউন্টারের ওপরে নামিয়ে রাখল জোন্স।

'এবার দূর হয়ে যাও তোমরা,' মতামত জানাল বেনন। 'আর যদি তোমাদের দেখি তাহলে কপালে খারাবি আছে জেনো।'

মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল লোকগুলো। যাওয়ার আগে অগ্নিদৃষ্টিতে বেনন আর ইব্রাহিমকে দেখে গেল। বুঝে গেল বেনন, এদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে। বেকায়দায় পড়েছিল বলে হার স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু সহজে এই অপমান ভুলে যাবার লোক নয় এরা।

লোকগুলো চলে যেতেই অস্ত্র খাপে পুরে কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল বেনন। চট করে থলের টাকা গুনে ফেলল। পাঁচশো পঁচাত্তর ডলার।

মাত্র জ্ঞান ফিরছে যাজকের। ওর মুখে আধ মগ বিয়ার ঢেলে দিল বেনন। ইব্রাহিম ধড়ফড় করে উঠে বসতেই বলল, 'বড়লোক হয়ে গেছ তুমি।'

'কখন হলাম?' ব্যাপার বুঝতে না পেরে জানতে চাইল ইব্রাহিম।

'এখন। এই মাত্র।' থলেটা যাজকের হাতে দিল বেনন। 'এবার আমরা হোটেলে উঠে নরম বিছানায় ঘুমাতে পারব। চাই কি বাথটাবে গোসলও করা যাবে।'

'তাহলে দেরি কিসের!' কাউন্টার থেকে লাফ দিয়ে নামল ইব্রাহিম। 'চলো। কতো দিন ভাল বিছানায় ঘুমাইনি!'

ক্যালিফোর্নিয়া।

সান ফ্রান্সিসকো।

বেন্ডারদের বাসা।

লিভিং রুমে ছোট মেয়ের ওপরে চোটপাট করছে স্যামুয়েল বেন্ডার।

'তুমি ওকে সাহায্য করেছ! হ্যাঁ, তোমার সাহায্য না পেলে একাজ করার সাহস একা ও কিছুতেই করতে পারত না।'

মাথা নিচু করে সেলাই করছে রোজি। মুখ তুলে তাকাল না।

'তুমি জানতে!' পায়চারি করতে করতে বলল স্যামুয়েল। 'তুমি জানতে এমনটা ঘটতে যাচ্ছে।'

থিম্বলটা কায়দা করে ধরল রোজি।

'কথার জবাব দেয়ার ভদ্রতাও শেখোনি তুমি!' গর্জন ছাড়ল বেন্ডার। 'কি হলো, কিছু বলছ না কেন!'

সেলাইয়ের সরঞ্জাম কোলে নামিয়ে বাবার দিকে তাকাল রোজি। 'হ্যাঁ,

ওকে সাহায্য করেছি আমি।'

'তুমি আমার হৃদয় ভেঙে দিয়েছ, রোজি, আমাকে চরম অসম্মান করেছ!' রাগে লাল হয়ে গেল বেন্ডার। 'কেন করলে কাজটা?'

'তোমার র‍্যাবাই কবে আসবে, বাবা?'

'জানি না। অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছ কেন, যা জিজ্ঞেস করেছি তার জবাব দাও। একবারও কি ভাবোনি কতোখানি কষ্ট পাব আমি তোমাদের এই আচরণে?'

'কিন্তু, বাবা, তুমি নিজেই তো বললে র‍্যাবাই আদৌ আসবে কিনা সেটা তুমি জানো না। যে আসবে কিনা ঠিক নেই তার জন্যে নিজের মেয়ের সুখ বিসর্জন দিয়ে দেবে তুমি এমন আমি বিশ্বাস করি না।'

জবাব খুঁজে না পেয়ে হাতের তালুতে ঘুসি মারল বেন্ডার।

'তুমি হয়তো আমাকে খানিকটা চেনো, বাবা,' বলল রোজি। 'কিন্তু তোমার বড় মেয়েকে তুমি কোনদিনই চিনতে পারোনি। জুলিয়াসকে ভালবাসে ও। ওকে বিয়ে করতে চায়, বাবা! আর কাউকে নয়। তোমার র‍্যাবাই ওকে কোনদিনই সুখী করতে পারত না। এই ভাল হয়েছে। নিজের পথ সারা নিজেই দেখে নিয়েছে।'

শ্রাগ করল বেন্ডার। হঠাৎ চিন্তার জট খুলে গেল তার। বলল, 'ঠিক আছে, সারা চলে গেছে। তুমি তো আছ। তোমার সঙ্গেই র‍্যাবাইয়ের বিয়ে দেব আমি।'

'হয়তো, বাবা, হয়তো।' আবার সেলাইয়ে মন দিল রোজি। 'যদি তার চোখ আমার পছন্দ হয়।'

'আবার বেয়াদবের মতো কথা!' ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল স্যামুয়েল কিছুতেই সে বুঝতে পারে না আজকালকার মেয়েগুলোর হয়েছেটা কি। আদব কায়দা ভুলতে বসেছে এরা। অভিভাবকদের কথার কোন গুরুত্বই দেয় না!

তেরো

উপকূলবর্তী নিচু দুটো টিলার মাঝামাঝি জায়গায় মাইনিঙের কাজ চলছে। বড় একটা টানেল খোঁড়া হয়েছে। পূর্ণোদ্যমে চলছে সোনা উত্তোলন।

এখন বিশ্রামের সময়। টানেলের বাইরে বসে দুপুরের খাবারটা খেয়ে নিচ্ছে মাইনাররা।

লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল বেনন আর ইব্রাহিম।

আধঘণ্টা পরে দু'সারি টিলা পার হতেই ওদের চোখে পড়ল প্রশান্ত মহাসাগরের সুনীল বিস্তৃত জলরাশি।

'এসে পড়েছি আমরা,' জানাল বেনন।

মাটিতে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা সেরে নিল ইব্রাহিম। তারপর বলল, 'এই প্রাপ্তি আমার কাছে সোনার খনি পাবার চেয়েও বেশি।'

টিলার ঢাল বেয়ে সরু একফালি বালুকাবেলায় নেমে এলো ওরা। গাছের কাটা কাণ্ড আর বড় বড় বোল্ডার পড়ে আছে সৈকতে। বালুতে এসে আছড়ে পড়ে ভাঙছে একের পর এক ঢেউ—যেন মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ। ফেনা তুলে নিজেদের অস্তিত্বের চিহ্ন রেখে ফিরে যাচ্ছে সাগরে।

ছোট একটা আগুন তৈরি করল বেনন। তারপর দু'জনেই কাপড় ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রে।

'ঠাণ্ডা!' এক ডুব দিয়ে মাথা তুলে কাঁপতে কাঁপতে বলল ইব্রাহিম।

'শরীরের জন্যে ভাল!' ঢেউয়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে জানাল বেনন।

দশমিনিট পর আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে কাপড় পরতে লাগল ওরা। ফ্লানেলের শার্টটা দিয়ে গা মুছতে লাগল বেনন। গা মোছা শেষে এক পায়ে দাঁড়িয়ে প্যান্ট পরছে এমন সময় হাসতে হাসতে ওকে ধাক্কা দিল ইব্রাহিম। প্রস্তুত ছিল না, ফলে তাল হারিয়ে পড়ে গেল বেনন। পড়েই যাজকের ঠ্যাং ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ফেলে দিল ও। গড়াতে লাগল দু'জন। কুস্তি লড়ছে।

ইব্রাহিমকে প্রায় কাবু করে এনেছে বেনন, এমন সময় ওর পায়ের কাছে বালিতে নাক গুঁজল একটা বুলেট।

চমকে গিয়ে ঝটকা দিয়ে সরে গেল দু'জন দু'দিকে। বেনন দেখল কাছেই একটা বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে জোন্স আর ডিগস ভাইরা। ঘোড়ায় বসে আছে তিনজন। জোন্স আর ডেরিলের হাতে পিস্তল। ম্যাটের হাতে ডবল ব্যারেল শটগান। অস্ত্রগুলো ওদের ওপর তাক করা।

অসহায় দৃষ্টিতে নিজের অস্ত্রের দিকে তাকাল বেনন। ওগুলো ছয়ফুট দূরে আগুনের ধারে, হোলস্টারের সঙ্গে রয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে ঘোড়াগুলোকে সামনে বাড়াল ডিগসরা। আগুনের ধারে ইব্রাহিমের বাক্সটা দেখতে পেয়ে শটগানের নল দিয়ে ঠেলে ওটাকে আগুনের ভেতর ফেলে দিল ম্যাট। ঘোড়া থেকে নামল ওরা।

ইব্রাহিমের মনে হলো গলার কাছে আটকে গেছে কি যেন একটা।

'এসো ব্যাপারটা শেষ করা যাক,' সিদ্ধান্ত নেয়ার ভঙ্গিতে বলল ম্যাট। এদের বাঁচিয়ে রাখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার।

'কাজটা আমিই করছি,' বলল জোন্স। কথা শেষ করেই পিস্তল তুলতে শুরু করল সে।

এই শেষ সুযোগ, বুঝতে বেননের দেরি হলো না। ঝুঁকি আছে, কিন্তু এরপর আর কোন উপায় থাকবে না মৃত্যুবরণ ছাড়া। ঘাড় ধরে ইব্রাহিমকে দূরে ছুঁড়ে দিল ও। একই সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল হোলস্টারের ওপরে।

ডেরিলের হাতে পিস্তল গর্জে উঠল। বেননের শার্টের হাতা ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল গুলিটা।

তোয়াক্কা করল না বেনন। হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের করার ঝামেলাতেও গেল না। সিক্সগানটা হোলস্টারসুদ্ধই ডেরিলের দিকে তাক করে ট্রিগার টিপে দিল। কপালে গুলি খেল ডেরিল। ধড়াস করে মাটিতে পড়ল। ভড়কে গেল ম্যাটের ঘোড়াটা। উন্মত্তের মতো লাফিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল। ঘোড়াটার কারণেই গুলি মিস করল ম্যাট

বোল্ডারের দিকে পেছাতে শুরু করে পিস্তল তুলল জোন্স। ট্রিগার টেনে দিল। গুলিটা লাগল বেননের বুকের ডানদিকে। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পেছনে পড়ে গেল ও। ওই অবস্থাতেই পরপর কয়েকটা গুলি করল বেনন। হোলস্টারের কারণে বেকায়দা ভঙ্গিতে ধরতে হয়েছে অস্ত্রটা, ফলে লাগাতে পারল না একটাও।

এদিকে আগুন ধরে গেছে ইব্রাহিমের বাক্সে। গোলাগুলির মাঝ দিয়েই দৌড় দিল ইব্রাহিম। হাতল ধরে হ্যাঁচকা টানে আগুনের ভেতর থেকে সরিয়ে আনল ওটা। ভিজে বালির ছিটেতে আগুন নিভিয়ে ফেলল।

বেননের পঞ্চম গুলি জোন্সের গায়ে লাগল না। ষষ্ঠ গুলি করল ও ম্যাটকে লক্ষ্য করে। এবার মিস করল না। ম্যাটের ভুরু চেঁছে নিয়ে চলে গেল গুলিটা। শটগান ফেলে দু'হাতে চোখ চেপে ধরল ম্যাট। আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরঝর করে পড়তে লাগল রক্ত। গোঙাতে গোঙাতে বোল্ডারের দিকে ছুটতে চাইল লোকটা। তারপর পড়ে গেল ধপ করে। গুলিটা করোটির গভীরে ঢুকে মগজ ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

গাছের কাণ্ডের পেছনে লুকিয়েছে জোন্স। বেননের সিক্সগানে গুলি নেই জেনে তাড়াহুড়োর মধ্যে গেল না, কাছ থেকে বেননকে ফুটো করার ইচ্ছেয় ধীরে ধীরে পিস্তলটা তুলল কাণ্ডের ওপরে। কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না।

ডেরিলের লাশের পাশেই বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে ইব্রাহিম। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

'অস্ত্রটা তুলে নাও!' চেঁচাল মরিয়া বেনন। 'গুলি করো ওকে!' পাগলের মতো চারপাশে তাকাল ও। সবচেয়ে কাছের বোল্ডারটা পঁচিশ ফুট দূরে। ওই পর্যন্ত যাওয়ার আগেই ওর লাশ ফেলে দেবে জোন্স।

বাক্সটা নামিয়ে রেখে পিস্তলটা হাতে তুলে নিল ইব্রাহিম। দূর থেকেও বেনন দেখল থরথর করে হাত কাঁপছে যাজকের।

ব্যাপারটা জোন্সেরও নজর এড়ায়নি। কারণ দৃঢ়পায়ে গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সে। আমল দিচ্ছে না ইব্রাহিমকে। অস্ত্রটা তাক করে রেখেছে বেননের দিকে। পনেরো ফুটের মধ্যে এসে ট্রিগার টেনে দিল।

ক্লিক করে একটা শব্দ করল শুধু হ্যামার। গুলি বেরল না। আবার ট্রিগার টিপল জোন্স। ফলাফল আগেরই মতো। গুলি নেই তার পিস্তলে।

'গুলি করো ওকে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল বেনন। বুকের ব্যথাটা টের পেতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে আগুন ধরে গেছে জায়গাটায়।

জোন্সের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করল ইব্রাহিম। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

ম্যাটের শটগানটা জোন্সের ফুট তিনেক দূরে পড়ে আছে। ইব্রাহিমের

চেহারা দেখে ওটা তোলার সাহস সঞ্চয় করতে পারল জোন্স। দেখল গালের পেশি কাঁপছে যাজকের। আস্তে আস্তে শটগানটা তুলে নিল জোন্স।

'গুলি করো ওকে! ও আমাদের খুন করবে!' প্রায় অনুরোধের মতো শোনাল বেননের স্বর।

সাবধানে ইব্রাহিমের মাথা লক্ষ্য করে শটগান তুলল জোন্স। অবাক হয়ে গেল যখন দেখল ইব্রাহিমের ট্রিগারে চেপে বসা আঙুলের নখ থেকে রক্ত সরে গেছে। ওই অবাক বিস্ময় নিয়েই মারা গেল লোকটা। ইব্রাহিমের গুলি জোন্সের গলা ছিন্নভিন্ন করে দিল।

গুলি করেই হাত থেকে পিস্তল ফেলে দিল ইব্রাহিম। দৌড়ে গিয়ে বসল বেননের পাশে।

'ভাগ্যিস আর দেরি করোনি!' দুর্বল গলায় বলল বেনন। 'মেরে ফেলত ওরা আমাদের।'

রুমাল দিয়ে বেননের ক্ষতের ওপর থেকে রক্ত সরাল ইব্রাহিম। দিশে হারানোর অবস্থা হয়েছে ওর হঠাৎ এই আক্রমণ এবং তার ভয়াবহ পরিণতি দেখে। কোনমতে জিজ্ঞেস করল, 'খুব লাগছে তোমার, বেনন?'

'না।' কপাল কুঁচকে গেছে বেননের জ্বলুনির চোটে। বলল, 'ব্যথা এখনও শুরু হয়নি। গুলিটা ভেতরে রয়ে গেল কিনা একটু দেখতে পারবে?'

'কি করে...কিভাবে...' শিউরে উঠল ইব্রাহিম।

'আমাকে তুলে ধরো।'

বেননকে ধরে আধবসা করল ইব্রাহিম।

'এবার দেখো পিঠে কোন ফুটো আছে কিনা।'

গোল একটা ফুটো দেখতে পেল ইব্রাহিম। রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে গর্তটা থেকে। 'হ্যাঁ, ফুটো আছে।' জানাল ও।

'ভাল,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল বেনন। 'কপালটা ভাল আমার। ভেতরে গুলি রয়ে গেলে মারা পড়তাম।'

'কি করব এখন?' অসহায় দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল ইব্রাহিম।

'আমার বেডরোল থেকে হুইস্কির বোতল আর স্যাডল পাউচটা নিয়ে এসো।'

'কিন্তু চিকিৎসার ব্যাপারে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই!'

'তার দরকারও নেই। যা বলব তাই শুধু করে যাবে তুমি। তাহলেই চলবে।'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল ইব্রাহিম। কিন্তু নড়ল না জায়গা ছেড়ে। চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে ওর।

'তুমি আগে কখনও মানুষ খুন করোনি, তাই না?' প্রথমবার ওর নিজের কেমন লেগেছিল মনে পড়ায় কোমল গলায় জানতে চাইল বেনন।

জবাব দিল না ইব্রাহিম। দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকল অপলক।

'তোমার কোন উপায় ছিল না, ইব্রাহিম,' কিছুক্ষণ পর বলল বেনন। 'তুমি কাজটা না করলে ওরা আমাদের খুন করত।'

ঠোঁটের ওপর চেপে বসল ইব্রাহিমের ঠোঁট। ঘন ঘন ঢোক গিলে কান্না থামাবার চেষ্টা করল।

আস্তে করে মাটিতে পিঠ ঠেকাল বেনন। 'আমি যদি ভুলে যাই বা অজ্ঞান হয়ে যাই সেজন্যে আগেই কয়েকটা কথা বলে রাখি, ঘোড়াগুলোর দিকে কিন্তু খেয়াল রেখো।'

'আচ্ছা।'

'আর ওদের দলে আর কেউ থাকতে পারে, কাজেই সতর্ক থেকো।'

'থাকব।' উঠে দাঁড়াল ইব্রাহিম।

'ঠিক আছে। তাহলে এবার হুইস্কি নিয়ে এসো।'

বেননের বেডরোলে দু'বোতল হুইস্কি পেয়ে দুটো বোতলই নিয়ে এলো ইব্রাহিম। একটা বোতল নিয়ে বড় করে চুমুক দিল বেনন। অন্যটা যাজকের হাতে দিয়ে বলল, 'এবার যেভাবে বলব সেভাবে যদি কাজটা সারতে পারো তো বেঁচে থাকব আমি। মনে রেখো, ইব্রাহিম, এখন দয়া দেখাতে যাওয়া আর আমাকে মেরে ফেলা একই কথা। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা।'

'বেশ, তাহলে একটা শার্ট ছিঁড়ে ফালি ফালি করো।'

নিজের একটা আন্ডারশার্ট ছিঁড়ে টুকরো করল ইব্রাহিম।

'এটা হলো ব্যান্ডেজ,' বলল বেনন। 'এবার ক্ষতটার মধ্যে হুইস্কি ঢালো।'

'কিন্তু...'

'যা বলছি তা না করলে জায়গাটা পচে যাবে, ইব্রাহিম।'

এখনও রক্ত পড়ছে ফুটোর মুখ দিয়ে। রুমাল দিয়ে রক্ত মুছে গর্তের ভেতরে হুইস্কি ঢালল ইব্রাহিম।

সহস্রগুণ বেড়ে গেল বেননের জ্বলুনি। ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলল ও। ক্ষতের দু'দিকেই হুইস্কি ঢালা হতে বলল, 'এবার আগুন থেকে জ্বলন্ত একটা কাঠি নিয়ে এসো। খেয়াল রেখো ওটার আগুন যাতে না নেভে।'

একটা জ্বলন্ত কাঠি নিয়ে এসে বোকার মতো বেননের দিকে তাকাল যাজক। 'এখন?'

'ওটা গর্তটার দুই মুখে চেপে ধরো।'

'কিন্তু...'

'যা বলছি আমার ভালর জন্যেই বলছি, ইব্রাহিম।'

নির্দেশ পালন করল ইব্রাহিম। হুইস্কিতে কাঠি ছোঁয়াতেই দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। চামড়া আর মাংস পুড়তে লাগল। কয়েক মুহূর্ত দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল বেনন। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল।

রাত নামার পর বেননের ঘুম ভাঙল। ব্যথা যাতে কম লাগে সেজন্যে আস্তে আস্তে উঠে বসল ও। দেখল আগুনের ধারে চুপ করে আত্মনিমগ্ন হয়ে বসে আছে গম্ভীর ইব্রাহিম। ব্যান্ডেজটা পরীক্ষা করে দেখল বেনন। যথেষ্ট

শক্ত করেই বাঁধা হয়েছে। এখন আর রক্ত পড়ছে না। অবশ হয়ে আছে জায়গাটা।

'কি ভাবছ এতো?' যাজককে চমকে দিয়ে জানতে চাইল বেনন।

'ওহ্, ঈশ্বর! তুমি তাহলে জেগেছ!' থতমত খেয়ে বলল ইব্রাহিম।

হাসল বেনন। 'ঈশ্বর জেগেই আছেন। আমি ঈশ্বর হতে যাব কোন দুঃখে!'

'আমি তা বোঝাতে চাইনি,' প্রতিবাদ করল পাদ্রি। প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল চট করে। 'কেমন লাগছে এখন? ব্যথা কি খুব বেশি?'

'না। তবে কালকে অবশ্য দপদপ করতে শুরু করবে জায়গাটা। কিন্তু চিন্তা নেই আর, আসল বিপদটা কাটিয়ে উঠেছি। সহজে মরছি না আমি।'

কফি বানাল ইব্রাহিম। একটা মগে করে দিল বেননকে। সঙ্গে কয়েকটা বিস্কুট। বেননের খাওয়া শেষ হতেই বলল, 'এবার সেঁটে ঘুম দাও। ঘুমালে শরীরের ক্ষত তাড়াতাড়ি শুকায়।'

'ব্যাপার কি?' ভ্রূ নাচাল বেনন। 'তোমাকে যেন কেমন মনমরা দেখাচ্ছে?'

'কই...না তো!' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল ইব্রাহিম।

তাগাদা দিল বেনন। 'বলে ফেলো কি হয়েছে।'

'কিছু না। ঘুমাও তো তুমি।'

স্যাডলের ওপরে ব্ল্যাংকেট ভাঁজ করে বালিশ বানিয়েছে ইব্রাহিম। সেই বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল বেনন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলল, 'তুমি আমাকে তোমার শিক্ষক মেনেছিলে। ওটা কি কথার কথা ছিল, নাকি সত্যি?'

'কি এসে যায় তাতে?'

'অনেক কিছু। জবাবটা আমার জানা দরকার।'

'হয়তো। আমি জানি না।' সাগরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ইব্রাহিম। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে মাথা খুঁড়ছে বালুকাবেলায়। ঢেউগুলো যখন উঁচু হচ্ছে, তারার আবছা মায়াবী আলোয় ওগুলোকে দেখাচ্ছে কালো দেয়ালের মতো। ইব্রাহিমের কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেল, কিন্তু একবারও চুমুক দেয়ার কথা মনে এলো না ওর।

যাজকের পেট থেকে কথা বের করা যাবে না বুঝে চোখ বুজল বেনন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্তে।

পাহারায় থাকল ইব্রাহিম।

চোদ্দো

পরদিন শেষ বিকেলে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজে সান ফ্রান্সিসকোতে প্রবেশ করল বেনন আর ইব্রাহিম।

গত কয়েক মাসে অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে শহরটা। প্রতিদিন নির্মিত হয়েছে তিরিশটা করে বাড়ি। দিনে এখন খুন হয় অন্তত দুটো, আর বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে একটা। সান ফ্রান্সিসকোতে এখন জুয়ার আড্ডার সংখ্যা এক হাজার। ঋণ দেয়া হয় হেরে যাওয়া জুয়াড়ীদের–সুদ প্রতি ঘণ্টায় শতকরা দশ পার্সেন্ট হারে। বন্দরে জাহাজ গিজগিজ করছে। সংখ্যায় এতোই বেশি যে বড়সড় একটা জঙ্গলের গাছের সংখ্যাও ততো বেশি থাকে না। তবে সব চেয়ে বাড় বাড়ন্ত ইঁদুরের। ওদের অত্যাচার এতোই মাত্রা ছাড়ানো যে বিড়াল বিক্রি হয় প্রতিটি দশ ডলারে।

পোর্টসমাউথ স্কয়ারে থামল বেনন আর ইব্রাহিম। জায়গাটা আগে আলুর বাজার ছিল। এখন হোটেল, জুয়ার আড্ডা আর রেস্টুরেন্ট সেন্টার হিসেবে সুপরিচিত।

এল ডোরাডো ক্যাসিনোর দিকে আঙুল তাক করল বেনন। 'কাজ সেরে এসে এখানেই পাবে আমাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল ইব্রাহিম।

'ঠিক জানো তো কোথায় যাচ্ছ তুমি?' পেছন থেকে জানতে চাইল বেনন।

'ডুপন্ট স্ট্রীট,' বলল ইব্রাহিম। 'কাছেই জায়গাটা।'

'সাবধানে যেয়ো,' হুঁশিয়ার করল বেনন। 'খারাপ লোকের অভাব নেই এখানে। আর সিডনি টাউনের দিকে ভুলেও যেয়ো না, প্যান্ট-শার্ট খুলে রেখে দেবে।'

জবাবে হাত নাড়ল ইব্রাহিম।

পাঁচ মিনিট পরে সন্ধের মরা আলোয় বগলে বাক্স আর হাতে একটা ঠিকানা লেখা কাগজ নিয়ে বেন্ডারদের বাড়ির সদর দরজায় উপস্থিত হলো সে। টোকা দিতে যাবে, তার আগেই ওকে অপ্রস্তুত করে খুলে গেল দরজাটা। চৌকাঠে এসে দাঁড়াল এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী। চিনতে পারল ওকে মুগ্ধ ইব্রাহিম। রোজি বেন্ডার। কিন্তু ছবিতে মেয়েটার রূপের কোন প্রকাশই ঘটেনি। দেখা যাচ্ছে সামনে থেকে মেয়েটা অনেক বেশি রূপসী।

'আহা!' মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল ওর।

'জ্বী?' বিভ্রান্ত চোখে ইব্রাহিমকে দেখল রোজি।

এতোক্ষণে আমেরিকান ভদ্রতা মনে পড়ল ইব্রাহিমের। তাড়াতাড়ি হ্যাট ছুঁয়ে বলল, 'হাওডি, ম্যাম।'

'হাওডি।'

'আমি আপনাদের র‍্যাবাইয়ের পরিচিত লোক, ম্যাম। র‍্যাবাই আপনার বাবাকে দেবার জন্যে একটা বই দিয়েছে।'

'আমার বাবা কে তা আপনি জানেন?'

'জ্বী। স্যামুয়েল বেন্ডার।'

ভ্রূ কোঁচকাল রোজি। 'কি করে জানেন? আপনার তো জানার কথা নয়!'

নিজের বুদ্ধির চমকে হাসি এসে পড়ছিল, কিন্তু বহুকষ্টে হাসি চেপে রাখল

ইব্রাহিম। শ্রাগ করে বলল, 'আপনাদের র‍্যাবাইয়ের মুখে শুনেছি।' বাক্স খুলে তাওরাতটা বের করে রোজির হাতে দিল সে। 'এটা দেবেন আপনার বাবাকে।'

'কিন্তু র‍্যাবাই কোথায়?' কেমন যেন সন্দেহের চোখে ইব্রাহিমকে দেখল রোজি। 'আপনাকে দেখে তো আমেরিকান মনে হচ্ছে না। ভেতরে আসুন, বাবাকে খবর দিচ্ছি।' দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল তরুণী। 'কোথাকার লোক আপনি? র‍্যাবাইয়ের সঙ্গে পরিচয়ই বা হলো কি করে, শুনি?'

বাবাকে ডাকার কথা শুনেই এক পা পিছাল ইব্রাহিম। 'সে অনেক কথা, ম্যাম। আমার সময় নেই, নাহলে সব খুলে বলতাম। শুধু জেনে রাখুন আমি আউট-ল রক বেনন। আপনাদের র‍্যাবাইয়ের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া ট্রেইলে দেখা হয়েছিল। আমি সান ফ্রান্সিসকো যাচ্ছি শুনে সে বলল বইটা যাতে পৌঁছে দিই।'

'আর র‍্যাবাই? তিনি কোথায়?'

'যতদূর জানি পথেই মারা গেছে।' ঘুরে দাঁড়াল ইব্রাহিম। 'আমি আসি, ম্যাম। আমার বন্ধু আমার জন্যে এল ডোরাডো ক্যাসিনোয় অপেক্ষা করছে।'

'এই যে শুনুন!' পেছন থেকে ডাক দিল রোজি। ওর সন্দেহটা বদ্ধমূল ধারণায় রূপান্তরীত হতে শুরু করেছে। ইব্রাহিম ফিরে তাকাতেই বলল, 'সত্যি কি র‍্যাবাই মারা গেছে, *মিস্টার রক বেনন*?'

'তাই তো আমি শুনেছি,' বলল ইব্রাহিম। মেয়েটার সৌন্দর্য ওকে বেসামাল করে তুলছে বুঝতে পারল পরিষ্কার। শেষপর্যন্ত মনকে বশ করতে পারল না। বলেই ফেলল, 'আপনার চোখ দুটো খুবই সুন্দর, ম্যাম। দেখলে মনে হয় সাত সাগরের সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে ওই দুই চোখে।'

লালের ছোপ পড়ল রোজির গালে। মুখ নিচু করে নিল।

'অ্যাডিয়োস, ম্যাম।' বারান্দা থেকে নামার জন্যে পা বাড়াল ইব্রাহিম।

পেছন থেকে রোজি বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন দয়া করে। বাবাকে খবর দিচ্ছি। তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন।'

থামল না ইব্রাহিম। চলার গতি দ্রুততর হলো ওর। বলতে গেলে প্রায় পালিয়েই এলো সে বেন্ডারদের বাড়ি থেকে।

শূন্যদৃষ্টিতে সামনে রাখা স্যামন আর আলু ভাজার দিকে তাকিয়ে আছে ইব্রাহিম। খাচ্ছে না কিছুই।

এল ডোরাডো ক্যাসিনো সান হোসে শহরের অক্সিডেন্টাল সেলুনের মতোই, তবে দশগুণ বড়। খাওয়া-দাওয়া পান আহারের ব্যবস্থা বিনে পয়সায়, জুয়াড়ীদের সুবিধার্থে। সবসময় তৈরি আছে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, চাইনিজ আর মেক্সিকান ডিশ। পোকারে হার-জিতের জন্যে যেহেতু প্রচুর সময় লাগে, সেজন্যে সবচেয়ে বেশি খেলা হয় মন্টে।

প্রচুর ভিড় এখন সেলুনে। অসংখ্য লোকের কথোপকথনে সর্বক্ষণ গুঞ্জরিত হচ্ছে জায়গাটা।

বিনে পয়সায় খাবার পেয়ে বুঁদ হয়ে পেট ভরে স্টেক খেল বেনন। পেট-পুজোয় নিমগ্ন থাকায় এতোক্ষণে দেখল যে বিয়ার ছাড়া আর কিছুই এখনও ছোঁয়নি ইব্রাহিম। যাজকের দাড়িতে বিয়ারের ফেনা লেগে আছে। ওর প্লেট থেকে কাঁটা-চামচ দিয়ে একটা আলু তুলে নিল বেনন। মুখে পুরে স্টেকের সঙ্গে চিবিয়ে গিলে ফেলল তারপর বলল, 'তুমি না খেলে বলো, আমি খেয়ে শেষ করছি। খাবার নষ্ট করা মহাপাপ।'

'খাও না, খাও যত খুশি,' বলল অন্যমনস্ক ইব্রাহিম।

'ঠাট্টা করছিলাম। পেট ভরে গেছে। খেয়ে নাও তুমি, তারপর আমরা যাব তোমার লোকদের কাছে। ওদের জানাতে হবে না নতুন র‍্যাবাই এসে গেছে?'

'আমি র‍্যাবাই হতে পারব না, বেনন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল যাজক।

'কেন?' প্রশ্নটা করেই বুঝতে পারল বেনন ইব্রাহিমের হতাশার কারণ। বলল, 'তুমি যদি লোকটাকে খুন না করতে তাহলে এতোক্ষণে আমাদের লাশ পচে যেত। বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল ইব্রাহিম।

'ওই লোক তোমাকে খুন করে আমাকে মারত। তাছাড়া কোন ধর্মে বলা নেই আত্মরক্ষা করা পাপ। ইহুদি ধর্মে বলেছে যে আত্মরক্ষা করা যাবে না?'

'না।'

'তাহলে বদমাশটাকে যে তুমি খুন করেছ সেটা কোন পাপ হতে পারে না।'

'তা ঠিক।'

'তাহলে খামোকা কথা বলে আমরা সময়ক্ষেপণ করছি কেন?'

তীব্র মনোকষ্টে চেহারা বিকৃত হয়ে গেল ইব্রাহিমের। বলল, 'ওরা যখন তোমাকে গুলি করছিল আমার উচিত ছিল তোমাকে সাহায্য করা। কিন্তু তা না করে আমি তাওরাতটা বাঁচাতে চেষ্টা করছিলাম।'

টেবিলে চাপড় মারল বেনন। 'এতেই তো প্রমাণ হয়ে গেল যে তুমি কে! বোকাও বুঝবে এটা। তোমার কাজই হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা। তুমি হচ্ছ জাত র‍্যাবাই।'

'আমি ঈশ্বরের জন্যে কাজটা করিনি।'

'অ্যাঁ?'

'আমি ঈশ্বরের কথা ভাবছিলাম না। ঈশ্বরের কি বুঝি আমি!' গলা চড়ে গেছে ইব্রাহিমের। মুখটা হয়ে গেছে টকটকে লাল। চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে। 'আমি শুধু একটা বইয়ের কথা ভাবছিলাম!'

'তাতে...'

'তুমি বুঝতে পারছ না, বইটাকে আমি তোমার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি।'

'তা তো দেবেই! বইটা তো পবিত্র। বইটা...'

'মানুষের জীবনের চেয়ে পবিত্র আর কিছু নেই।' মাথা নাড়ল ইব্রাহিম।

'আমি তোমাকে অপমান করতে চাই না...আমার কথা কি তুমি বুঝতে পারছ? তোমার চেয়ে পার্চমেন্টের একটা টুকরোকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি আমি!'

'ঠিক আছে ধরে নিলাম তোমার ভুল হয়েছে। তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম আমি।'

'কিন্তু, বেনন...'

'এটা এমন কোন বড় ব্যাপার নয়। আসল কথা হচ্ছে মানুষটা তুমি ভাল। তোমার সঙ্গে তর্কে যেতে চাই না, তবে এটা ঠিক যে যতই তুমি ভুলভাল দিকে রওয়ানা হও আর বোকামি করে বেড়াও তুমি যা তুমি তাই। তুমি র‍্যাবাই এতে সন্দেহ নেই কোন।' ইব্রাহিমের দিকে কড়া চোখে তাকাল বেনন। প্রায় বাচ্চাদের ধমক দেবার সুরে বলল, 'আমি বলে দিচ্ছি তুমি র‍্যাবাই। র‍্যাবাই এবং একজন ভাল মানুষ না হলে তোমাকে এতো কষ্ট করে এই পর্যন্ত পৌঁছে দেবার তাগিদ আমি অন্তর থেকে অনুভব করতাম না।'

'তুমি...তুমি বোধহয় ঠিকই বলছ,' দ্বিধা করে বলল ইব্রাহিম। বন্ধুর দিকে নতুন শ্রদ্ধা নিয়ে তাকাল।

মাথা নাড়ল বেনন। 'বোধহয়-এর কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি যা বলছি জেনে বুঝেই বলছি।'

চোখের কোণে কয়েকজন লোককে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল ইব্রাহিম। বুক ঢিবঢিব করতে লাগল ওর।

ওদের টেবিল থেকে পাঁচ ফুট দূরে থেমে দাঁড়াল লোকগুলো। দলের মধ্যে থেকে রোজি আর তার বাবা আগে বেড়ে বেননের সামনে দাঁড়াল। বিয়ালিক আর রোজেনশাইন পরিবার সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকল। জুলিয়াসের পাশেই সারাও দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে ভাবছে দেখতে যেমনই হোক, সবাই র‍্যাবাইকে এতো সম্মান দেখাবে জানলে জুলিয়াসের বদলে র‍্যাবাইকেই বিয়ে করত ও।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত,' গলা খাঁকারি দিয়ে বলল বেন্ডার। 'আমি স্যামুয়েল বেন্ডার–কংগ্রিগেশনের প্রেসিডেন্ট। আপনিই কি আমাদের র‍্যাবাই?'

'অ্যাঁ?' হঠাৎ এই প্রশ্নে চমকে গেল বেনন।

এবার ইদ্দিশ ভাষা ব্যবহার করল বেন্ডার। 'একথা কি সত্যি যে আমাদের র‍্যাবাই এশহরে পদার্পণ করেছেন?'

'বলে কি লোকটা?' ইব্রাহিমের দিকে তাকাল বেনন।

'জানতে চাইছে তুমিই র‍্যাবাই কিনা।'

'আমি?'

'হ্যাঁ।'

শ্রাগ করল বেনন। বলল, 'সত্যি কথাটা জানাও ওকে।'

বেন্ডার আর রোজির ওপরে ঘুরে এলো ইব্রাহিমের বিব্রত দৃষ্টি। তারপর বলল ও, 'আমিই র‍্যাবাই।'

চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল বেন্ডারের বিয়ার মাখা দাড়িওয়ালা রুগ্ন অথচ সুদর্শন তরুণকে দেখে। কোনমতে জানতে চাইল, 'আপনি! আপনি র‍্যাবাই? এখানে…এই জঘন্য পঙ্কিল পরিবেশে কি করছেন আপনি?'

'পান করছি,' জানাল ইব্রাহিম। 'হাজার মাইল পেরিয়ে মাত্র আমি এখানে পৌঁছেছি। যে বন্ধু আমাকে এতো দূরের পথ নিরাপদে পেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে তার স্বাস্থ্য পান করছি।'

'এই লোক আপনার বন্ধু?' বেননের ওপরে ঘুরে এলো বেন্ডারের বিস্মিত দৃষ্টি।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল ইব্রাহিম। গম্ভীর স্বরে বলল, 'আমার নাম ইব্রাহিম আশেক। লোকের চেহারা বা কাপড়চোপড় দেখে তাদের বিচার করি না আমি।'

'আমাদের মাঝে একজন র‍্যাবাই উপস্থিত হয়েছেন!' হঠাৎ চেঁচাল বিয়ালিক।

'হ্যাঁ, র‍্যাবাই!' প্রতিধ্বনি তুলল আরেকজন।

'টেঙ্ক গট!'

'কিনেহোরা।'

'ম্যাযেল টৌভ!'

বিভিন্ন ভাষায় একই কথা উচ্চারণ করল কয়েকজন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। বেন্ডার আর বিয়ালিক করমর্দন করল। মদের ব্যারেল আকৃতির মিসেস রোজেনশাইন এতো জোরে ইব্রাহিমকে জড়িয়ে ধরলেন যে দম আটকে এলো ওর। চোখে আফসোস নিয়ে সবকিছু চাক্ষুস করতে লাগল সারা বেন্ডার।

দু'দিন পর।

সান ফ্রান্সিসকো।

বেন্ডারদের বাসা।

ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান হলো। ইব্রাহিম আর রোজির বিয়ের অনুষ্ঠান।

প্রথম দেখাতেই পরস্পরকে ভাল লেগেছিল ওদের, কাজেই বেন্ডারের প্রস্তাবে আপত্তি করেনি ওরা।

সেরাতেই বিয়ের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল বেন্ডার, কিন্তু দেখা গেল ইব্রাহিম ছাড়া আর কেউ বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা জানে না। নিজের বিয়ে নিজে পড়ানো যায় কিনা তা জানা না থাকায় কোন ঝুঁকি নেয়নি ইব্রাহিম। এতোদিনে মাথাটা খুলছে ওর। বেননের জন্যেই আজও বেঁচে আছে ও, কাজেই আউটলকে সম্মান দেখাবার অভিনব একটা উপায় বেরল তার মাথা থেকে।

ইহুদি টুপি মাথায় দিয়ে বর-কনের হাত একসঙ্গে ধরে গড়গড় করে সুরা পড়ে গেল বেনন। গত দু'দিন খুব খাটুনি গেছে ওর। এতো কঠিন সব হিব্রু শব্দ উচ্চারণ করতে হয়েছে যে দাঁত পড়ে যাবার জোগাড়।

বিয়ের রাতটা বেন্ডারদের বাড়িতেই কাটাল বেনন। ইব্রাহিমকে নতুন [illegible] তুলে দেয়া হবে আগামী সপ্তাহের মধ্যে। অতদিন অপেক্ষা করল না

বেনন। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রকি পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল ও।

ছোট্ট একটা শহরে যাচ্ছে। শহরটার নাম সানরাইজ ভ্যালি টাউন। ওখানে হয়তো আজও ওর জন্যেই অপেক্ষা করে আছে মিষ্টি একটা মেয়ে। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই শহরে পৌঁছে যাবে ও। দেখা যাক কি আছে ওর কপালে।

তবে আজ আর নয়। সে অন্য এক কাহিনী।

***

সীমান্তে সাবধান

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

এক

ঘরের দু'প্রান্তে মুখোমুখি দু'জন লোক। একজন দাঁড়িয়ে আছে জানালার সামনে, আরেকজন বসে আছে কাগজ আর ফাইলে উপচে পড়া একটা বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পেছনে। শিকাগোতে এবার গরম পড়েছে খুব। এমনকি ঘরের মধ্যেও দরদর করে ঘামছে তারা।

রাস্তায় লোক চলাচল কম। যারা বাধ্য হয়ে বেরিয়েছে, ধীরেসুস্থে হাঁটছে তারা। খুরের ক্লপ-ক্লপ আওয়াজ তুলে রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে ঘোড়া। ওগুলো যেসব ওয়্যাগন টানছে সেগুলোর চাকা থেকে ধুলোর কণা ঝরে ঝরে পড়ছে। কুকুরগুলো দোকানপাটের ফলসফ্রন্টের ছায়ায় বসে জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে।

জানালার সামনে দাঁড়ানো লোকটার বয়স ষাটের কাছাকাছি। লম্বা দেহ। শক্তপোক্ত গড়ন। সন্দেহ নেই যৌবনে চমৎকার দেহের মালিক ছিল। কিন্তু এখন কোমরের কাছটায় চর্বি জমছে। দেখা দিচ্ছে জোড়া থুতনি। কালো চুলগুলোয় পাক ধরেছে। কি এক অজানা আনন্দে উজ্জীবিত হয়ে আছে মানুষটা।

বাতাস ঢুকবে এই আশায় জানালাটা আরও একটু ফাঁক করে দিল সে। ঘরটা মোটেও সাধারণ কোন অফিস ঘরের মতো নয়। চার দেয়াল ছেয়ে আছে ফ্রেমে বাঁধানো ছবিতে। মস্ত ঘর। তিরিশ বাই পঁচিশ ফিট।

টেবিলের পেছনের দেয়ালও ছবিতে ভরা। তবে এগুলো ফ্রেমে বাঁধানো নয়। সবগুলো ওয়ান্টেড পোস্টার। কোনটা খুনীর, কোনটা ট্রেন ডাকাতের, কোনটা বা ঘোড়া চোর আর আউট-ল বা রাসলারদের। ছবির নিচে লেখা রয়েছে কে কি অপরাধ করেছে, কার জন্যে বাউন্টি মানি কত।

ওগুলোর মধ্যে একটা পোস্টারে লেখা রয়েছে:

জীবিত বা মৃত, জেসি জেমসকে ধরে আনতে পারলে পঁচিশ হাজার ডলার পুরস্কার।

ফ্র্যাঙ্ক জেমসের জন্যে পনেরো হাজার। এছাড়া জেমস দলের যে কাউকে ধরে আনতে পারলে পুরস্কারের পরিমাণ পাঁচ হাজার ডলার।

পুরস্কার ঘোষণা করেছে সেন্ট লুই মিডল্যান্ড রেল রোড। নোটিশটা হলদে হয়ে গেছে। ছিঁড়ে মলিন হয়ে গেছে কাগজের কোনাগুলো।

জেসি জেমসের পোস্টার ঘিরে আছে আরও বেশকিছু পোস্টার। কোনটায় ছবি আছে, আবার কোনটায় শুধুই চেহারার বর্ণনা। তবে সবগুলো পোস্টারের

ওপরে একই কথা লেখা আছে : পিঙ্কারটন্স ন্যাশনাল ডিটেকটিভ এজেন্সি। আর টেবিলের পেছনে যে লোকটা বসে আছে সে হচ্ছে উইলিয়াম এ. পিঙ্কারটন, শিকাগোতে এই বিখ্যাত গোয়েন্দা এজেন্সিটির ওয়েস্টার্ন ডিভিশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

বিরাটাকায় লোক সে। চুলের রং কুচকুচে কালো। চেহারায় ভদ্রতার ছাপ। টুথব্রাশের মতো ভ্রূর নিচে ধূসর রঙের চোখ। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। ছোট করে ছাঁটা গোঁফজোড়া বাঁকা ঠোঁটের সঙ্গে মানিয়ে গেছে। এই মুহূর্তে দু'ঠোঁট শক্ত করে চেপে রেখেছে সে। চেহারায় ফুটে আছে দুশ্চিন্তা। কুঁচকে আছে ভ্রূ।

এতক্ষণ চেপে রাখা দম ফোঁস করে ফেলল সে। তারপর বলল, 'তোমার বোঝা উচিত কি করতে যাচ্ছ তুমি। আমি কিন্তু মনে করি কাজটা বোকামি হবে। এক লক্ষ ডলার! কেউ টের পেলে রক্ষে থাকবে না।'

কথায় গুরুত্ব না দেয়ার ভঙ্গিতে শ্রাগ করল মিড বাসটিয়ান। 'কেউ টের পাবে না। যাই হোক, টাকাগুলো আমার। আমি যদি ঝুঁকি নিতে চাই, সেটা আমার ব্যাপার।'

'কিন্তু ঝুঁকি নেয়ার কোন প্রয়োজন তো নেই! এখানেই তো তোমার সঙ্গে আমার মতবিরোধ। তোমার শিকাগোর ব্যাঙ্ক থেকেই টাকাটা টুসনে ট্রান্সফার করে দাও, সেটা অনেক বেশি নিরাপদ হবে।'

'নিরাপদ!' হেসে উঠল বাসটিয়ান হাত নেড়ে ওয়ান্টেড নোটিশগুলো দেখাল। 'কি বললে তুমি – নিরাপদ? তাহলে এগুলো কি? জেসি জেমস এখনও মুক্ত, ছেড়েই দিলাম ইয়ংগার ব্রাদার্সের কথা; এরা ব্যাঙ্ক লুট করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেনি বলতে চাও? লোগান কান্ট্রির রাসেলভিলের ব্যাঙ্কটা লুট হওয়ার পরপরই সমস্ত ব্যাঙ্কের ওপর থেকে আমার আস্থা উঠে গেছে। নেহায়েত ঠেকায় না পড়লে আমি আর ওমুখো হচ্ছি না।'

'বুঝলাম।' হাল ছেড়ে দিল পিঙ্কারটন। যুক্তিতে হেরে যাচ্ছে বলে রেগে উঠছে নিজের ওপর। 'তোমাকে আর বলতে হবে না। আমি জানি, পশ্চিমে কখনও অপরাধের মাত্রা এরকম বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যায়নি। দু'জন এজেন্টকে হারিয়েছি আমরা গত একমাসে। জিম ম্যাকলিল্যান্ড আর ফ্র্যাঙ্ক ড্রুরি। ড্রুরি মারা গেছে কোল ইয়ংগারের গুলিতে। তবু আমি বলব ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ডলার ট্রান্সফার করাই তোমার উচিত হবে।'

পাত্তা দিল না বাসটিয়ান। বলল, 'ফ্র্যাঙ্ককে আমি অনেক দিন ধরে চিনতাম। ভাল লোক ছিল।'

'আমার কথাটা ভেবে দেখো, মিড,' শেষ চেষ্টা হিসেবে বলল পিঙ্কারটন। 'আউট-লরা যদি টের পায় এত টাকা নিয়ে তুমি টুসন যাচ্ছ তাহলে অ্যারিজোনার একজন আউট-লও বাদ যাবে না, ওরা নেকড়ের মতো পিছু নেবে তোমার।'

'আমি মায়ের দুধ খাওয়া ছোট্ট খোকা নই, উইল,' জবাবে বলল মিড। 'জীবনের প্রায় ষাট বছর পেছনে ফেলে এসেছি, নিজের দিকে কিভাবে খেয়াল

রাখতে হয় সেটা আমার ভালই জানা আছে। ব্যাঙ্কের বদলে আমার কাছেই ডলারগুলো বেশি নিরাপদে থাকবে।'

'আমি আশা করছি তাই যেন হয়। বুঝতে পারছি তোমাকে প্রভাবিত করা আমার কর্ম নয়। কিন্তু একটা কথা বলো তো, এতদিন পরে হঠাৎ করে ব্যবসা বেচে দিয়ে টুসনে ফিরে যাচ্ছ কেন তুমি?'

'তোমাকে তো আগেও বলেছি, আমি আবার মাইনিং করতে চাই।' হাসল বাসটিয়ান। 'টুসনে অনেক টাকা পড়ে আছে, উইল। এতই, যে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। টাকা জমিয়েছি আমি খনিটা আবার চালু করব বলে। তাই করব আমি। লোকে মনে করে ওই খনিতে আর রূপা নেই। কিন্তু আমি জানি এখনও এমন অনেক স্তর আছে যেখানে মানুষের হাত পড়েনি। ওখানে রূপা আছে, উইল। কয়েক মিলিয়ন ডলারের রূপা। আমার ভাই নেডও জানে সে-কথা। এতদিন টাকার অভাবে খনির কাজে হাত দিতে পারিনি। এবার আর দেরি করব না।'

'বিশ বছর অনেক সময়, মিড,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল পিঙ্কারটন। 'তুমি জানছ কিভাবে যে অন্য কেউ এতদিনে খনিতে খনন করেনি? হয়তো গিয়ে দেখবে সত্যি সত্যিই রূপা শেষ হয়ে গেছে।'

'কেউ খনন করলে নেড আমাকে চিঠিতে জানাত। একটা কথা জানো, আমি আসলে টাকাটা আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি তার কারণ কিন্তু শুধু স্বস্তি বোধ করব তা নয়।' আপনমনে হাসল মিড। 'আমি আসলে নেডকে দেখাতে চাই যে আমি কত টাকার মালিক হয়েছি। ওর চোখ আমি চড়কগাছ হতে দেখতে চাই। ও আমাকে বলেছিল শহরে এলে আমি পথের ফকিরের বেশি কিছু হতে পারব না। বলেছিল র‍্যাঞ্চে থেকে যেতে। মুখের মধ্যে এক তোড়া নোট গুঁজে দিয়ে আমি ওর ভুল ধারণা ভেঙে দেব। আমি ওকে বোঝাতে চাই ওর ধারণা ভুল ছিল।'

'ব্যাঙ্ক ড্রাফট গুঁজে দিয়ো বরং। একই তো কথা।'

'ব্যাঙ্কের কাগজের কোন মূল্য নেই নেডের কাছে। ও দেখতে চাইবে আসল ডলার। তা-ই ওকে দেখাব আমি।'

'বেশ। বুঝলাম, কিছুতেই তোমাকে ঠেকানো যাবে না।' হাসার চেষ্টা করল পিঙ্কারটন। কিছুক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'যাচ্ছ যাও, গিয়ে ওখান থেকে চিঠি লিখে জানিয়ো কেমন আছো।'

'জানাব।' কথা দিল বাসটিয়ান। বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

বাসটিয়ান চলে যাওয়ার পরও প্রায় মিনিট খানেক ভ্রূ কুঁচকে চুপ করে বসে থাকল উইলিয়াম পিঙ্কারটন। তারপর দরজা খুলে বাইরে তাকাল। এটাও একটা বড়সড় ঘর। টেবিলে বসে ঘাড় গুঁজে কাজ করছে কয়েকজন লোক। একজনকে হাতের ইশারায় ডাকল সে। লোকটা উঠে আসতে আবার গিয়ে বসল টেবিলের পেছনে।

'বসো, লুইস,' লোকটা দরজা বন্ধ করার পর বলল পিঙ্কারটন। 'তোমার

সঙ্গে জরুরী আলাপ আছে।'

টেবিলের ওধারে যে লোকটা বসল তার গড়ন পাতলা সাতলা। মাঝারী উচ্চতা। কালো রঙের চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি। ঠোঁট জোড়া এত পাতলা যে বন্ধ রাখলে একটা চিকণ রেখার মতো লাগে দেখতে। তার নাম* লুইস জে. লাল। উইলিয়াম পিঙ্কারটনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক।

লালের সামনে একটা পেটমোটা খাম তুলে ধরল পিঙ্কারটন। লাল কৌতূহল নিয়ে তাকানোয় বলল, 'সেই চিঠিটা, যেটা অ্যারিজোনার হিলা ভ্যালির র‍্যাঞ্চার, নাথানিয়েল হথর্নের কাছ থেকে এসেছে। লোকটা রাসলিঙের শিকার হয়ে প্রচুর গরু হারাচ্ছে বলে লিখেছে। সে চায় আমরা লোক পাঠাই।'

'তাতো এমুহূর্তে সম্ভব নয়,' বলল লাল। 'আমরা সবাই অ্যাসাইনমেন্টে ব্যস্ত।'

মাথা ঝাঁকাল পিঙ্কারটন। 'সেজন্যেই তোমাকে ডাকা। ভাবছি কাজটা বাইরের কাউকে দিয়ে করাব। তোমাকে ডেকেছি মতামত জানার জন্যে।'

'কার কথা ভাবছ?'

'রক বেনন। এখন শিকাগোতেই আছে লোকটা।'

'কিন্তু সে তো আউট-ল ছিল।'

'তা ঠিক,' একমত হলো পিঙ্কারটন। 'তবে এখন সে আর আউট-ল নয়। সখের গোয়েন্দাগিরিও করে লোকটা। তুমি হয়তো জানো না ওকে দিয়ে কয়েকটা কাজ করিয়েছি আমি। এখনও ব্যর্থ হয়নি সে। এখন তোমার কি মত?'

'তোমাকে যতদূর চিনি, মনস্থির করেই তারপর আমাকে ডেকেছ তুমি সিদ্ধান্ত জানাতে, কাজেই আমার আপত্তি থাকলেই বা কি,' ভ্রূ কুঁচকে বলল লাল। 'তবে আমি ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতে পারছি না। একজন প্রাক্তন আউট-লকে দিয়ে কাজ করালে এজেন্সির সুনাম নষ্ট হতে পারে।'

'ব্যাপারটা আমি ভাবিনি বলতে চাও? কিন্তু আর কোন উপায় আছে? এখানকার কাজ ফেলে রেখে তোমাদের আমি অ্যারিজোনায় পাঠাতে পারি না। তাছাড়া, আরও একটা কারণে কাউকে না কাউকে ওখানে পাঠানো দরকার। মিড বাসটিয়ান সঙ্গে করে একলক্ষ ডলার নিয়ে টুসন যাচ্ছে। এত করে বোঝালাম, কিছুতেই সে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা পাঠাবে না। ওর ওপর অলক্ষে নজর রাখার মতো লোক দরকার। আরেকটা কারণ শুনতে চাও?' লালের দিকে তাকাল পিঙ্কারটন। 'শোনো তাহলে। মন্ট্যানার গভর্নর বেননকে দিয়ে একটা কাজ করিয়েছিল বলে লিখেছে। বিপজ্জনক বাউন্টিহান্টিং। পশ্চিমের কুখ্যাত আউট-লদের ধরে আনার দায়িত্ব দিয়েছিল গভর্নর বেননকে। রে জনসন নাম নিয়ে দায়িত্বটা সুষ্ঠুভাবে পালন করেছে সে। ওকে গভর্নর বিশ্বাস করেছেন,

* পরে মিসৌরির মনগও স্প্রিংসে সে আর দু'জন ল-ম্যান ইয়ংগার ব্রাদার্সদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত দুই ভাই জিম আর জন ইয়ংগারের মুখোমুখি হয়। লড়াইতে জন ইয়ংগার মারা যায়, জিম ইয়ংগার গুরুতর আহত হয়। সেই গানফাইটে লাল খুন হয়েছিল।

আমাদের বিশ্বাস করতে বাধা কোথায়? তোমার কোন আপত্তি থাকলে এখনও বলো, আমি জানি টাকার অভাবে পশ্চিমে ফিরতে পারছে না বেনন, রাজি সে হবেই, এখন তোমার মতামত চাইছি।'

'অন্যান্য স্টেটে ওর নামে হুলিয়া আছে?'

'না। তবে সবাই ওকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে।'

'আমার মতামত আমি তোমাকে আগেই জানিয়েছি,' বলল লাল, 'বেনন যদি রাজি হয় তাহলে ওই টাকার লোভেই হবে। তুমি একটা বাঘকে খাঁচায় পুরে আটকে দাও। খাঁচার ভেতর ওটা বড় একটা বেড়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তুমি ওটাকে খাঁচা থেকে বের করে মুক্ত করে দাও, আবার ওটা স্বমূর্তি ধরবে। আমার ধারণা লোকটাকে প্রস্তাব দেয়াও মস্ত ভুল কাজ হবে।'

'তোমার সঙ্গে আলাপ করে উপকার হলো।' উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে করতে বলল চিন্তিত পিঙ্কারটন। 'তুমি এবার আসতে পারো।' মনস্থির করে ফেলেছে সে বেননকে কাজটা দেবে।

নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল লুইস জে. লাল। ব্লক বেননের মতো একটা লোককে দিয়ে কাজ করাতে চাইছে বস্ তাই অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছে সে।

দুই

অ্যারিজোনা। টুসন। বুমটাউন।

পশ্চিমে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অজস্র বুমটাউনের মধ্যে টুসন অন্যতম। মাইনিং ক্যাম্প পশ্চিমে সরে যাওয়ার পরও মরে না গিয়ে বরং দিনে দিনে বেড়ে চলেছে শহরটা অন্য শহরের সঙ্গে শুধু এখানেই পার্থক্য নেই, টুসনের সঙ্গে আরও বেশ কিছু পার্থক্য আছে মরে যাওয়া শহরগুলোর।

প্রথম দেখায় টুসনকে ভদ্র সভ্য অভিজাত শহর বলে মনে হয়। বড় রাস্তার দু'ধারে সারি দিয়ে দাঁড়ানো সেলুন আর গ্যাম্বলিং হাউজগুলো দেখে বোঝা যায় না বেআইনি কিছু ঘটতে পারে এখানে। রাস্তার একমাথায়, ধুলোময় একটা স্কয়ারে মাথা তুলে আছে কোর্টহাউজ। আরেকপ্রান্তে জেল আর শেরিফের অফিস। বিচারের কাজে অবশ্য আসে না অফিসগুলো। ওগুলোর সামনে স্রেফ ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া হয় সন্দেহভাজনকে।

টুসন একটা শহরই নয়, তারচেয়ে বেশি কিছু। টুসন হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়। আউট-ল, গানম্যান, খুনী আর ডাকাতদের আখড়া। * ফোর কর্ণার কাছাকাছি হওয়ায় আশেপাশের সবগুলো স্টেট থেকে এখানে এসে আশ্রয় নেয় অপরাধীর দল। খানিক দূরেই মেক্সিকান বর্ডার। অবাধে চলে রাসলিং।

ট্রেন থামতেই নেমে পড়ল মিড বাসটিয়ান। চারপাশে একবার নজর

কলোরাডো, ইউটা, নিউ মেক্সিকো আর অ্যারিজোনা– এই চারটি স্টেটের সঙ্গমস্থল।

ঝুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল স্টেশন থেকে। খেয়াল করল না তার পিছু নিয়েছে লম্বা, ঋজুদেহী এক আগন্তুক। শিকাগো থেকে বাসটিয়ানকে অনুসরণ করে এসেছে সে। লোকটার হাঁটাচলায় চিতার স্বাচ্ছন্দ্য। দেখতে সুদর্শন নয়, তবে পুরুষালী। দু'চোখে সর্বক্ষণ ঝিলিক মারছে প্রচ্ছন্ন কৌতুক।

ঊরুর সঙ্গে ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা হোলস্টারে সিক্সগান ঝুলিয়েছে সে। বাঁটটা অনেক দিনের ব্যবহারে মসৃণ। বোঝা যায় প্রয়োজনে ওটা ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না আগন্তুক। করাটা উচিতও হবে না। শুধু মন্ট্যানায় নয়, অ্যারিজোনাতেও রক বেনন নামটা যথেষ্ট পরিচিত।

কার্পেট ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে ধুলো ভরা রাস্তা পার হয়ে ইউনিয়ন প্যাসিফিক হোটেলের দিকে পা বাড়াল বাসটিয়ান। ওটাই শহরের সবচেয়ে বড় হোটেল।

কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল বেনন। তারপর লোকটা এতক্ষণে চাবি নিয়ে ওপরে চলে গেছে আন্দাজ করে নিয়ে সামনে বাড়ল। ওর অনুমানই ঠিক। হোটেল লবিতে মিড বাসটিয়ানকে দেখা গেল না।

হোটেলের ফয়ারটা মস্ত বড়। কার্পেটে পা দেবে যায়। অনেকগুলো সোফা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রাখা আছে ঘরে। জানালায় লাল রঙের পুরু ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে। রিসেপশন ডেস্কের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে পাতলাসাতলা টাক মাথা এক ক্লার্ক। আজ এই আগন্তুককে দেখে তার এতদিনের প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরল। লোকটা র‍্যাঞ্চার, নাকি স্পেকুলেটর বা ক্যাটল বায়ার তা সে ঠিক আঁচ করে উঠতে পারল না।

রেজিস্টারে নাম লিখতেই পড়ার জন্যে ঝুঁকে এলো সে। চেহারা দেখে বোঝা গেল হতাশ হয়েছে। জানতে চাইল, 'জি. জোন্স?'

মাথা ঝাঁকাল বেনন। 'জি'টা হচ্ছে জর্জির। পুরো নাম জর্জি জোন্স।'

'জর্জিটুকু অন্তত আসল,' বিড়বিড় করে বলল হোটেল ক্লার্ক। তারপর আগন্তুকের দিকে তাকাল। 'সারা শহর জর্জ জোন্স আর টম স্মিথে ভরে গেছে, বললে বিশ্বাস করবে না।' নামের নিচে লেখা ঠিকানাটা দেখল সে। 'তুমি তাহলে শিকাগো থেকে এসেছ, মিস্টার...জোন্স?'

'কেন, তাতে তোমার কোন আপত্তি আছে?' ক্লান্তি বোধ করছে বেনন।

'না, না, তা বলছি না; আমাকে ভুল বুঝো না,' তাড়াতাড়ি করে বলল ক্লার্ক। 'আমিও শিকাগো থেকেই এসেছি কিনা তাই...'

'চাবি?'

বোর্ড থেকে চাবি পাড়তে ঘুরে দাঁড়াল ক্লার্ক। এই সুযোগে চট করে রেজিস্টারে চোখ বুলিয়ে নিল বেনন। এগারো নম্বর ঘরে উঠেছে মিড বাসটিয়ান।

চাবিটা ওর হাতে দিল ক্লার্ক। 'বারো নম্বর রুম। সকালের নাস্তা আর রাতের খাওয়া সহ সপ্তাহে বিশ ডলার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল ও। সঙ্গে শুধু একটা ডাফল ব্যাগ এনেছে। আশা করছে এদিকের কাজ সেরে ফিরে যেতে বেশিদিন লাগবে না।

ঘরে ঢুকে চারপাশে নজর বুলিয়ে নিল। ছোট্ট ঘর। বাতাসে ধুলো আর লাই সাবানের গন্ধ। জানালাটা বন্ধ ছিল। খুলে দিল ও। ভেতরে ঢুকল গরম কিন্তু পরিষ্কার বাতাস।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে নিচে প্রধান সড়ক দেখা যায়। এই মধ্য দুপুরেও প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা। সাইডওয়াকের ধারে থামিয়ে রাখা হয়েছে বাকবোর্ড আর ওয়্যাগনগুলো। সাইডওয়াকে হাঁটছে বাড়িতে বানানো পোশাক পরা মহিলারা। গার্বেজ ক্যানে নাক ডুবিয়ে খাবার খুঁজছে কুকুরের দল। লিভারি স্টেবলের সামনে হৈ-চৈ করে খেলা করছে একদল শিশু-কিশোর।

চারধারে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। আপনমনে হাসল বেনন। বিকেলের পর থেকেই টুসনের চেহারা আমূল পাল্টে যাবে। খুলবে সেলুন আর জুয়ার আড্ডাগুলো, আসতে শুরু করবে কাউবয় আর মাতাল জুয়াড়ীর দল। একটুতেই তখন ঝগড়া বেধে যাবে। মারামারি হবে। ছুটবে গোলাগুলি।

পাশের জানালা খুলে মিড বাসটিয়ানকে উঁকি দিতে দেখল বেনন। লোকটা ভাইয়ের কাছে যাবে, না তার ভাই-ই শহরে তার কাছে আসবে, ভাবল বেনন। সিদ্ধান্তে আসতে দেরি হলো না। যত গোঁয়ার আর বোকা লোকই হোক, এক লক্ষ ডলার নিয়ে টুসন ছাড়বে না লোকটা।

ওয়াশ বেশিনে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিল ও। তারপর বিছানায় এসে বসল। পকেট থেকে বের করল একটা খাম। নাথানিয়েল হথর্ন পিঙ্কারটন ডিটেকটিভ এজেন্সিকে দিয়েছিল চিঠিটা। ভাঁজ খুলে পড়তে লাগল ও।

ফ্লাইং জে, হথর্নের র‍্যাঞ্চটা, হিলা ভ্যালির উত্তর দিকে; টুসন শহর থেকে বিশ মাইল দূরে। ভ্যালিতে আরও বেশ কয়েকটা র‍্যাঞ্চ আছে, তবে হথর্নেরটাই সবচেয়ে বড়। প্রায় ছয় হাজার গরু আছে। হিসেব করে দেখল বেনন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ওই গরুগুলোর অর্ধেকের বেশি চলে যাবে উইচিটার গরুর বাজারে। সেই হিসেবে খুব বেশি গরু রাসলিং হচ্ছে তা বলা যাবে না। তবে চিঠিতে র‍্যাঞ্চারকে খুব চিন্তিত মনে হয়েছে। কেউ বুঝতে পারছে না গায়েব হয়ে যাওয়া গরুগুলো যাচ্ছে কোথায়। মূল সমস্যাটা ধরতে পারল বেনন। এরকম চলতে থাকলে র‍্যাঞ্চাররা একে অন্যকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করবে। ফলাফল দাঁড়াবে মারাত্মক। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত রেঞ্জ ওয়ারে গড়াতে পারে।

যদিও বাসটিয়ানের ওপর নজর রাখার একটা দায়িত্ব বেননের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তবে রাসলিঙের ব্যাপারটা বেশি গুরুত্ব পাবার দাবি রাখে। কিছুটা বিরক্তই হয়ে আছে ও মিড বাসটিয়ানের ওপর। যে লোক আউট-ল আর রেনিগেডে ভরা একটা বাজে শহরে একলক্ষ ডলার নগদ নিয়ে আসতে পারে, যাই ঘটুক না কেন তার কপালে, সেটা তার প্রাপ্য।

অপেক্ষা করে বাসটিয়ান কি করে দেখবে বলে সিদ্ধান্ত নিল বেনন। লোকটা যদি টাকা সহ শহর ছাড়ে তাহলে পিছু নেবে ও। চোখের আড়ালে থাকাটা কোন সমস্যা হবে না। ট্রেইল ওখানে আঁকাবাঁকা, ওক গাছ আর জুনিপার ঝোপঝাড়ে ভরা। প্রয়োজনে মিডকে পেছন থেকে সাহায্য করতে

পারবে। তবে আর কেউ যদি লোকটাকে অনুসরণ করে, এবং দক্ষ ট্র্যাকার হয়, তাহলে কি ঘটবে বলা যায় না।

বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে এক ঘণ্টা পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিল ও। পাশের ঘর থেকে শব্দ পাবার আশায় কান খাড়া রাখল। কোন আওয়াজ না পেয়ে বুঝল বাসটিয়ানও বিশ্রাম নিচ্ছে।

বাইরের শব্দ বদলে যেতে শুরু করেছে। ঘুম ভাঙছে শহরের। রাস্তায় ঘোড়ার খুর আর ওয়্যাগনের আওয়াজ বেড়ে গেছে। সাইডওয়াক থেকে চেঁচিয়ে পরস্পরের কুশল জানতে চাইছে পরিচিতরা। বাচ্চাদের গলা আর পাওয়া যাচ্ছে না। বিকেলের পর বাচ্চা আর ভদ্র মহিলাদের টুসনের রাস্তায় বেরনো নিষেধ।

বিছানা ছেড়ে কাপড় পরে নিয়ে করিডরে বেরল বেনন। ওই একই সময়ে খুলে গেল পাশের কামরার দরজা। দরজায় তালা দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল বাসটিয়ান। যেভাবে লোকটা দরজার তালা দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে দেখল তাতেই বেনন বুঝল ঘরের ভেতর কার্পেট ব্যাগেই এখনও আছে টাকাগুলো।

লোকটার পেছন পেছন ফয়ার হয়ে হোটেলের ডাইনিং রূমে প্রবেশ করল ও। ঘরের অর্ধেকটা এরইমধ্যে ভরে গেছে। দু'তিনজন ওয়েইটার অনিচ্ছুক চেহারায় টেবিলে টেবিলে ঘুরে অর্ডার নিচ্ছে।

পেছন দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা টেবিলে বসল বাসটিয়ান। ওখান থেকে দরজাটা স্পষ্ট দেখা যায়। পাশের টেবিলটাই দখল করল বেনন।

যেভাবে লোকটা দরজার দিকে তাকিয়ে আছে, বোঝা যাচ্ছে কাউকে আশা করছে সে। সম্ভবত তার ভাই আসবে।

খাওয়ায় মন দিল বেনন। সাদামাঠা খাবার, কিন্তু দিয়েছে প্রচুর। খাওয়ার ফাঁকে আরাম করে বসে চারপাশে নজর বোলাল ও। কিছুই ওর চোখ এড়াচ্ছে না। প্রতিবারই যখন কেউ ওর দিকে তাকাচ্ছে, ঘাড়ের কাছটা শিরশির করে উঠছে ওর। কেউ ওকে রক বেনন বলে চিনে ফেলল কিনা ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছে। ইদানীং আরেকটা দুশ্চিন্তা এসে ভর করেছে কাঁধে। মাঝখানে কিছুদিন গভর্নরের অনুরোধে বাউন্টিহান্টিঙের কাজ করেছিল ও। সেই পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে টুসনে বিরাট বিপদে পড়ে যাবে ও। সবকজন আউট-লর চক্ষুশূলে পরিণত হবে। ব্যাহত হবে বর্তমান কাজ। তেমনটি যেন না ঘটে তা মনেপ্রাণে চাইছে ও।

খাওয়া প্রায় শেষের পথে, অধৈর্য হয়ে উঠেছে বাসটিয়ান, এমন সময় খুলে গেল ফয়ার থেকে ডাইনিং রূমে ঢোকার দরজা। ঘরে ঢুকল বিরাটকায় এক লোক। প্রথম দেখাতেই বেনন বুঝল এই লোক মিড বাসটিয়ানের ভাই নেড বাসটিয়ান না হয়ে যায় না। সমান আকার আকৃতি, তবে এলোকের গায়ে চর্বি নেই; পেটা দেহ। একটা ডোরাকাটা ট্রাউজার পরেছে, শেষ প্রান্ত গুঁজে দিয়েছে পুরানো মাইনিং বুটের ভেতর।

ভাইকে টেবিলে বসে থাকতে দেখে চওড়া হাসি ফুটল তার মুখে। দু'হাত দু'দিকে বাড়িয়ে এগিয়ে এলো সে। হাঁক ছাড়ল, 'মিড, শেষ পর্যন্ত এলে

তাহলে তুমি! ভাবতেই পারিনি এতগুলো বছর পর তোমার কুৎসিত চেহারা আবার দেখতে পাব।'

দু'ভাই জড়িয়ে ধরল পরস্পরকে। জোরে জোরে কথা বলছে, খেয়ালই নেই যে ঘরের অনেকেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ বেনন লক্ষ করল নেডের পেছনে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে; চোখে অনুসন্ধিৎসা নিয়ে দেখছে মিড বাসটিয়ানকে। মেয়েটার ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল নেড। হাত ধরে টেনে সামনে এনে বলল, 'এই যে ন্যান্সি। মনে পড়ে ওকে তোমার? শেষ বার যখন দেখেছিলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় জাঙ্গিয়া ভেজাত ও।'

মেয়েটার মুখ থেকে ক্ষণিকের জন্যে রক্ত সরে যেতে দেখল বেনন। ঘরের অনেকেই কথাটা শুনেছে বলে লজ্জা পেয়েছে।

ভাতিজিকে ভালুকের মতো জড়িয়ে ধরল মিড। 'ন্যান্স! ছোট্ট ন্যান্সি! এত বড় হয়ে গেছ তুমি! কত হলো বয়স? নিশ্চয়ই বিশ?'

'বাইশ,' গর্বের সঙ্গে বলল নেড। 'একেবারে ওর মায়ের মতো সুন্দরী হয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। ভাগ্যিস তোমার চেহারা পায়নি।' হাসল মিড। বলল, 'এত কম বয়সে অ্যালিসের মরে যাওয়াটা খুব দুঃখজনক।' পরমুহূর্তে প্রসঙ্গ পাল্টাল সে। 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, খুবই সুন্দরী হয়েছে আমাদের ন্যান্সি।'

দ্বিমত পোষণ করতে পারল না বেনন। মেয়েটা অত্যন্ত রূপসী। হালকা-পাতলা দেহের বাঁকগুলো নিটোল, রমণীয়। বাড়িতে তৈরি পোশাক ঠেলে বেরিয়ে আছে সুটৌল ভরাট স্তনের খাঁজ। চমৎকার চেহারা, পান পাতা আকৃতির। ঠোঁট দুটো কমলার কোয়ার মতো। মুখভঙ্গিতে ক্ষীণ বিদ্রূপাত্মক একটা ভাব চেহারাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

'এখনও তোমার বিয়ে হয়নি কেন, ইয়ং লেডি?' ভাতিজিকে ছেড়ে দিয়ে জানতে চাইল মিড। 'দেশে কি উপযুক্ত ছেলের আকাল পড়ে গেল নাকি!'

জবাবটা দিল ন্যান্সির বাবা। 'দোষ ছেলেদের না। দোষ ন্যান্সির। ও শপথ করেছে পুবে যেতে না পারলে বিয়ে করবে না।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ভাতিজির দিকে তাকাল মিড। 'পুব? তারমানে শিকাগো?'

'শিকাগো বা নিউ ইয়র্ক।' শ্রাগ করল ন্যান্সি। 'কোথায় সেটা আমি কেয়ার করি না। আমি শুধু জানি এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাকে। কী এমন আছে এখানে ঘাসজমি আর মরুভূমি ছাড়া? সারা জীবন ওসব না দেখতে হলে বেঁচে যাই আমি। আর কাউবয়… অসহ্য!'

'কি যে মেয়েটার মাথায় ঢুকেছে বুঝি না আমি,' গম্ভীর চেহারায় বলল নেড। 'ওর মা এই জায়গাটা পছন্দ করত, সে কারণেই এখানে বসতি করেছিলাম আমি।'

'সত্যি পছন্দ করত কি করত না তা বোঝার আগেই মারা গেছে মা,' বলল ন্যান্সি। 'মাকে এখানে থাকতে হয়েছিল মাত্র কয়েক বছর, আর আমি এখানে কাটিয়েছি বাইশটা বছর। প্রত্যেকটা দিন আমার ঘৃণার পরিমাণ বেড়েছে। কি আছে এখানে একজন মহিলার জন্যে? বিয়ে করো, ভাঙা একটা

কুঁড়েতে বাস করো, বছর বছর সন্তান বিয়াও, তারপর একদিন কপর্দকহীন অবস্থায় বুড়ি হয়ে মরে যাও। এর চেয়ে আত্মহত্যা করাও ভাল।'

'তুমি অকৃতজ্ঞের মতো কথা বলছ,' রেগে উঠে বলল নেড। 'দেশের অর্ধেক যুবক তোমার পাণিপ্রার্থী! এমনকি নাথানিয়েল হথর্নের মতো বড় র‍্যাঞ্চারও তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে। কিসের অভাব থাকত তোমার তাকে বিয়ে করলে?'

'ওর বয়স পঞ্চাশের একদিনও কম নয়!'

'তাহলে লেযি এ-র জনি উইলিয়ামস? চমৎকার ছেলে। ওর মতো কাউকে পেতে হলে সাধনা করতে হয়। সে-ও তো কয়েক মাস হলো তোমার পেছনে ঘুরছে।'

'কত বেতন পায় সে?' ভ্রূ কুঁচকে গেল ন্যান্সির। 'মাসে চল্লিশ ডলার। কি দিতে পারবে সে আমাকে? কিচ্ছু না। একটা ওয়েডিং রিং কেনার সামর্থ্যও নেই ওর। আমি তো বলেই দিয়েছি যেলোক আমাকে পুবে নিয়ে যেতে পারবে তাকেই আমি বিয়ে করব।'

'তোমার মধ্যে শহর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা কাজ করছে, ন্যান্সি,' এতক্ষণে মুখ খুলল মিড। 'শহর মানেই সুখের স্বর্গ নয়। আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো, বিশটা বছর আমি ওই ধুলো ময়লা আর ধোঁয়ার মাঝে কাটিয়ে এসেছি। তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না এখানে ফিরে আসতে পেরে কতখানি ভাল লাগছে আমার।'

'আমারও হয়তো তেমন লাগবে – আজ হতে তিরিশ বছর পর,' বলল ন্যান্সি একগুঁয়েমির সুরে। চাচার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ করেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে জানতে চাইল, 'আচ্ছা, আঙ্কেল মিড, বাবার মুখে শুনলাম তুমি নাকি বড়লোক হয়ে গেছ?'

'তোমার বাবা ঠিকই বলেছে, আমি এখন একলক্ষ ডলারের মালিক।'

আস্তে বল, ব্যাটা; মনে মনে লোকটার পিণ্ডি চটকাল বেনন।

'গলা নামাও, মিড, তুমি কি চাইছ নাকি শহরের সবাই জেনে যাক?' চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিচু গলায় ভাইকে সাবধান করল নেড।

'জানলে অসুবিধে কি? একবার আমি খনির কাজ আরম্ভ করলে এমনিতেই ওরা জানতে পারবে।'

'খনি?' বিস্মিত হয়ে ভাইয়ের কথার প্রতিধ্বনি তুলল নেড। 'তুমি কি বলতে চাইছ খনিতে কাজ করার ভূত তোমার মাথা থেকে এখনও যায়নি?'

হাসল মিড। 'আগামী কয়েক বছরে মিলিয়োনেয়ার হয়ে যাব আমরা।'

গম্ভীর হয়ে গেল নেডের চেহারা। 'কচু হব! তুমি ভাল করেই জানো ওই খনিতে আর যাই হোক সের খানেকের বেশি রূপা নেই।'

'তোমাকে আমি বারবার বলেছি তোমার ধারণা ভুল,' বলল মিড। 'এখনও কয়েক মিলিয়ন ডলারের রূপা পড়ে আছে খনিটাতে। তোমার কি ধারণা এমনি এমনি আমি এতগুলো বছর টাকা জমিয়ে এখানে ফিরে এসেছি? না, আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। খনিতে আবার কাজ শুরু করব আমি।'

'সেক্ষেত্রে তুমি তোমার টাকার অপচয় করবে। আমি অস্বীকার করছি না, সামান্য কিছু রূপা এখনও রয়ে গেছে ওখানে; তবে তা এতই কম যে নতুন করে যন্ত্রপাতি কিনে খনন করে পোষাবে না।'

'এখানে আর কথা নয়।' সামনে বাড়ল মিড। হাসছে। 'ঘরে চলো, দেখাচ্ছি তোমাদের, কত টাকা সঙ্গে করে এনেছি।'

থমকে গেল নেড। তারপর অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাইছ না যে অত নগদ টাকা নিয়ে তুমি এখানে এসেছ?'

হাসি আরও চওড়া হলো মিডের। বলল, 'ঠিকই ধরেছ তুমি। মনে আছে, একদিন বলেছিলাম টাকা আমি তোমার মুখে ঠুঁসে দিয়ে দেখাব? ঘরে চলো, দেখবে এক লক্ষ ডলার সামনে থেকে দেখতে কেমন লাগে।'

'কিন্তু, মিড...'

'জানি, জানি,' ভাইকে থামিয়ে দিল মিড। 'টাকা নিরাপদেই আছে। তোমাকে ও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

'তুমি কিছুই জানো না,' বলল নেড। 'টুসনের কী খবর রাখো তুমি? শহরটা ভরে গেছে খুনে ডাকাতে। সোনা বাঁধানো দাঁতের জন্যেও মানুষ খুন করতে বাধে না ওদের।'

'সাহস থাকলে চেষ্টা করেই দেখুক। আমি তৈরি।' চারপাশে তাকাল মিড। এই প্রথম পাশের টেবিলে বসা বেননকে খেয়াল করল। মুহূর্তের জন্যে চোখে খেলে গেল সন্দেহের ছায়া। বোধহয় বুঝতে পারল বেশি কথা বলে ফেলছে সে।

নেডের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'চলো, ওপরে চলো, আমার ঘরে গিয়ে আলাপ হবে। অনেক কথা জমে আছে, কিছুই তোমাকে বলা হয়ে ওঠেনি।'

ভ্রূ কুঁচকে ভাইয়ের দিকে তাকাল নেড। একটু সন্দেহের সঙ্গে বলল, 'তুমি আমাদের সঙ্গে র‍্যাঞ্চে আসছ, আসছ না, মিড?'

'হয়তো আসব, সপ্তাহ খানেকের মধ্যে।' শ্রাগ করল মিড। তারপর আন্তরিক স্বরে বলল, 'তোমরা আমার সঙ্গে এই হোটেলে থাকবে তো, তাই না, নেড? আমি কিন্তু তোমাদের যেতে দেব না। এত দিন পর তোমাদের পেয়েছি, গল্প করব না? র‍্যাঞ্চে নিশ্চয়ই দেখে রাখার মতো লোক রেখে এসেছ?'

'আমরা থাকার মতো কাপড়চোপড় নিয়ে আসিনি। তাছাড়া হোটেল ভাড়ার টাকাও আনিনি।'

'ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। তোমরা আমার অতিথি। আর পোশাক কিনে নিলেই চলবে। শহরে কি দোকানের অভাব আছে?' ভাতিজির হাত ধরে টানল মিড।

থাকবে না, মানা করতে গিয়েও মেয়ের চোখে চোখ পড়তেই থমকে গেল নেড। ন্যান্সির চোখে নীরব অনুরোধ; শহর ছেড়ে এখনই চলে যেতে চাইছে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তিনজন।

তিন

সূর্যটা ডুবে গেছে, সন্ধে হয়ে গেছে, আঁধার নামছে পশ্চিমের প্রেয়ারিতে, এমন সময় ইউনিয়ন প্যাসিফিক হোটেল থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এলো রক বেনন।

দুপুরের প্রশান্তি শহর ছেড়ে বিদায় নিয়েছে অনেকক্ষণ হলো। প্রতি মুহূর্তে বাইরে থেকে লোক আসছে, শহরে বাড়ছে হৈ-হুল্লোড়ের মাত্রা। জ্বলে উঠছে সেলুনের আলোগুলো। খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছে উঁচু গলার হাসি, হাল্কা রসিকতা আর ঝগড়ার শব্দ। হুঙ্কার বা আর্তচিৎকার মাঝে মধ্যেই স্বাভাবিক কোলাহলে ছন্দপতন ঘটাচ্ছে।

আগামীকালের আগে নাথানিয়েল হথর্নের সঙ্গে দেখা করবে না বলে ঠিক করেছে বেনন। পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে। তাছাড়া, এতদিনের গোয়েন্দাগিরির অভিজ্ঞতায় এটুকু বুঝেছে যে বাইরের লোকের কাছ থেকে গোটা চিত্রটা সম্বন্ধে খবর বের করা অনেক সহজ হয়। অন্যের ব্যাপারে, যত গোপনীয়ই হোক, মুখ বন্ধ রাখতে চায় না মানুষ। প্রয়োজন বোধ করে না। কাজেই রাসলিং সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে লোকের সঙ্গে মিশতে হবে ওকে। চেষ্টা করতে হবে যাতে তথ্য বের করতে পারে।

সবচেয়ে জোরাল শব্দ আসছে যে সেলুনটা থেকে, সেটা বেছে নিয়ে ঢুকে পড়ল বেনন। দম বন্ধ হয়ে এলো ওর। বাতাসে ভারী কুয়াশার মতো ঘন ধোঁয়ার স্তর। সস্তা তামাকের গন্ধে শ্বাস নেয়া যায় না।

এত বড় ঘর জীবনে আর কখনও দেখেনি ও। ঘরের শেষ প্রান্তে একটা স্টেজ। দরজার অপর পাশের পুরোটা দেয়াল জুড়ে বার কাউন্টার। ঘরের বাকি অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলা রয়েছে চেয়ার-টেবিল। ওগুলো এতই গায়ে গা লাগানো যে মাঝখান দিয়ে হেঁটে বারে পৌঁছতে বেশ কষ্টই করতে হয়।

ঘরের আরেক প্রান্তে বিরাট একটা রুলেত হুইল দেখল ও। তার পাশেই সবুজ ভেলভেটে ওপরটা মোড়ানো একটা টেবিল। হুইলটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অজস্র মানুষ। প্রত্যেকের চোখ ক্রুপিয়ের দিকে। লোকটা রুলেত হুইল ঘোরাচ্ছে আর লোভীর মতো সংগ্রহ করছে মানুষের বাড়িয়ে দেয়া চিপস। হুইলটায় জোচ্চুরির ব্যবস্থা আছে কিনা একবার ভাবল বেনন। বেশিরভাগেই চুরির বন্দবস্ত থাকে। পায়ের তলায় একটা বিশেষ বোর্ডে চাপ দিয়ে সেক্ষেত্রে হুইলটা নিয়ন্ত্রণ করে ক্রুপিয়ে।

সেলুনের ভেতরের আওয়াজ কানের পর্দা ফাটিয়ে দেয়ার মতো। এক কোণে একজন লোক একটা বেসুরো পিয়ানো বাজাচ্ছে। তার পিঠ ঘেঁষে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে একটা মেয়ে। মাঝে মধ্যেই কী বোর্ড থেকে হাত তুলে মেয়েটার উরু হাতিয়ে নিচ্ছে লোকটা।

টেবিলগুলোর প্রায় প্রত্যেকটাতেই বসে আছে একটা করে মেয়ে। কখনও

তারা কাস্টোমারের কোলে গিয়ে বসছে, কখনও বা দাড়ি গোঁফ ভরা মুখে হাত বুলিয়ে আদর জানাচ্ছে তাদের। মেয়েগুলোর মুখে মেকআপের কড়া প্রলেপ। হাসছে, কিন্তু হাসিতে প্রাণ নেই। চোখ জোড়া আরও পয়সাওয়ালা খদ্দের খুঁজতে ব্যস্ত।

ঠেলেঠুলে পথ করে নিয়ে বারে এসে দাঁড়াল বেনন। মদ খাওয়ার ইচ্ছে নেই, তবু কিছু না নিয়ে বারে দাঁড়ালে লোকের সন্দেহ হতে পারে তাই একটা বিয়ার নিল সে। গ্লাসটা হাতে নিয়ে চারপাশে নজর বুলিয়ে দেখল। কান খাড়া রেখেছে, রাসলিং সম্বন্ধে কেউ কোন কথা বলে কিনা জানতে উন্মুখ। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও ওর কপাল খুলল না। রাসলিং নিয়ে কথা বলল না কেউ।

হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল বেনন। রুলেত টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়ে চোখে কৌতূহল নিয়ে ওকে দেখছে। মেয়েটার একটা হাত পাশের লোকটার কাঁধ জড়িয়ে আছে। বয়স আন্দাজ সাতাশ-আটাশ হবে। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু লম্বা। সোনালী চুল। কাটা চেহারা। এক সময় শরীরটা দেখার মতো ছিল, কিন্তু এখন একটু মুটিয়ে গেছে। টকটকে লাল ভেলভেটের গাউন পরে আছে। সামনের দিকটা এতই বড় করে কাটা যে উদ্ধত স্তনের প্রায় পুরোটাই দেখা যাচ্ছে।

বেননের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। আমন্ত্রণ আছে সেই হাসিতে। জবাবে নির্বিকার চেহারায় তাকিয়ে থাকল বেনন। দেখল মেয়েটার হাসিটা ম্লান হতে হতে মিলিয়ে গেল। বেনন স্বপ্নেও ভাবেনি যে মেয়েটা এগিয়ে আসবে। কিন্তু এলো। সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, স্ট্রেঞ্জার, মেয়েমানুষ পছন্দ করো না তুমি?'

'অবশ্যই করি, ম্যাম,' থতমত খেয়ে বলল বেনন।

'তাহলে ওরকম মরার মতো চেয়ে থাকা কেন?'

চোখের কোণে বিশালদেহী একজন লোককে কড়া চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখল বেনন। লোকটা একটা টেবিলে বসে আছে। ওই টেবিল থেকেই মেয়েটা উঠে এসেছে। ঝামেলার গন্ধ পেল বেনন।

'ও কি তোমাকে অপমান করছে নাকি, বেলা?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল সে।

হেসে মাথা নাড়ল বেলা। 'না, রেনো, নিশ্চিন্তে থাকো তুমি।' তাকাল বেননের দিকে। 'তুমি তো এখানে নতুন এসেছ; তাই না? তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। ইচ্ছে করলে চমৎকার খানিকটা সময় তুমি কাটাতে পারো আমার সঙ্গে।'

'অন্য কোন সময়ে, ম্যাম।' মেয়েছেলেটাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে বেনন। 'এখন আমি একজনকে খুঁজছি।'

'পুরুষ না মেয়ে?'

'পুরুষ।'

'তাহলে ওখানে আছে হয়তো।' দোতলা নির্দেশ করল মেয়েটা। 'মজা

লুটছে। চলো, তুমি আর আমিও যাই।'

'ও বলেছে এখানেই দেখা করবে আমার সঙ্গে।'

আরেকটু কাছে সরে বেননের গা ঘেঁষে দাঁড়াল বেলা। কড়া পারফিউম মেখেছে। বলল, 'চলোই না, অত লজ্জা পাবার কি আছে। দেখবে সময়টা দারুণ কাটবে তোমার। পয়সার জন্যে ভাবছ তো? নেই বুঝি? লাগবে না। বাজি ধরতে পারি যে কোন মেয়েকে তৃপ্তি দিতে পারবে তুমি।'

পরিস্থিতিটা বেননের জন্যে খুব অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াল। এখন এই মেয়েকে মানা করলে সেটা সরাসরি অপমানের পর্যায়ে চলে যায়। সেক্ষেত্রে মেয়েটার সঙ্গীর সঙ্গে লড়তে হতে পারে ওকে। মেয়েটার হোঁৎকা সঙ্গী সম্ভবত দালাল।

'আমি আসলে...' কথা শুরু করেও থেমে গেল বেনন।

ওর মনে হলো স্বয়ং ঈশ্বর ওকে বাঁচিয়ে দিলেন। ঘরের এক কোনায় প্রচণ্ড শব্দ করে উল্টে পড়ল একটা টেবিল। গ্লাসগুলো মেঝেতে পড়ে চুরচুর হয়ে ভাঙল। তীক্ষ্ণ স্বরে আর্তচিৎকার করে উঠল একটা মেয়ে। যে দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে ঝগড়া লেগেছে তারা উঠে দাঁড়িয়ে চড়া গলায় পরস্পরকে দুষছে। দ্রুত জুটে গেল দু'পক্ষের সমর্থক।

খেলোয়াড় দু'জনই আধ-মাতাল। বেননের কাছের জন অস্ত্র বের করে গুলি করে বসল। ভেঙে গেল বার কাউন্টারের পেছনের মস্ত আয়না। কাউন্টারের পেছনে ঝট করে বসে পড়ল বারটেন্ডার। তার হাতের ধাক্কায় উল্টে পড়ল কয়েকটা হুইস্কির বোতল।

দ্বিতীয় লোকটাও গুলি ছুঁড়ল। তার গুলি লাগল গিয়ে সামনে দাঁড়ানো এক দর্শকের কাঁধে। লোকটা ছিটকে পড়ল দেয়ালের গায়ে। ব্যস, হুলস্থুল লেগে গেল সারা সেলুন জুড়ে। সবার হুড়োহুড়িতে ভেঙে পড়ল আরও কয়েকটা টেবিল। সমানে গুলি চালাচ্ছে দুই প্রতিপক্ষ।

বেননের সামনে দাঁড়ানো বেলা কাউন্টার থেকে একটা হুইস্কির বোতল তুলে নিয়ে গায়ের জোরে বসিয়ে দিল কাছের জুয়াড়ীর মাথায়। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল লোকটা। মেয়েদের চিৎকারের ফাঁকে শোনা যাচ্ছে লোকজনের সন্তুষ্টিসূচক আওয়াজ। বুটের আঘাত পড়ছে মাটিতে পড়ে যাওয়া মানুষজনের পেটে আর পিঠে। থ্যাপ থ্যাপ শব্দে ঘুসি লাগছে চোয়ালে।

দু'জন লোক ভালুকের মতো পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে। তাদের চাপে বারের সঙ্গে সেঁটে গেল বেনন। পড়ে যাচ্ছিল, সামলে নিল কোন মতে। তারপরই একজনের চোয়াল সই করে ঘুসি মারল। খট করে আওয়াজ হলো চোয়ালের হাড় সরে যাওয়ার। নাকটাও গেছে। পিছিয়ে গিয়ে দু'হাতে মুখ চেপে ধরে পড়ে গেল সে।

বাকিজনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক সেরে লড়াইরত লোকের নজর বাঁচিয়ে সুইং ডোরের দিকে এগোনোর চেষ্টা করল বেনন। অসম্ভব একটা কাজ। গোটা সেলুনে ছড়িয়ে পড়েছে লড়াই। বাতাসে উড়ছে চেয়ার। আছড়ে পড়ে ভাঙছে টেবিল। মেঝেতে পড়ে আছে মদের ভাঙা গ্লাস-বোতল আর চিপস। এই

সুযোগে মালিকের চোখ বাঁচিয়ে সঙ্গের মেয়েটাকে নিয়ে দোতল্লার দিকে রওয়ানা দিয়েছে সুযোগসন্ধানী পিয়ানোবাদক। বুদ্ধি করে লোকটাকে অনুসরণ করল বেনন। দোতলার পেছন দিক দিয়ে নিশ্চয়ই নিচে নেমে যাবার সিঁড়ি আছে।

গোলমাল পেছনে ফেলে দোতলায় উঠে এলো বেনন। নিচে হৈ-হুল্লোড়ের মাত্রা আরও বেড়েছে। গ্যালারি হয়ে দু'পাশের দরজাগুলোকে পাশ কাটিয়ে সরু একটা করিডর ধরে এগোল ও। এক ঝলকের জন্যে পিয়ানোবাদককে দেখতে পেল, একটা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। ঘরের ভেতরে চোখ পড়তেই অন্যদিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেল বেনন।

করিডরের শেষ মাথায় কয়েক ধাপ সিঁড়ি। ওগুলো বেয়ে নিচে নামতে লাগল ও। নিচে নেমে দেখল সামনে একটা বন্ধ দরজা। দরজাটা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। সেলুনের পেছনের গলিতে পৌঁছে রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া বুক ভরে টেনে নিল ও।

একটু সুস্থির হয়ে কাছের জেনারেল স্টোরে যাবে ঠিক করল বেনন। ওটাই শহরের সবচেয়ে বড়। বিকেলের পরে রেঞ্জ থেকে যারা কোনকিছু কিনতে আসে তাদের সঙ্গে স্টোরই সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করে। টুসনের জেনারেল স্টোরে প্রায় সবকিছুই পাওয়া যায়।

গুহার মতো একটা ঘরের শেষ প্রান্তে দোকানের কাউন্টার। মাঝখানে একটা বিরাট স্টোভ, এখন নিভন্ত। ওটার চারপাশে চেয়ার আর বেঞ্চিতে লোক বসার ব্যবস্থা। ঘরের বাকি জায়গা জুড়ে রয়েছে রসদপত্র। এককোণে স্তূপ হয়ে আছে স্যাডল হার্নেস আর চামড়ার ট্র্যাপিংস। আরেক কোণে পিপেতে করে রাখা হয়েছে চিনি, ময়দা, শুকনো কুল-বড়ই ইত্যাদি – ওগুলো প্রায় ঢাকা পড়েছে রংচঙে ইন্ডিয়ান ব্ল্যাঙ্কেট আর কাপড়ের বোল্টে।

ঘরের তৃতীয় কোনায় ঝাড়ু, ব্রাশ, পিক্স্, শাবল আর গোটা কয়েক স্কুইরেল মারার রাইফেল সাজিয়ে রেখেছে দোকান মালিক। কাউন্টারের ওপর রাখা হয়েছে বিভিন্ন টিনের সামগ্রী – ফ্রাইং প্যান, সস প্যান, হ্যান্ড বাউলস, কেরোসিন ল্যাম্প। গ্লাসে ঢাকা একটা শোকেসে গোলাগুলির বাক্সের পাশেই রাখা হয়েছে মাছিতে অর্ধেক খেয়ে যাওয়া ক্যান্ডি।

ঘরে লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলো। এক পলকে সবকিছু দেখে নিয়ে ভেতরে পা রাখল বেনন।

চেয়ার আর বেঞ্চিগুলো লোকজন আগেই দখল করে রেখেছে। বেশিরভাগেরই মাঝ বয়স পেরিয়ে গেছে। এদের কয়েকজন র‍্যাঞ্চার বা হোমস্টেডার; বাকিরা বয়স্ক প্রসপেক্টর, পাহাড়ে ফিরে যাবার আগে রসদ কিনতে এসেছে। এখনও ওদের আশা একদিন তারা বিরাট বড়লোক হয়ে যাবে, খুঁজে পাবে নতুন কোন স্বর্ণখনি। বাস্তববাদী লোকরা জানে তা আর হবার নয়, খিদে বা তেষ্টায় নির্জন কোন প্রান্তরে বা পাহাড়ী গুহায় মৃত্যু ঘটবে লোকগুলোর – যদি আগেই রেনিগেড বা ইন্ডিয়ানদের হাতে না মরে।

ঘরের সর্বশেষ কোনায় ব্ল্যাঙ্কেট মুড়ি দিয়ে জবুথুবু হয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে আছে দু'জন ইন্ডিয়ান। চোখ পিটপিট না করলে বোঝাই যেত না যে তারা জেগে আছে।

কোন মহিলা নেই দোকানে। টুসনের মতো শহরেও ভদ্রমহিলা আছে, এবং সেই ভদ্রমহিলারা সন্ধের পরে বাইরে ভুলেও বেরয় না। বাকি মেয়ে, যারা আসতে পারত বা এখানে উপস্থিত থাকতে পারত তারা নেই কারণ কঠোর পরিশ্রম করা র‍্যাঞ্চার আর প্রসপেক্টরদের পর্যাপ্ত টাকার অভাব আছে।

বেশ কয়েক জোড়া চোখ বেননকে অসুসরণ করল। মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল আলাপচারিতা। তারপর আবার শুরু হলো যেন কিছুই ঘটেনি। কতগুলো শার্ট বাছার ছলে লোকগুলোর কথা শুনতে লাগল বেনন।

'তাহলে মিড বাসটিয়ান ফেরত এসেছে, তাই না?' বয়স্ক র‍্যাঞ্চারদের একজন মন্তব্যের সুরে বলল। পাইপ ধরাল সে। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'শুনলাম পুরানো খনিটা নাকি আবার চালু করবে।'

খুক খুক করে কাশল একজন। 'ওই খনি চালু না করলেই ভাল করবে ও। ভূত ছাড়া আর কিছু নেই ওটার মধ্যে। নতুন করে কাজ শুরু করতে চাইলে কয়েক লাখ ডলার লাগবে।'

'টাকা হয়তো মিড নিয়েই এসেছে। শিকাগোতে নাকি চালু ব্যবসা ছিল।'

'তাহলে সেখানেই ওর থাকা উচিত ছিল। আর তা নাহলে অন্তত গরুর ব্যবসায় নামতে পারত। একটা র‍্যাঞ্চ কিনে…'

'অতটা বোকা সে নয়!' বাধা দিয়ে বলল আরেকজন। লোকটা পাতলা-সাতলা। মিডোলার্ক পাখির মতোই বুক। পুরুষ্টু গোঁফ জোড়া ঝুলে আছে প্রায় থুতনি পর্যন্ত। 'এখানে গরুর পেছনে কে টাকা খাটাতে যায়। এখন তো একটা বাছুরকেও নিজের বলে ভাবার উপায় নেই। একবার ওগুলোর দিক থেকে চোখ সরাও, ব্যস, স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে যাবে।'

'কথাটা তুমি মিছে বলোনি, জেড,' বলল তার সঙ্গী। 'হথর্ন গত সপ্তাহে আরও একশো গরু খুইয়েছে। আর্ট বেনসনের গেছে পঞ্চাশটা। কোন চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।'

'নিশ্চয়ই তোমাদের ওই খনির ভূতের কাজ,' মৃদু হেসে বলল একজন মাইনার।

'ব্যাপারটা হাসির নয়,' তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল গোঁফওয়ালা। 'পঞ্চাশটা একশোটা করে যাচ্ছে বলে কারও গায়ে লাগছে না। কিন্তু চিন্তা করে দেখো, একা হথর্নই হারিয়েছে পাঁচশোর ওপরে। প্রত্যেকটা গরুর দাম কমপক্ষে দশ ডলার। অনেক টাকার মামলা!'

'তাছাড়া গরুর দাম নাকি আরও বাড়ছে,' সন্তুষ্টির সঙ্গে বলল একজন র‍্যাঞ্চার। 'সামনের মরশুমে গরুর দাম বিশ ডলারে উঠতে পারে।'

'আগে দেখোই না, একবার রেল রোড এদিকে এসে পৌছুক, তারপর দেখবে লাভ কাকে বলে। ক্যাটল ড্রাইভ করা লাগবে না, ফ্রেইট কারে গরু তুলে দিলেই চলে যাবে পুরে। তখন আর রাসলিং করা লাগবে না। ওদের

একহাত দেখিয়ে দিতে পারব আমরা।'

'কিভাবে শুনি?' জানতে চাইল গোঁফওয়ালা। জবাব নেই দেখে বলল, 'রেল রোড হলেও রাসলিং ঠেকানো সহজ হবে না। বর্ডারের দু'ধারের বদমাশের দল চার পায়ে হাঁটে এমন সবকিছুই চুরি করে নিয়ে যেতে চাইবে। তাছাড়া রেল রোড যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে আগামী বিশ বছর লাগবে শেষ হতে। ডুরাংগোতে গিয়ে গত চারমাস আটকে বসে আছে ব্যাটারা।'

'দোষটা রেলওয়ে সার্ভেয়ারদের,' গম্ভীর চালে বলল বুড়ো একজন মাইনার। বোঝা গেল জেনে বুঝেই বলছে সে। 'ওরা মনে করেছিল টিলা টক্কর সবটাই স্যান্ড স্টোনের, ভেবেছিল টানেল কেটে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারবে; কিন্তু আধমাইলটাক যাওয়ার পরই দেখা গেল বেরিয়ে এসেছে নিরেট পাথর। সেই পিক্‌স্ ব্লাফ থেকে ওল্ড ইয়েলার পর্যন্ত। এখন ওরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে, ঠিক করতে পারছে না এগিয়ে যাবে নাকি কাজ বাদ দিয়ে সত্তর মাইল ঘুরপথে এগোবে। যাই করুক না কেন, খরচ অনেক বেশি পড়ে যাবে।'

আলাপচারিতা চলতে লাগল, কিন্তু বেনন আর রাসলিং সম্বন্ধে কিছু শুনতে পেল না। ও কাউন্টারের কাছ থেকে সরে আসছে, এমন সময় দু'জন লোক ঢুকল দোকানে। একজনকে ও সেলুনে বেলার সঙ্গে দেখেছে। একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল তারা উপস্থিত সবাইকে। মেঝেতে থুতু ফেলে যেন অবজ্ঞা প্রকাশ করল। তারপর উত্তেজিত একটা ভঙ্গিতে ওর দিকে এগিয়ে এলো তারা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এসেছে। ইচ্ছে করেই বেননের গায়ে ঘষা দিল সামনের লম্বা লোকটা।

গম্ভীর হয়ে গেল বেননের চেহারা। এই সব ঝামেলাবাজদের দু'চোখে দেখতে পারে না ও।

বিদ্রূপের হাসিতে ঠোঁট বেঁকে গেল লোকটার। কড়া গলায় জানতে চাইল, 'কোথায় যাচ্ছ দেখে যেতে পারো না?'

'তুমি পারো না?' শীতল গলায় পাল্টা জানতে চাইল বেনন।

উদ্ধত ভঙ্গিটা বিদায় নিল লোকটার চেহারা থেকে। এবার রেগে গেল সে। জয়ের আনন্দে জ্বল জ্বল করে উঠল দু'চোখ। এতক্ষণ একটা লড়াই খুঁজছিল, এবার সেই সুযোগ পেয়ে গেছে । লোকটার আচরণের কারণ বুঝতে দেরি হলো না ওর। পিঠের কাছটা শিরশির করে উঠল। মনে হলো লোকটার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভুল করে ফেলেনি তো সে?

মানুষটার আকৃতি প্রায় গ্রিজলি ভালুকের মতো। ওজন দুইশো পাউন্ডের কম হবে না। প্রকাণ্ড, চওড়া কাঁধ। গলাটা ষাঁড়ের গলার মতোই মোটা।

কোনরকম হুঁশিয়ারি না দিয়েই বেননের চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুসি হাঁকাল সে। দ্রুত সরে গিয়ে লোকটার ঘুসি এড়িয়ে গেল বেনন। বাতাসে ঘুরে গেল মুঠো করা হাতটা। ক্ষণিকের জন্যে ভারসাম্য হারাল ভালুক। সুযোগ নিল বেনন। দড়াম করে ঘুসি মেরে বসল মাথার পাশে। আওয়াজে মনে হলো কাঠের সঙ্গে কাঠ বাড়ি খেয়েছে। টলে উঠলেও পড়ল না লোকটা। মাথা

ঝাঁকিয়ে দৃষ্টি পরিষ্কার করে সামনে বাড়ল আবার।

চেয়ার আর বেঞ্চিতে বসা লোকগুলো হাঁ করে ওদের লড়াই দেখছে। কাউন্টারের পেছনে দাঁড়ানো দোকান মালিক হাতে একটা ডাণ্ডা নিয়ে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে। দুই প্রতিপক্ষের যে-ই আগে তার সামনে পড়বে দোকানের ভেতরে মারামারি বাধানোর অপরাধে তাকেই মাসুল গুনতে হবে।

লম্বুর সঙ্গী কাউন্টারে হেলান দিয়ে হাসি মুখে তাকিয়ে লড়াই দেখছে। তার মনে কোন সন্দেহ নেই ফলাফল কি হবে। এর আগেও সে বিগ বিল রেনোকে লড়তে দেখেছে। বেশির ভাগেরই মাথা ভেঙেছে রেনো। দু'এক জনের ঘাড়ও।

লোকটার তেড়ে আসা সামাল দেবার জন্যে পিছাতে গেল বেনন। কাঠের কুচিতে পা পিছলে গেল ওর। পড়ে যাচ্ছে, তার আগেই এগিয়ে এসে ওর চোয়ালে ঘুসি মারল লোকটা। ছিটকে গিয়ে কাউন্টারে বাড়ি খেল বেনন। পড়ে গেল মেঝেতে।

ও সামলে নেবার আগেই আবার তেড়ে এলো লোকটা। দু'চোখে খুনীর দৃষ্টি। ঠোঁট বেঁকে উঠে গেছে ওপরের দিকে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে হলদে দাঁতগুলো। লোকটাকে আসতে দেখল বেনন। অজান্তেই পা দুটো উঠে গেল ওর ওপরের দিকে। ওই একই মুহূর্তে ঝাঁপ দিল লোকটা। পেট দিয়ে পড়ল সবুট পায়ের ওপর। তারপর ওখান থেকে বেননের দেহ পার হয়ে মেঝেতে। হুস শব্দে দম বেরিয়ে গেল। দু'ভাঁজ হয়ে গেল তার দেহ।

একই সঙ্গে উঠে দাঁড়াল দু'জন।

আগে সামলে নিয়ে তার চোয়ালে ঘুসি মারল বেনন। এবার জায়গা মতো লাগল। মেঝে কাঁপিয়ে ধড়াস করে পড়ে গেল লোকটা। হাল ছাড়ল না, দু'হাতে বেননের গোড়ালি ধরে টান দিল সে। তার ওপর পড়ল বেনন। গড়াতে লাগল দু'জন।

ওই অবস্থাতেই চেষ্টা করছে ওরা দু'জন দু'জনকে আঘাত করতে। ভালুকের আন্দাজে ছোঁড়া একটা ঘুসি বেননের চোখের ওপর লাগল। চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল বেনন। ওর মাথা ঠুকে গেল একটা কাঠের পিপের সঙ্গে। আঘাতটা এতই জোরে লাগল যে দু'তিন সেকেন্ডের জন্যে অসাড় হয়ে গেল বেননের হাত-পা। ভালুকটা উঠে দাঁড়িয়ে বুট তুলল ওর মুখ বরাবর।

আর বড়জোর এক সেকেন্ড; তারপরই লড়াইয়ের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে যাবে। রক্তাক্ত, বিকৃত একটা চেহারা নিয়ে চিরজীবন বাঁচতে হবে বেননকে। অসহায়ের মতো পড়ে রইল বেনন। শরীর নাড়াতে পারল না। ঠিক সেই মুহূর্তে হাতের ডাণ্ডাটা ভালুকের মাথা সই করে নামিয়ে আনল দোকান মালিক। মারটা লাগল না জায়গামতো। দানবটা নড়ে ওঠায় বাড়িটা পড়ল তার কাঁধে। মারে যথেষ্ট জোর ছিল। ফলে হোঁচট খেয়ে কয়েক পা সামনে বাড়ল লোকটা।

সাড় ফিরে আসতেই গড়ান দিয়ে সরে গিয়ে উঠে দাঁড়াল বেনন।

নিজেকে সামলে নিয়ে আবার আগে বাড়ল ভালুক। এবার বেনন প্রস্তুত।

লোকটার ঘুসি এড়িয়ে পেটে মারল সে। না থেমেই গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে দ্বিতীয়বারও ঠিক একই জায়গায় ঘুসি বসাল। দু'ভাঁজ হয়ে গেল লোকটা। দু'হাতে চেপে ধরল পেট। চেহারা হয়ে গেল বিকৃত। এতই ব্যথা পেয়েছে যে চেঁচাতে পারছে না।

দু'হাতে লোকটাকে সোজা করে আবারও একই জায়গায় আঘাত করল বেনন। তার পরের মুহূর্তেই চোয়ালে। ডানহাতি সুইং। লোকটার ঘাড়ের হাড় মটমট করে উঠল। মেঝেতে পড়ে গেল সে। আর নড়ল না। ক্ষণিকের জন্যে জ্ঞান হারিয়েছে।

বোকার মতো লোকটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বেনন। হাপরের মতো ওঠা নামা করছে ওর বুক। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না সত্যিই সে জিতেছে। ওর চোখের কোণ থেকে নেমে আসছে রক্ত। রুমাল বের করে রক্ত মুছে নিল সে। হঠাৎ অনুভব করল চোখের কোণে কিসের যেন নড়াচড়া। তাকাতেই দেখল ভালুকের সঙ্গী বড় একটা ছুরি বের করেছে।

লোকটা হাত তুলে ফেলেছে, এখন ওর পিঠে ছুরি বসিয়ে দেবে। পাশ ফিরেই দ্রুত ড্র করল বেনন। ট্রিগার স্পর্শ করতেই ছুটল গুলি। ডানহাতের কব্জি চেপে ধরে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল লোকটা। হাত থেকে পড়ে গেল ছুরি। গুলিটা কব্জিতে লেগে হাড় গুঁড়িয়ে দিয়েছে। অবিশ্বাসের চোখে বেননকে একবার দেখল লোকটা, তারপর দৌড়ে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

গুলির শব্দ চারদেয়ালে বাড়ি খেয়ে মিলিয়ে গেল, নীলচে খানিকটা ধোঁয়া শুধু ভেসে থাকল বাতাসে। কেউ কোন কথা বলছে না। চুপ করে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে বেনন। দানবটার জ্ঞান ফিরেছে।

'আমি তোমাকে দেখে নেব,' বলতে বলতে ব্যথায় বিকৃত চেহারায় উঠে দাঁড়াল লোকটা। তার সঙ্গীর মতোই আর একটা কথাও না বলে বেরিয়ে গেল দোকান ছেড়ে। বাইরের বোর্ডওয়াকে তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। এতক্ষণে হোলস্টারে অস্ত্র ভরল বেনন। তাকিয়ে দেখল চোখে প্রশংসা নিয়ে ওকে দেখছে সবাই।

'এখন থেকে সাবধানে পা ফেলতে হবে তোমাকে, মিস্টার,' বলল স্টোভের পাশে বসা বুড়ো মতো একজন। 'তোমার জায়গায় আমি হলে পেছনদিকেও একটা চোখ খোলা রাখতাম। বিগ রিল রেনো আর ম্যাকলাস্কি – দু'জনই অত্যন্ত নীচমনা লোক। পিঠে ছুরি বসাতেও দ্বিধা করবে না ওরা।'

গোঁফওয়ালা লোকটার নাম জেড ম্যানসেল। একজন র‍্যাঞ্চার। চোখ সরু করে সন্দেহের দৃষ্টিতে বেননকে দেখল সে। বলল, 'কোথায় যেন তোমাকে দেখেছি আমি? ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে দেখেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'দেখে থাকতেই পারো,' বলল বেনন। 'শিকাগো বড় শহর, তবু হয়তো কখনও দেখে থাকবে। পুবে গিয়েছ কখনও?'

'তুমি তাহলে শিকাগো থেকে এসেছ?'

'আমি ওকে স্টেট এক্সপ্রেস থেকে নামতে দেখেছি,' মাথা দুলিয়ে বলল

একজন মাইনার। 'দেখলাম মিড বাসটিয়ানের পেছন পেছন ট্রেন থেকে নামল।'

'তুমি কি বাসটিয়ানের বন্ধু?' ম্যানসেলের পাশে বসা র‍্যাঞ্চার জানতে চাইল।

'না।'

'তাহলে জানতে পারি কি, কেন তুমি টুসনে এসেছ?' এবার একটু চড়া গলায় প্রশ্ন ছুঁড়ল ম্যানসেল।

জবাবে হাসল বেনন। বলল, 'দুঃখিত। কারণটা ব্যক্তিগত।'

'পিস্তলে যার হাত এত চালু এরকম একজন লোক শিকাগো ছেড়ে টুসনে কেন আসবে?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল ম্যানসেল। তারপর তাকাল বেননের দিকে। বলল, 'বাজি ধরতে পারি পুবে তুমি এভাবে অস্ত্র চালানো শেখোনি।'

'বাজি ধরলে হেরে যাবে,' বলল বেনন। 'পুবে এমন অনেকেই আছে যারা আমাকে হাসতে হাসতে হারিয়ে দেবে।'

কথাগুলো বলার সময় গলা নিষ্কম্প থাকলেও মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়ল বেনন। ওকে লোকটা সত্যিই চিনে ফেলেনি তো? চিনলে কোন্ পরিচয়ে – রক বেনন না রে জনসন? দুটো পরিচয়ের কোনটাই আখেরে ওর জন্যে সুফল বয়ে আনবে না টুসনে।

একবার হাত নেড়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলো সে। চোখের কোণ থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি। শক্ত হয়ে আসছে কেটে ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলো। হোটেলে ফেরার ইচ্ছে জাগল ওর। মনে হলো জেড ম্যানসেলের কাছ থেকে যতটা দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

দোকানের বাইরে এক মুহূর্তের জন্যে থেমে কান পাতল বেনন। শহরের ভাবচক্কর দেখে মনে হচ্ছে গুলির শব্দ কেউ শোনেইনি। আর শুনে থাকলেও পাত্তা দিচ্ছে না। টুসনে গোলাগুলি স্বাভাবিক ঘটনা।

রাস্তার দু'পাশে বেশ অনেকগুলো সেলুন। ওগুলো থেকে শোরগোল ভেসে আসছে। আর কোন সেলুনে ঢুকে মারামারির ফাঁদে পড়ার ইচ্ছে নেই ওর, কাজেই কোনদিকে না তাকিয়ে সামনে বাড়ল ও। হোটেলে ফিরে যাচ্ছে। সাইডওয়াক প্রায় খালি। বেশিরভাগ পুরুষই সেলুন অথবা গ্যাম্বলিং হাউজে গিয়ে ঢুকেছে। কিছুদূর এগোতেই একজন লোককে ধুলোয় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখল ও। একটা কুকুর তার চারপাশে ধুলোতে গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে। তারপর পেচ্ছাব করে দিল লোকটার গায়ে। লোকটা মাতাল নাকি মারা গেছে বোঝার জন্যে থামল না বেনন।

হাঁটতে হাঁটতে যাদের সঙ্গে লড়ে এলো তাদের কথা ভাবছে না বেনন। বিগ বিল রেনোর হুমকিটাও গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে না। আনমনে হেঁটে চলেছে, কিন্তু তাই বলে সতর্কতা বোধে ঢিল পড়েনি। দুটো উঁচু ভবনের মাঝখানে সরু একটা গলি দেখে থেমে দাঁড়াল ও। বুঝতে পারল না গলিটা পার হওয়া উচিত কাজ হবে কিনা। কেন যেন ওর মনে হচ্ছে কেউ একজন আছে ওই গলির মধ্যে।

অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল বেনন। ছায়ায় অনড় দাঁড়িয়ে থাকল। কান পাততেই শুনতে পেল দু'জোড়া পায়ের আওয়াজ। থেমে গেল আওয়াজটা। কথা বলতে লাগল দু'জন। বিস্মিত হয়ে গেল বেনন। একজনের গলাটা চিনতে পারছে ও। রাত বিরেতে অন্ধকার গলির মধ্যে কি করছে ন্যান্সি বাসটিয়ান? বুঝতে পারল না পুরুষ সঙ্গীটি কে।

সাবধানে উঁকি দিল ও। একপাশের খোলা একটা জানালা থেকে এক চিলতে হলদে আলো এসে পড়েছে গলির মধ্যে। মেয়েটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল। একপাশ ফিরে লম্বা-চওড়া সুদর্শন এক যুবকের সঙ্গে কথা বলছে। গলার স্বরে বোঝা গেল রেগে আছে মেয়েটা।

'আমি বলছি এভাবে হবে না, জনি,' বলল ন্যান্সি। 'আমি চাচাকে কথাটা বলতেই হেসে উড়িয়ে দিল। বলল শিকাগো ভাল কোন জায়গা নয়। কোন মেয়ের নাকি যাওয়া উচিত নয় ওখানে। বলে দিল আমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবে না।'

'তারমানে তুমি টাকা চেয়েছিলে?' এবার রেগে গেল যুবক। হোটেলের ডাইনিং রুমের কথা মনে আসতেই বেনন বুঝতে পারল যুবকটি লেযি এ-র কাউবয় জনি উইলিয়ামস। অর্থাৎ মেয়েটা মুখে যাই বলুক জনির প্রতি আসলে দুর্বল। তা নাহলে এভাবে এত রাতে গলির মধ্যে দেখা করতে আসত না।

'হ্যাঁ, চেয়েছি। বেশ করেছি। আমার সামনে এক লাখ ডলার রেখে চাচা বলছিল কিভাবে খনিতে টাকা খাটাবে। বাবা এত করে নিষেধ করল তারপরও। আমি মাত্র দু'তিন হাজার চেয়েছিলাম। দিল না।'

হঠাৎ করেই হাসল মেয়েটা। হাসিটা হিস্টিরিয়াতে পাওয়া মানুষের মতো। বলল, 'তুমি যদি বাবার চেহারাটা দেখতে! দেখার মতো হয়েছিল। দু'চোখ বেরিয়ে আসছিল প্রায়। আর চাচা দাঁড়িয়ে ছিল, গোলগাল লাল চেহারাটাতে ছিল গর্ব আর আত্মপ্রশংসা। সুযোগ পেলে আমি হয়তো টাকাগুলোর জন্যে খুনই করে ফেলতাম চাচাকে।'

ধীরে ধীরে বলল জনি, 'তারমানে পুরো এক লাখ ডলার ওই পুরনো খনিতে খরচ করবে তোমার চাচা?'

'হ্যাঁ। বাবা বলছিল চাচার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একবার চিন্তা করে দেখো, কি না-করা সম্ভব অতগুলো টাকা হাতে থাকলে! ইচ্ছে করলেই সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চটা কিনে নিতে পারে। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, বাবার স্বপ্ন ছিল এক সঙ্গে বেশকিছু টাকা হাতে পেলে বড় করে র‍্যাঞ্চ ব্যবসা আরম্ভ করবে। বাবার ধারণা টাকা আছে গরুর ব্যবসায়ে। যুদ্ধের পরে লোকে মাংসের জন্যে পাগল হয়ে গেছে। তাছাড়া বাবা বলে দক্ষিণ-পশ্চিমে রেল রোড খুলে গেলে ...'

'কিন্তু তুমি তো বলো তোমার বাবা সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চটার মালিক হলেও এখানে থাকবে না তুমি,' প্রতিবাদের সুরে বলল জনি। 'এখন তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে থাকবে।'

'না। তা থাকব না। কিন্তু চিন্তা করে দেখো, আমার বাবার অত টাকা

থাকলে তাকে বুঝিয়ে আমি পুবে চলে যেতে পারতাম। সঙ্গে নিতাম বয়স্কা কোন মহিলাকে যে আমার দেখা শোনা করত।'

'বয়স্কা মহিলা দিয়ে কি হবে?' রাগ এখনও পড়েনি যুবকের, একটু কড়া গলাতেই বলল, 'তুমি সব সময়েই বলে এসেছ আমরা এক সঙ্গে পুবে যাব, ওখানে বিয়ে করে সংসার পাতব।'

'ওকথা আমি বলিনি, জনি,' মিষ্টি গলায় আপত্তি জানাল ন্যান্সি। 'আমি বলেছিলাম তুমি যদি পুবে যাওয়ার মতো যথেষ্ট টাকা জোগাড় করতে পারো তাহলেই শুধু আমরা এক সঙ্গে পুবে গিয়ে বিয়ে করব। কিন্তু ধরো বাবার যদি টাকা থাকত – বা আমার – তাহলে কেউ আমার পুবে যাওয়া ঠেকাতে পারত না।'

'তারমানে তুমি বলতে চাও আসলে তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও না, চাও শুধু পুবে যেতে।'

'ওভাবে তুমি ব্যাপারটাকে ধরলে আমি আপত্তি জানাব না।'

'কিন্তু তুমি তো জানো কত গভীর ভাবে তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি আমি।' দু'হাত দু'দিকে ছুঁড়ে নিজের অসহায়তা প্রকাশ করল যুবক। 'আমি চাই তুমি আমাকে বিয়ে করো। কিন্তু তুমি শুধু চাইছ দূরে সরে যেতে।'

'তাহলে আমি যাতে দূরে সরে না যাই সেটা নিশ্চিত করা তোমার দায়িত্ব, তাই নয় কি?'

'কিন্তু...কিভাবে?'

'আমাকে শিকাগোতে নিয়ে চলো।'

'তুমি ভাল মতোই জানো আমার অত টাকা নেই।'

'তাহলে জোগাড় করো। ভিক্ষা করো বা ধার করো বা আর কিছু...' হঠাৎ করেই থেমে গেল ন্যান্সি। বেনন বুঝতে পারল না মেয়েটা যা বলছে তা সত্যি মন থেকে বলছে কিনা। জনির কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিল ন্যান্সি। আলো পড়ে ঝিলিক দিয়ে উঠল ওর চুল। লোভনীয় ভেজা ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক করা, হলদে এক চিলতে আলোয় চক চক করছে। 'আমাকে যেতে হবে,' ফিসফিস করে বলল। 'বাবা যদি টের পায় আমি বিছানায় না গিয়ে এখানে তোমার সঙ্গে দেখা করেছি তাহলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে।'

'কালকে আবার এখানে আমাদের দেখা হবে তো?' ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইল জনি।

মাথা দোলাল ন্যান্সি। 'চাচা বলেছে আমাকে নতুন পোশাক কিনে দেবে।'

যুবকের চেহারা ঈর্ষায় কালো হয়ে যেতে দেখল বেনন। তারপর কিছু একটা মনে পড়তে সে বলল, 'তোমার চাচা যদি তোমাকে পোশাক কেনার টাকা দেয় আর সেই টাকা যদি তুমি...'

'জমিয়ে রাখব?' কথাটা শেষ করতে দিল না ন্যান্সি। হাসল। হাসিতে মিশে আছে বিস্ময় আর তিক্ততা। 'কয়েকশো ডলারে কতদিন যাবে বলে মনে করো তুমি? তাছাড়া চাচার চরিত্র আমি ভালই চিনে গেছি। চাচা নিজেই পয়সা খরচ করবে, তাতে নিজেকে বড় মনে হবে তার।'

সংক্ষিপ্ত নীরবতা। তারপর জনি বলল, 'অত টাকা তোমার চাচা এখন রাখবে কোথায়, নিশ্চয়ই নিজের কাছে রেখে দেবে না?'

'জানি না কি করবে। আমার ধারণা ডলারগুলো ব্যাঙ্কে রেখে দেবে। আগামী কাল বা তার পরের দিন। আগে হোক পরে হোক, শহরের সবাই জানবে কত টাকা চাচা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। আজকেই হয়তো খবরটা ছড়িয়ে গেছে। চাচার ডাইনিং টেবিলের পাশে একজন লোক বসেছিল, সব কথাই সে শুনেছে বলে আমার বিশ্বাস।' এর পরের কথাগুলো ন্যান্সি এতই নিচু স্বরে বলল যে প্রায় শুনতেই পেল না বেনন। শুধু শুনল: 'ভাল হতো কেউ যদি ডলার চুরি করে নিয়ে যেত।'

আবার ক্ষণিকের নীরবতা নামল। তারপর জনি বলল, 'চলো, আমি বরং তোমাকে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি। এখন একা তোমার পথে বেরনো নিরাপদ নয়।'

দু'জন এক সঙ্গেই গলি থেকে বেরল। পাশাপাশি হাঁটছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে পিঠ কুঁজো করল বেনন। ভঙ্গিটা এমন যেন সিগার ধরাতে ব্যস্ত। ওকে লক্ষ করল না দু'জনের একজনও। নিজেদের চিন্তায় ডুবে এগিয়ে গেল ধূলিময় বোর্ডওয়াক ধরে।

কাটা ছেঁড়ার ব্যথা ভুলে পেছন থেকে তাকিয়ে থাকল বেনন। গভীর চিন্তায় ভ্রূ কুঁচকে গেছে। ওর মনে পড়ে গেছে ন্যান্সির কথা বলার ভঙ্গি আর যুবক জনির চেহারা। টাকা জোগাড় করতেই হবে বেচারাকে, নইলে প্রেমিকাকে হারাতে হবে। প্রেমিকা কয়েকটা সম্ভাবনা তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখন কি করবে সে? ভিক্ষা, ধার নাকি চুরি বা ডাকাতি?

জনিকে মরিয়ার মতো দেখাচ্ছিল।

চার

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে লিভারি স্টেবল থেকে একটা ঘোড়া ভাড়া নিয়ে নাথানিয়েল হথর্নের র‍্যাঞ্চ, ফ্লাইং জে-এর উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল বেনন।

নাস্তার সময়ও কারও সন্দেহ না জাগিয়ে বাসটিয়ানের পাশের টেবিলেই বসেছিল ও। দু'ভাইয়ের কারও মন মেজাজই ভাল বলে মনে হয়নি ওর। ধারণা করছে ঝগড়া হয়েছে দুই ভাইয়ের মধ্যে। গত রাতে ন্যান্সির বলা কথাগুলো নিয়ে ভেবেছে বেনন। বুঝতে অসুবিধে হয়নি ঝগড়ার কারণ। নেড নিশ্চয়ই ভাইকে র‍্যাঞ্চে টাকা খাটানোর ব্যাপারে জোর করছে। ন্যান্সিকেও কিছুটা চিন্তিত আর বিমর্ষ লেগেছে দেখতে। অবশ্য চাচার কথায় সাড়া দিয়ে হাসতে কসুর করেনি সে।

গোটা পরিস্থিতি বেননের কাছে স্বস্তিকর বলে মনে হচ্ছে না। বুঝতে পারছে ওর উচিত টাকা ব্যাঙ্কে জমা না দেয়া পর্যন্ত মিড বাসটিয়ানের কাছাকাছি

থাকা। কিন্তু ওকে আসলে হিলা ভ্যালিতে পাঠানো হয়েছে রাসলিং তদন্ত করার জন্যে। পিঙ্কারটন এজেন্সি নিশ্চয়ই র‍্যাঞ্চারকে চিঠি দিয়েছে। সেক্ষেত্রে লোকটা ওকে খুঁজতে শহরে চলে আসতে পারে। তেমনটা ঘটুক তা চায় না ও। তাতে ওর পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ার জোর সম্ভাবনা আছে। সেজন্যেই বাধ্য হয়ে ফ্লাইং জে'তে চলেছে ও।

পিঙ্কারটন ডিটেকটিভ এজেন্সির লোক ধারে কাছে আছে জানলেই নিজেদের গুটিয়ে নেবে মানুষ। অনেক কিছু গোপন করার আছে বেশির ভাগ মানুষের।

শহরের কাঠের বাড়িগুলো পেছনে ফেলে আসার পর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল ওর। মনে হলো এতক্ষণে নিজের দুনিয়ায় ফিরে এলো।

যত এগোল ততই বুনো হয়ে এলো চারপাশের প্রকৃতি। ট্রেইলের সামান্য চওড়া জায়গাটা বাদ দিয়ে চেপে এলো লম্বা ঘাসে ভরা ঢেউ খেলানো উর্বর জমি। কার্পেটের মতো বিছিয়ে রয়েছে ঘাস – মাইলের পর মাইল, সেই ফুটহিলের গায়ে গিয়ে মিশেছে। কোথাও কোথাও জঙ্গলকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে ঘাস। আকাশের মেঘ এসে দূরের পাহাড়ের চুড়ো ঢেকে দিয়েছে। পাহাড়ী বাতাসে পাইনের সুগন্ধ আর শীতল একটা আমেজ। অদ্ভুত একটা বিষণ্ণতা মাখানো কোমলতা আছে প্রকৃতির এই বিশাল বিস্তারের মাঝে। পাহাড়ের পাথরে রামধনুর সাত রঙের খেলা। লাল, বেগুনি, হলুদ, সোনালী, সবুজ, সাদা – কি রং নেই। সূর্যের আলো যেসব পাথরে পড়েছে ওগুলোকে দেখাচ্ছে রূপার মতো জ্বলজ্বলে।

আরও সামনে বাড়তেই ঘাসজমির ঢেউগুলো বড় হতে শুরু করল। কয়েকটা ছোট টিবি পার হয়ে উপত্যকা অঞ্চলে প্রবেশ করল বেনন। ঘাসগুলোকে দেখাচ্ছে সবুজ আর রূপালী, কোথাও কোথাও জন্মেছে লালচে সেজ আর ঘন কালো চ্যাপারেল ঝোপ। একটা রিজ থেকে আরেকটা রিজ বেশ অনেকখানি দূরে। মাঝখানে ঘাস। রিজগুলোর মাথায় ঘন পাইন, ওক আর মেপ্‌লের বন। পুবে, অনেক দূরে বাদামী একটা রেখা, ওটা মরুভূমি অঞ্চলের শুরু।

টুসন ছাড়ার ঠিক এক ঘণ্টা পর উঁচু একটা রিজ পেরতেই হিলা ভ্যালিতে প্রবেশ করল বেনন। যত দূর চোখ যায় মাইলের পর মাইল শুধু ঘাস জমি। অসংখ্য গরু চরছে সেখানে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কাউবয়দের গলা শুনতে পেল ও।

হাতের ডান দিকে খানিকটা দূরে সিকামোর আর পাইনে ঘেরা একটা র‍্যাঞ্চ হাউজ চোখে পড়ল। ভবনটা দোতলা। বাড়ির আঙিনা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রেঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। র‍্যাঞ্চ হাউজের পেছনে বার্ন আর বেশ কয়েকটা ছোট ছোট ঘর। করালে অনেকগুলো ঘোড়া দৌড়াদৌড়ি করছে।

র‍্যাঞ্চটার অবস্থা ভাল দেখে বেনন বুঝতে পারল এটাই ফ্লাইং জে – হিলা ভ্যালির সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চ।

ধীর গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে এগোল ও।

ওকে দেখে বাংক হাউজ থেকে বেরিয়ে এলো দু'জন লোক। চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকল তারা। কুক হাউজ থেকে বেরল সাদা অ্যাপ্রন পরা কুক। তার এক হাতে পানির বাকেট, আরেক হাতে বিরাট একটা কুকিং পট।

র‍্যাঞ্চ হাউজ থেকে নাথানিয়েল হথর্ন নিজে বেরিয়ে আসায় কাউহ্যান্ডদের সঙ্গে কথা বলতে হলো না বেননকে। পোর্চের সামনে ঘোড়া থেকে নেমে নিজের পরিচয় জানাল ও।

উষ্ণ করমর্দন করে ওকে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল র‍্যাঞ্চার। লোকটা লম্বা। দেহে বাড়তি মেদ জমেনি। বয়স পঞ্চাশই হবে, ন্যান্সি খুব একটা ভুল বলেনি। বাইরে কাজ করায় চামড়া বাদামী রং ধরেছে। চোখগুলো একটু গর্তে বসানো। দেখে মনে হয় গর্ত থেকে স্কুইরেল উঁকি দিচ্ছে।

ড্রিঙ্ক সার্ভ করে কাজের কথায় এলো লোকটা। বলল, 'স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, বেনন, আমাকে ওরা বোকা বানিয়ে দিয়েছে।' গ্লাসে চুমুক দিল সে। তারপর বলল, 'দলগত হামলা, গোলাগুলি বা স্ট্যাম্পিডিং হলে আমি বুঝতাম কিভাবে তার মোকাবিলা করতে হয়, কিন্তু এরা স্রেফ গায়েব করে দিচ্ছে গরুগুলোকে। কোন ট্র্যাক নেই, কিচ্ছু নেই – স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে দিচ্ছে। দেখেশুনে মনে হয় আকাশ থেকে হাত বাড়িয়ে গরুগুলোকে কেউ তুলে নিয়ে যাচ্ছে।'

'কোন ক্লু বা চিহ্ন নেই?'

'বললাম তো, কিচ্ছু নেই। এক মিনিট আগে দেখে গেলে গরু আছে পরের মিনিটে চোখ ফিরিয়ে দেখবে নেই। আমার একজন লোকও অস্বাভাবিক কিছু দেখেনি বা শোনেনি।'

'তাহলে হয়তো রাতের বেলা কাজ সারছে রাসলাররা।'

'হয়তো তাই।' সায় দিল র‍্যাঞ্চার। পরক্ষণে বলল, 'তাহলেও তো সাড়াশব্দ হবে? তা-ও নেই। এত বড় একটা র‍্যাঞ্চ চালাই, প্রথম প্রথম খুব একটা চিন্তিত হইনি। ধরেই নিয়েছিলাম বছরে একশো গরু হারাতে হবে। বোঝই তো, ইন্ডিয়ান, আউট-ল আর ওয়্যাগন ট্রেনের লোকজন যাদেরই সখ হয়েছে, বিনা পয়সায় বিফ স্টেক খেয়ে গেছে। ব্যাপারটা ওই পর্যন্তই ছিল। কিন্তু বসন্তের রাউন্ডআপের পরেই গুনে দেখলাম ছয়শো গরু কম। টাকার হিসেবে অনেক বড় অঙ্কের ক্ষতি।'

'চিঠিতে তুমি লিখেছিলে অন্য র‍্যাঞ্চাররাও রাসলিঙের শিকার। তাদেরও কি এই পরিমাণ যাচ্ছে?'

'না। পঞ্চাশটা একশোটা করে। ভ্যালির বাইরে যেগুলো যাচ্ছে শুধু সেগুলোই চুরি করছে ওরা। আমার বেলাতেই যত ব্যতিক্রম।'

আরও অনেকক্ষণ কথা বলল ওরা। কিন্তু বেননকে কোন সাহায্য করতে পারল না র‍্যাঞ্চার। দশ হাজার একর জমিতে গরু চরাচ্ছে সে। জমি উঁচু নিচু। কোথাও বা জন্মেছে জঙ্গল। পাহাড়ী এলাকা। কে কোথা দিয়ে চুরি করছে এত সহজে তা জানার কোন উপায় নেই। তবুও খটকা লাগল বেননের মনে।

পঞ্চাশ বা একশোটা গরু কোন সূত্র না রেখেই কিভাবে গায়েব করে দেয়া যায় মাথায় ঢুকল না ওর।

দুপুরের খাওয়াটা র‍্যাঞ্চেই সারল বেনন। খাওয়া শেষে ঘোড়া নিয়ে ভ্যালিটা ঘুরে দেখাতে ওকে নিয়ে বেরল র‍্যাঞ্চার। একটানা তিন ঘণ্টা ঘোড়া দাবড়াল ওরা। প্রত্যেকটা মুহূর্ত চোখ কান খোলা রাখল বেনন। হথর্নকে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করল। কাউবয়দের সঙ্গে কথা বলে দেখল। লাভ হলো না কোন।

হথর্নের সবক'জন কাউবয়কে বিশ্বাস করা যায় কিনা ভেবে দেখল বেনন। কিছু না জেনে বলার উপায় নেই কে কিসের সঙ্গে জড়িত। বেশিরভাগই ফ্লাইং জে'তে দীর্ঘ দিন ধরে আছে। তবে নতুন লোকও একেবারে নেই তা নয়। রাউন্ডআপ আর ট্রেইল আউটের মাঝের সময়টুকুতে কাজ করে তারা।

কিন্তু নতুন কেউ যদি রাসলিঙের সঙ্গে জড়িত থেকে থাকে, তাহলে এই দু'তিন মাসে পঞ্চাশ বা একশোটা গরু উইচিটায় নিয়ে বেচে পোষাবার কথা নয়। বরং তারা চেষ্টা করবে অপেক্ষা করে বড় একটা গরুর পাল নিয়ে বাজারে যেতে। কিন্তু এক সঙ্গে কয়েকটা ব্র্যান্ডের গরুর পাল ড্রাইভ করার ঝুঁকি বুদ্ধিমান কেউ কি নেবে? নেবে না। তাহলে?

ভ্যালির উত্তর দিকে এগোল ওরা। বেনন লক্ষ করল জমির চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। ঘাসের পরিমাণ কমে গেছে। মাটি এখানে বেলে। জায়গায় জায়গায় পাথুরে। বড় বড় পাথর খণ্ড পড়ে আছে। এখানে সেখানে শুধু দু'একটা জুনিপার আর অন্যান্য ঝোপের সমাবেশ। বড় একটা টিলা পেরিয়ে সামনেই একটা ক্লিফ। বেননের উৎসাহ বেড়ে গেল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওখানে মাইনিং করা হতো।

'এটাই কি মিড বাসটিয়ানের সেই খনি?' জানতে চাইল সে।

মাথা ঝাঁকাল হথর্ন। 'হ্যাঁ, ওটাই। প্রায় বিশ বছর হলো বন্ধ পড়ে আছে। গুজব শুনলাম বাসটিয়ান নাকি আবার ওটা চালু করবে।'

'গুজব নয়; সত্যি তাই করবে লোকটা। গতকাল ওর সঙ্গেই ট্রেন থেকে নেমেছি আমি। গতকালই ওর ভাই শহরে গেছে দেখা করতে। দুই ভাইয়ের মধ্যে খনিতে কাজ করা নিয়ে মত পার্থক্য দেখা দেয়ায় নেড বাসটিয়ান শহরেই রয়ে গেছে।'

'নেড যা করছে ঠিকই করছে,' বলল হথর্ন। 'ওই খনিতে টাকা ঢালা ঝুঁকিপূর্ণ।'

'মিড এত সহজে মত পাল্টাবে না।'

'তাহলে ও বোকামি করবে। চলো, তোমাকে দেখিয়ে আনি খনির অবস্থা।'

টিলার ঢাল বেয়ে দু'জনে একসঙ্গে নেমে খনিমুখের সামনে থামল। এক পলক দেখেই বলে দেয়া যায় বহুদিন ধরে খনিটা অব্যবহৃত পড়ে আছে। শেষবার এখান থেকে রূপা তোলা হয়েছিল বিশ বছর আগে। তারপর আর কেউ খনন করেনি। বিরাট একটা দানবের মুখের মতো হাঁ হয়ে আছে খনির সুড়ঙ্গ। নিচের অংশটা কাঠের তক্তা দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে। ওখানে জমে

আছে অনেকগুলো টাম্বলউইড। সুড়ঙ্গের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে রেল লাইন। চলে গেছে বালু ভরা জমিতে। এখন লাইনগুলো প্রায় ঢাকা পড়ে আছে মরা ঘাস আর উড়ে আসা বালুতে।

সিকি মাইল দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে লাইনটা। চোখ দিয়ে অনুসরণ করল বেনন। খনির লাইন অসম্পূর্ণ স্টেট রেল রোডের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। রেল রোড এখন আটকে আছে ডুরাংগোতে। বেনন খেয়াল করে দেখল খনির লাইন রেল রোডের লাইন ছাড়িয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেছে, তারপর থেমে গেছে ঢালু একটা জায়গায়। বেননের দৃষ্টি ওখানে দেখে জায়গাটা দেখিয়ে র‍্যাঞ্চার বলল, 'ওখানেই খনির বর্জ্য আর পাথর ফেলা হতো। একশো বছরেও ওই গর্ত ভরতে পারবে না কেউ।'

লাইনটা ধরে এগোল বেনন। থামল একেবারে ট্র্যাকের শেষে। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল বেসিনের অর্ধেকও ভরেনি পাথরে। দু'একটা পাথরে এখনও লেগে আছে রূপা আর সোনা। সূর্যের আলোয় চকচক করছে ওসব জায়গা।

আবার খনিমুখের সামনে, র‍্যাঞ্চারের কাছে ফিরে এলো বেনন। ওদের চারপাশে অতীতের চিহ্ন। পড়ে আছে লালচে কালো জং ধরা পিক হেড্স্, কুঠার, উল্টে পড়া ট্রাক আর ভাঙা রেল। সতেজ, সবুজ উপত্যকায় জায়গাটা কেমন যেন বেমানান। অস্বস্তি লেগে উঠল বেননের।

'এখানে কেউ আর আসে না,' নীরবতা ভাঙল র‍্যাঞ্চার। 'পুরানো খনির মতো ভূতুড়ে জায়গা আর হয় না। কেমন অদ্ভুত ভৌতিক একটা পরিবেশ, তাই না?' আচমকা চুপ হয়ে গেল সে।

ব্যাপারটা খেয়াল করল বেনন। জানতে চাইল, 'কি ভাবছ?'

বাস্তবে ফিরে এলো লোকটা বেননের কথায়। খানিক পরে বলল, 'এই জায়গাটা দেখে একটা কথা মনে পড়ে গেল। বর্ডারের কাছাকাছি একটা খনির কথা প্রায়ই বলত মাইনাররা। কথাটা ওদের কাছ থেকেই শোনা। ওরা বলত একদল আউট-ল একবার তাড়া খেয়ে একটা খনির ভেতর ঢুকেছিল। এক সপ্তাহ ছিল তারা ওখানে। পানি বা খাবারের অভাব ছিল না। পাসি এলে যাতে ঠেকাতে পারে সেজন্যে অভাব ছিল না গোলাগুলির। সঙ্গে করে আরও কিছু জিনিস নিয়ে গিয়েছিল ওরা...'

থামল র‍্যাঞ্চার। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল বেনন, কিন্তু লোকটার চিন্তায় বাধা দিল না। কিছুক্ষণ পরে গম্ভীর স্বরে আবার শুরু করল হথর্ন: 'দুই ডজন রাই হুইস্কির বোতল আর তিনটে ইন্ডিয়ান মেয়ে নিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল ওরা। বোতলগুলো যখন শেষ হলো মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। তারপর কি হয়েছিল আন্দাজ করে নাও। মেয়েগুলোর বেরনোর কোন পথ ছিল না। সারাক্ষণ চিৎকার করে কাঁদছিল ওরা।

'শেষ পর্যন্ত পাসি যখন পৌঁছুল, খনির পেছনদিকের পাথর খুঁড়ে বেরিয়ে গেছে আউট-লর দল। মেয়েগুলোকে ফেলে গিয়েছিল তারা। না খেয়ে মরেনি ওরা...তাছাড়া তৃতীয় মেয়েটা তখনও বেঁচে আছে। তুমি কি জানো ব্যবহার

শেষে মেয়েগুলোকে কি করেছিল ওরা? আন্দাজ করতে পারো?'

'না।' মাথা নাড়ল বেনন।

'ওরা জীবিত অবস্থায় মেয়েগুলোর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছিল। মেয়েগুলোর হাত-পা বাঁধা হয়েছিল ওদেরই চুল দিয়ে। পাসির সদস্যরা ইন্ডিয়ানদের পছন্দ করত না, কিন্তু এই ঘটনার পর তারা যদি আউট-লদের ধরতে পারত, তাহলে একজনকেও প্রাণে বাঁচতে দিত না।'

'যে মেয়েটা বেঁচে ছিল তার কি হলো?'

'পাসির নেতা মেয়েটাকে গুলি করে মারে। এছাড়া বেচারির কষ্ট লাঘব করার আর কোন পথ ছিল না। মাইনারদের মুখে শুনেছিলাম মেয়েটার বয়স নাকি মাত্র তেরো ছিল। এরপর আর কেউ কখনও ওই খনির ছায়া মাড়ায়নি। লোকে বলে খনিটা ভূতুড়ে, ওটার পাশ দিয়ে রাতে কেউ গেলে আজও নাকি শুনতে পায় সেই মেয়েগুলোর কান্নার আওয়াজ।'

শ্রাগ করে স্যাডলে সোজা হয়ে বসল র‍্যাঞ্চার। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, 'মিড যদি সত্যি এই খনিতে কাজ করতে চায় তাহলে আমি বলব মস্ত ভুলই করবে সে। দাঁতের ফুটো বন্ধ করার মতো রূপাও এখন আর নেই এ খনিতে।'

'তার ধারণা আছে। তাছাড়া তার তো জানার কথা আছে কি নেই।'

'জেড ম্যানসেলেরও জানার কথা,' বলল হথর্ন। 'লোকটা র‍্যাঞ্চিং ব্যবসায় নামার আগে অ্যাপাচি কাউন্টিতে রূপার জন্যে মাইনিং করত।'

গোঁফওয়ালা লোকটার কথা মনে পড়ে গেল বেননের। জিজ্ঞেস করল ও, 'এই ম্যানসেল লোকটা কি তোমার প্রতিবেশী?'

সায় দিল র‍্যাঞ্চার। 'ওর র‍্যাঞ্চটা নদীর ওপারে। লেযি এ।'

'লেযি এ? ওখানেই কাজ করে না জনি উইলিয়ামস?'

কৌতূহল নিয়ে বেননের দিকে তাকাল হথর্ন। 'ওর ব্যাপারে হঠাৎ জানতে চাইলে কেন? কিছু ঘটেছে নাকি?'

'না, তেমন কিছু না। আমি শুধু কৌতূহল দেখাচ্ছি কারণ যুবক ন্যান্সি বাসটিয়ানকে ভালবাসে। মেয়েটাকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু পারছে না টাকার অভাবে। এমন কি হতে পারে না দ্রুত টাকা বানানোর জন্য জনি...'

'জনি?' হেসে উঠে ওকে থামিয়ে দিল হথর্ন। 'অসম্ভব! ছোটবেলা থেকে ওকে চিনি। অত্যন্ত সৎ, পরিশ্রমী ছেলে। তা নাহলে ন্যান্সির ধারেকাছে ওকে ভিড়তে দিত না নেড বাসটিয়ান।'

বুঝলাম, মনে মনে বলল বেনন, *কিন্তু ন্যান্সি ওকে দিয়ে কিছু করাচ্ছে কিনা জানছি কেমন করে। মেয়েটার কথায় কালকে রাতে যেরকম হতাশা আর রাগ দেখলাম কোন অঘটন না বাধিয়ে বসে শেষে।* মুখে বলল, 'ম্যানসেলের গরু চুরি যাচ্ছে?'

মাথা দোলাল হথর্ন। 'হ্যাঁ। সপ্তাহ খানেক আগে ডেড ম্যান্‌স্ গাল্‌চে চল্লিশটা গরু চুরি গেছে ওর।'

'সব মিলিয়ে কতগুলো গরু চুরি করেছে রাসলাররা?'

জবাব দেবার আগে এক মুহূর্ত ভেবে নিল র‍্যাঞ্চার। তারপর বলল, 'তা কম করেও আটশো তো হবেই। এখন পর্যন্ত আমিই সবচেয়ে বেশি গরু হারিয়েছি। তবে এটা স্বাভাবিক। আমার র‍্যাঞ্চটাই সবচেয়ে বড়। টার্কিট্র্যাক হারিয়েছে পঞ্চাশ বা ষাটটা। ডাবল এইটের কালিন্সরা হারিয়েছে একশো মতো। আরও আছে জেন্ড ম্যানসেল। সব মিলিয়ে আটশোর কম নয়, মিস্টার বেনন।'

'আমার নাম বেনন নয়, জোন্স; জর্জি জোন্স। কেউ যদি প্রশ্ন করে এখানে আমি কি করছি তাহলে বলতে হবে শিকাগোর গরু ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য – এখানে এসেছি গরু কিনতে।'

হাসিমুখে মাথা দোলাল হথর্ন। বলল, 'বুঝেছি, পরিচয় গোপন রাখতে চাইছ তুমি। ঠিকই আছে, আমার মনে হয় রাসলাদের পরিচয় জানার আগে পর্যন্ত পরিচয় গোপন রাখাই সবার জন্যে ভাল।...একটা কথা, আমার ধারণা কাজটা যারা করছে তারা টুসনে বসেই ব্যবসা চালাচ্ছে।'

'কেন তোমার একথা মনে হলো?'

'টুসন শহরটা আউট-লয়ে ভরে গেছে।'

ফিরতি পথে কিছুদূর যাওয়ার পরে বেনন বলল, 'আটশো গরু মুখের কথা নয়। ওগুলোকে লুকিয়ে রাখার মতো জায়গা হিলা ভ্যালিতে আছে?'

'না। কারও না কারও চোখে ধরা পড়েই যেত।'

'পঞ্চাশ বা ষাটটা করে গরু সরিয়ে উইচিটায় নিয়ে বেচলে ব্যাপারটা লাভজনক হবে না। তাহলে?'

'পঞ্চাশটা গরুর দাম পাঁচশো ডলার। কম কোথায় দেখলে?'

'তারপরও আমি বলব লাভজনক নয়। চিন্তা করে দেখো, গরু নিয়ে উইচিটায় যাবে, বেচবে, তারপর ফিরে আসবে; অন্তত একমাসের মামলা। লোক লাগবে কয়েকজন। সবাই ডলার ভাগ করে নিলে ভাগে বেশি পড়ে না। আমার ধারণা ওরা মেক্সিকোয় গরু পাচার করছে।'

'হতে পারে,' সায় দিল র‍্যাঞ্চার। 'আমাকে যেটা আশ্চর্য করছে সেটা হলো কেউ ওদের দেখা পাচ্ছে না। গরু যে নিয়ে যাচ্ছে দেখবে বা আওয়াজ তো শুনবে কেউ? কোথায় কি; কিচ্ছু না! আমরা বর্ডারের ওপার থেকে আসা লোকদের জিজ্ঞেস করে দেখেছি, ওরাও বলেছে কেউ কিছু দেখেনি। তাছাড়া, কয়েকজন লোক পঞ্চাশ বা ষাটটা গরু নিয়ে রওয়ানা হলে লোকের চোখে সেটা বড় ড্রাইভের চেয়ে বেশি চোখে পড়ার কথা।'

'তুমি বলতে চাইছ ব্যাপারটা লোকের চোখে সন্দেহজনক ঠেকবে, এই তো?'

'হ্যাঁ। বড় কোন র‍্যাঞ্চার এত ছোট গরুর পাল নিয়ে ড্রাইভ করবে না। আর যারা নেড বাস্টিয়ানের মতো দু'পয়সা দামের হোমস্টেডার তারাও একা ড্রাইভ করার ঝুঁকি নেবে না। অপেক্ষা করবে, তারপর যখন বড় ড্রাইভে আমরা বেরব তখন দলে ভিড়ে যাবে। পেছন পেছন আসবে।'

মাথা দোলাল বেনন। 'জানি। এভাবেই ওরা ইন্ডিয়ান আর আউট-লদের হাত থেকে নিজেদের নিরাপদ করে।' র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল ও। 'আচ্ছা,

আরেকটা ব্যাপার, প্রথম কবে থেকে গরু চুরি আরম্ভ হলো সেটা বলো দেখি?'

'তিন মাস আগে। জুন চলছিল তখন।'

'কত বারে গরু চুরি গেছে?'

'বলা মুশকিল। তবে অন্তত দশ দফায়।'

'প্রতিবারে গেছে আশি নব্বইটা করে,' আপন মনে হিসাব করল বেনন। 'তারমানে রাসলাররা দলে তিনজনের বেশি নয়।'

'গত সপ্তাহে আমি একশোটা হারিয়েছি,' ওকে মনে করিয়ে দিল হথর্ন। 'তার মানে এটা হতে পারে যে ওদের দলটা বড় হচ্ছে।'

'অথবা বড় একটা বাজার খুঁজে পেয়েছে। আচ্ছা, আন্দাজ কয়দিন পরপর গরু চুরি যায়?'

'ধরো সপ্তাহে একবার করে।'

চিন্তিত দেখাল বেননকে। 'সপ্তাহে একবার মানে দলটার কাছাকাছি কোথাও আস্তানা আছে। আরও দুটো ব্যাপার স্পষ্ট হলো। গরু ওরা যেখানেই নিয়ে যাক তিনদিনের বেশি লাগে না সেখানে পৌঁছতে। আর দ্বিতীয়ত মেক্সিকোতে ওরা পাচার করছে না, কারণ ওখান থেকে এক সপ্তাহের আগে ফিরতে পারবে না।'

'তাহলে ওগুলোকে কোন্ দোজখে নিয়ে যাচ্ছে বদমাশের দল?' র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠে রাগ আর অসহায়তা প্রকাশ পেল।

'সেটা জানার জন্যেই উইলিয়াম এ. পিঙ্কারটন আমাকে বেতন দিচ্ছে,' বলল গম্ভীর বেনন।

বেশ বুঝতে পারছে ও, ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। কারা যেন সুকৌশলে র‍্যাঞ্চারদের পথের ফকির বানানোর চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে।

র‍্যাঞ্চ হাউজের দিকে এগিয়ে চলল ওরা।

পাঁচ

শেষ বিকেলে টুসনে ফিরল বেনন। হথর্নের ওখান থেকে বেরিয়ে নিজেও কিছুক্ষণ সে চারপাশের প্রকৃতি দেখে বেড়িয়েছে। কিন্তু এই চেষ্টা কোন ফলাফল বয়ে আনেনি। গোপন কোন গালচে গরু সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তেমন কোন চিহ্ন ওর চোখে পড়েনি। রেঞ্জের বাইরে কোথাও কোন ট্র্যাকও নেই।

টুসনের প্রধান সড়কে ভীষণ ভিড়। বাকবোর্ড, ওয়্যাগন আর ঘোড়া মিলে যানজটের সৃষ্টি করেছে। বোর্ডওয়াক ধরে ব্যস্ত হয়ে আসাযাওয়া করছে মানুষ। পথ করে এগোল বেনন। হোটেলের সামনে পৌঁছুনোর আগেই ঝগড়া আর গোলাগুলির আওয়াজে থামতে হলো ওকে। পাশের সেলুন থেকে একদল লোক বেরিয়ে এলো। একজন লোককে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে তারা।

কৌতূহলী হয়ে লোকগুলোর কাছাকাছি ঘোড়া নিয়ে গেল বেনন। দেখল লোকটার দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। বয়স খুব বেশি হলে পঁচিশ হবে। ভয়ে কাঁপছে। গলা চিরে বেরিয়ে আসছে আর্তচিৎকার।

'দোহাই তোমাদের, আমাকে মেরো না!' করুণা ভিক্ষা চাইছে সে। 'ঈশ্বরের দোহাই আমাকে মেরো না। আমি ওকে মারতে চাইনি!'

'কিন্তু ওকে তুমি পেছন থেকে গুলি করেছ,' গম্ভীর চেহারায় বলল একজন। 'এমনকি এই শহরেও পেছন থেকে গুলি করলে কাউকে ছাড়া হয় না।'

'ঝুলিয়ে দাও ওকে!'

'ফাঁসিতে চড়াও!'

'টুসনে কোন অ্যাম্বুশারকে চাই না আমরা!'

হুজুগে মেতে উঠেছে সবাই। লোকটাকে ফাঁসিতে না চড়ালেই নয়। তাকে নিয়ে যাওয়া হলো একটা ওয়্যারহাউজের সামনে। কোর্ট হাউজ থেকে বেশি দূরে নয় জায়গাটা। একটা বড় কটন উড গাছ আছে ওখানে। ডালে রশি বেঁধে ফেলল একজন। হৈ-হৈ করে উঠল সবাই। আরেকবার কেঁদে উঠল মৃত্যু পথ যাত্রী লোকটা।

'দোহাই তোমাদের, আমাকে মেরো না।'

'কি হয়েছে?' ভিড়ের একজনকে জিজ্ঞেস করল বেনন। 'কি করেছে লোকটা?'

হাসল মাতাল। বলল, 'সিলভার ডলার সেলুনে পেছন থেকে একজনকে গুলি করেছে।'

'সেজন্যেই ওকে ঝুলিয়ে দেয়া হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'শেরিফ কোথায়?' ব্যস্ত গলায় জানতে চাইল বেনন।

মাতালের হাসি চওড়া হলো। 'সে গেছে শহরের বাইরে।'

'ও! তার ডেপুটি?'

'সে-ও শহরের বাইরে।'

'আর এই সুযোগে তোমরা...'

মাথা নাড়ল মাতাল। 'শেরিফ ফিরে এসে খুশিই হবে। তার অনেক পরিশ্রম কমিয়ে দিচ্ছি আমরা।' কথা শেষে আবার অন্যান্যদের সঙ্গে ফাঁসি দেখায় মন দিল লোকটা।

নিরুপায় বেনন দেখল যুবকের গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দেয়া হয়েছে। একটা উঁচু টুলে দাঁড় করানো হয়েছে তাকে। টুলটা সরিয়ে নিলেই ঝুলে পড়বে যুবক।

কিছু করার নেই। অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকল বেনন। মানুষগুলো খুনের নেশায় পশুতে পরিণত হয়েছে। এখন ও গুলি করে দড়ি ছিঁড়ে দিতে পারে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। হাত বাঁধা অবস্থায় পালাতে পারবে না যুবক। নিজের বিপদ টেনে আনা হবে খামোকা। একটা সিক্সগান দিয়ে

এতগুলো মাতালকে ঠেকানো যাবে না। কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে, এভাবে একজনকে মরতে দেয়া যায় না।

ওকে ইতস্তত করতে দেখে ফেলল একজন লোক। অস্ত্র বের করে বুক বরাবর তাক করে বলল, 'আমি হলে ভুলেও কিছু করার কথা চিন্তা করতাম না, স্ট্রেঞ্জার। একজনের বদলে দু'জনকে ঝুলতে দেখলে খুশিই হবে সবাই।'

'আমাকে বিচার না করে ফাঁসি দিতে পারো না তোমরা!' ঝুলিয়ে দেয়ার আগে শুধু এই কথাটাই বলতে পারল যুবক।

মুখ ফিরিয়ে নিল বেনন।

ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে যুবকের চোখ। জিভটা বেরিয়ে এসে ঝুলছে। দাঁতের কামড়ে দু'টুকরো হয়ে গেল জিভ। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এলো মুখ থেকে। আস্তে আস্তে নিষ্প্রভ হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি। তিন মিনিটের মাথায় থেমে গেল সব নড়াচড়া।

যার যার কাজে যেতে লাগল দর্শকরা। চরিতার্থ হয়েছে তাদের পাশবিক জিঘাংসা। বেননের দিক থেকে অস্ত্র সরিয়ে নিয়ে চলে গেল বেঁটে খাটো লোকটা।

লিভারি স্টেবলে এসে হসলারের হাতে ঘোড়াটা তুলে দিল বেনন। অসুস্থ বোধ করছে ও। হোটেলের দিকে পা বাড়িয়ে দেখল রাস্তা পার হয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকছে মিড বাসটিয়ান।

দৃশ্যটা বেননকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল ও। একটু আগে কি দেখেছে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করতে করতে পা বাড়াল। কিছুটা কর্তব্য বোধ আর কিছুটা কৌতূহল ঠেলে নিয়ে চলল ওকে ব্যাঙ্কের দিকে। প্রথমে ও মনে করেছিল হোটেলের ঘরে এক লাখ ডলার রাখা কত বড় বোকামি তা বুঝতে পেরেছে মিড। কিন্তু পরে খেয়াল করে দেখল লোকটার হাতে কোন কার্পেট ব্যাগ দেখেনি ও। তারমানে লোকটা এখনও টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখেনি। তাহলে ব্যাঙ্কে কি করছে সে?

দুটো কাউন্টার আছে ব্যাঙ্কে। একটার লাইনে মিডকে দাঁড়াতে দেখে অন্যটার লাইনে গিয়ে দাঁড়াল ও। ব্যাঙ্কে বেশ কয়েকজন লোক আছে। একেবারে কোন কারণ ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকলে তাদের সন্দেহ হবে তাই ওয়ালেট থেকে বের করল একটা একশো ডলারের নোট।

মিডের আগের লোকটা বিদায় নিতেই টেলারের সামনে এসে দাঁড়াল সে। বলল, 'ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি। এক্ষুণি তাকে খবর দাও।'

দ্বিধার ছাপ পড়ল টেলারের চেহারায়। বলল, 'আমি দুঃখিত, কিন্তু...'

'তোমার দুঃখিত হতে হবে না,' কর্কশ স্বরে বলল মিড। 'যা বলছি তাই করো। খবর দাও ম্যানেজারকে। তুমি কি চাও সে একজন দামি খদ্দের হারাক?'

দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে কাউন্টার থেকে সরে পেছনের একটা দরজায় টোকা

দিল টেলার। তারপর দরজাটা খুলে মাথা ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। কি যেন বলে আবার ফিরে এসে দাঁড়াল কাউন্টারের সামনে। এক মুহূর্ত পরেই বেরিয়ে এলো ম্যানেজার।

লোকটা লম্বা। ছয় ফুটের কম হবে না। সেই তুলনায় অত্যন্ত চিকণ। ভারী পাওয়ারের চশমার কারণে তার ফ্যাকাশে নীল চোখ দুটো খুব বড় বড় দেখায়। শুকনো চেহারায় একটা চিন্তার ছাপ। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হলে তার চেহারায় চিন্তার ছাপ থাকতেই হবে। লোকটা জানে না পরবর্তী খদ্দের পকেটে টাকা নিয়ে আসবে নাকি পিস্তল।

'গুড আফটারনুন, স্যার।' মিডের সামনে দাঁড়িয়ে হাসল ম্যানেজার। 'আমরা আজকের মতো বন্ধ করে দিচ্ছিলাম। বলো কি করতে পারি তোমার জন্যে?'

'বড় একটা অফার নিয়ে এসেছি আমি।'

'তাহলে, সেক্ষেত্রে আমার অফিসে চলো। ওখানে বসে শোনা যাক...মিস্টার...'

'মিড বাসটিয়ান। শিকাগো থেকে এসেছি। নেড বাসটিয়ানের ভাই। নেডকে তো চেনো, নাকি?'

'অবশ্যই!' নিশ্চিন্ত দেখাল ম্যানেজারকে। কাউন্টার ফ্ল্যাপ ওপরে তুলে বাসটিয়ানকে ভেতরে ঢুকতে ইশারা করল সে। দু'জনে চলে গেল ম্যানেজারের ঘরে। হঠাৎ বেননের মনে হলো কে যেন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সচেতন হয়ে উঠল বেনন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ঘরের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে তার দিকেই চেয়ে আছে জেড ম্যানসেল, লেযি এ-র মালিক। লোকটার দৃষ্টিতে স্পষ্ট বৈরিতা।

তাড়াতাড়ি কাউন্টারে একশো ডলার রেখে ভাংতি চাইল বেনন। ডলার গুনে বুঝে নেয়ার সময়ে টের পেল এখনও তাকিয়ে আছে র‍্যাঞ্চ মালিক। সম্ভবত মনে করার চেষ্টা করছে কোথায় ওকে দেখেছে। মিড বাসটিয়ানের ব্যাপারে ওর অতি কৌতূহল লোকটার চোখে ধরা পড়েছে কিনা ভাবল ও।

ব্যাংক থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের ঘরে ফিরে এলো বেনন। ওর জানালা দিয়ে ব্যাঙ্ক বিল্ডিংটা দেখা যায়। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ব্যাঙ্কের ওপর চোখ রাখল সে। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলো মিড। রাস্তা পেরিয়ে পা বাড়াল হোটেলের দিকে। একটু পরই সিঁড়িতে লোকটার পায়ের শব্দ শুনতে পেল ও। তারপর বন্ধ হয়ে গেল পাশের ঘরের দরজা।

অজান্তেই দম আটকে রেখেছিল ও। এতোক্ষণে স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল। বিছানায় এলিয়ে দিল শরীরটাকে। বিশ্রাম দরকার ওর। পরিপূর্ণ দীর্ঘ বিশ্রাম। হথর্নের গরু কোথায় যায় ভাবতে ভাবতে ঘুমে দু'চোখ বুজে এলো ওর। ঘুমিয়ে পড়ল।

পাশের ঘরে ঝগড়ার আওয়াজ শুনে ঘুম ভাঙল। আঁধার নেমেছে। ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাতি না জ্বেলে চুপচাপ ঝগড়া শুনতে লাগল ও। তর্ক বিতর্ক হচ্ছে দুই ভাইয়ের মধ্যে।

'আমি বলছি খনিতে কিছু নেই,' অধৈর্য স্বরে বলল নেড। 'ওখানে টাকা ঢালার মানে খামোকা অপচয় করা।'

মিডের গলা শোনা গেল: 'আমার টাকা। ইচ্ছে হলে অপচয় করব আমি। তুমি নাক গলাবার কে? তাছাড়া এই একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসেছি আমি। খনির কাজ আমি চালু করবোই। আমি বলে দিচ্ছি শুনে রাখো, আজ থেকে দুই বছরের মধ্যে মিলিয়োনেয়ার হয়ে যাব আমরা।'

'দুই বছরের অনেক আগেই তুমি ফতুর হয়ে যাবে,' বলল নেড। 'টাকা যদি খাটাতেই চাও তাহলে গরুতে টাকা খাটাও। আগামী বছর এই সময়ে একেকটা গরুর দাম হবে কমপক্ষে বিশ ডলার। গরুর ব্যবসায়ে কোন ঝুঁকি নেই। ইচ্ছে করলে সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চটা কিনতে পারবে। নদীর ওপারের থ্রি স্টার তোমার হতে পারে। শুনলাম ভাল দাম পেলে টার্নার নাকি বেচে দেবে। বিশ হাজার ডলার পেলেই থ্রি স্টার বেচে দিয়ে পুবে চলে যাবে সে। নদীর এপারে থাকতে চাইলে হিলা ভ্যালির সবচেয়ে ভাল ঘাসজমি...'

'কতবার তোমাকে বলব যে গরুর ব্যবসায়ে আমার তিলমাত্র আগ্রহ নেই? আমি খনি চালু করব। তুমি সঙ্গে থাকলে ভাল, তা নাহলে আমি একাই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাব। সত্যি কথা বলতে কি কাজ আমি শুরুই করে দিয়েছি। আজকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বেইমারের সঙ্গে কথা বলে এসেছি। সে বলল, খুব ভাল হবে খনিতে কাজ শুরু হলে। তার ধারণা শহরে অনেক নতুন ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হবে।'

দুই ভাইয়ের মধ্যে তর্ক চলতেই থাকল। ধীরে ধীরে রেগে উঠল দু'জনই। এক পর্যায়ে টেবিলে ঘুসি বসিয়ে দিল মিড। কর্কশ স্বরে বলল, 'আর তোমার সঙ্গে একটা কথাও নয়। কালই আমি টাকাগুলো ব্যাঙ্কে জমা দেব। তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে থাকতে পারো, তা নাহলে তোমার র‍্যাঞ্চেও ফিরে যেতে পারো। সেক্ষেত্রে আমার কিছু বলার থাকবে না। কিন্তু একটা কথা আগেই বলে রাখছি, ছয় মাস পরে হামাগুড়ি দিয়ে এসে বোলো না তুমিও মাইনিং করতে চাও।'

দীর্ঘ একটা নীরবতা নামল পাশের ঘরে। তারপর খুলে গেল দরজা। পরক্ষণেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। বেনন বুঝল রাগ করে চলে গেছে নেড। ফোঁস করে শ্বাস ফেলল ও। যাক, একটা চিন্তা কমল। ডলারগুলো ব্যাঙ্কে জমা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মিড।

সাপারের জন্যে নিচে নেমে ও দেখল সেই আগের টেবিলেই বসে আছে নেড, মিড আর ন্যান্সি। আজকে সবাই গম্ভীর। থেমে থেমে ঠেকায় পড়ে কথা বলছে দু'ভাই। দু'জনেই সর্বক্ষণ কুঁচকে রেখেছে ভ্রূ। আগামী কালই নেড তার মেয়েকে নিয়ে চলে যাবে, বুঝতে দেরি হলো না বেননের। আজই যেত, সন্ধে হয়ে না গেলে।

খাওয়া শেষ করে এনেছে এমন সময় জেড ম্যানসেলকে ঘরে ঢুকতে দেখল বেনন। দরজার কাছেই একটা টেবিলে বসল সে।

লোকটা এখানে কি করছে বুঝে পেল না বেনন। জেডের র‍্যাঞ্চ এখান

থেকে বিশ মাইল দূরেও নয়। তাছাড়া র‍্যাঞ্চ থেকে গরু চুরি যাচ্ছে এমন একটা সময়ে লোকটার হোটেলে এক রাত থেকে যাওয়া কেমন যেন অস্বাভাবিক। শ্রাগ করল বেনন। হয়তো একদিনের জন্যে নিজেকে ছুটি দিয়েছে র‍্যাঞ্চার।

গোঁফওয়ালা র‍্যাঞ্চারের বেশ উৎসাহ আছে মিডের ব্যাপারে। লোকটাকে দু'ভাইয়ের দিকে তাকাতে দেখে বুঝতে পারল বেনন। ওকেও দেখে ফেলেছে লোকটা। চেহারায় কিসের যেন ছাপ পড়ল ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারল না ও, তার আগেই খাওয়ায় মন দিল লোকটা। আবার যখন তাকাল তখন চোখে তার স্পষ্ট বৈরিতা। এখনও মনে করার চেষ্টা করছে কোথায় সে বেননকে দেখেছে।

কিছুক্ষণ পর খাওয়া শেষ করে উঠে চলে গেল লোকটা। কয়েক মিনিট পরে টেবিল ছেড়ে ফয়ারে এসে দাঁড়াল বেনন। তারপর বেরিয়ে এলো হোটেল থেকে। সাইডওয়াকে দাঁড়িয়ে তাকাল রাতের আকাশে। অজস্র নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলছে। ঝিরিঝিরি বাতাসে বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ। জেগে উঠছে টুসন।

রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলোতে আলো জ্বলছে। রাস্তায় এসে পড়েছে সেই আলো। ভালই পথ চলা যায়। শুধু গলিগুলোতে অন্ধকার। বেনন খেয়াল করল খুব কম লোকই গলিতে ঢুকছে। আর যারা বোর্ডওয়াক ধরে এগোচ্ছে, গলি পার হবার সময়ে অজান্তেই তারা একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিচ্ছে। কোথায় আততায়ী তস্কর লুকিয়ে বসে আছে কেউ বলতে পারে না। প্রায় সকালেই টুসনের গলিতে মৃত দেহ পাওয়া যায়।

সাইডওয়াকের প্রান্তে এসে একটু চমকে গেল বেনন। মনে হলো জেড ম্যানসেলকে দেখল। লোকটা ওকে দেখেনি। ঢুকে গেছে একটা গলির মধ্যে। অনুসরণ করল বেনন। গলিমুখের একপাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল। দেখল তিনজন লোক গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে আলাপ করছে। তাদের একজন জেড ম্যানসেল কিনা নিশ্চিত হতে পারল না বেনন। এতই আস্তে তারা কথা বলছে যে গলার আওয়াজ পেলেও বুঝতে পারল না। কথা শেষ হতেই একজন চলে গেল গলির আরও গভীরে, বাকি দু'জন হাঁটতে লাগল প্রধান সড়কের দিকে।

তাড়াতাড়ি সরে বেশ খানিকটা দূরে একটা বাড়ির ছায়ায় এসে দাঁড়াল বেনন। দেখতে চায় কারা এরা।

লোক দু'জন বেরতেই তাদের চিনতে পারল সে। একজন বিগ বিল রেনো, আরেকজন তার সঙ্গী ম্যাকলাস্কি। ম্যাকলাস্কির হাতে ধবধবে সাদা ব্যান্ডেজ।

ভ্রূ কুঁচকে গেল বেননের। নিশ্চিত হবার কোন উপায় নেই যে এই দু'জন ম্যানসেলের সঙ্গে কথা বলছিল। তবু ওর মন বলছে তৃতীয় লোকটা জেড ম্যানসেলই ছিল। কি যেন একটা অস্বাভাবিকতা আছে তিনজনের আজকের এই সাক্ষাতের ভেতর। অস্বস্তিবোধ ওকে পেয়ে বসল। জেড ম্যানসেল ফ্লাইং জে-র মালিক। তার সঙ্গে বিগ বিল রেনো আর ম্যাকলাস্কির মতো গুণ্ডাদের কিসের এতো আলাপ?

বেননের কেন যেন মনে হলো বিগ বিল রেনো আর ম্যাকলাস্কি গরু চুরির

সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িত। তা নাহলে টাকা পায় কোথা থেকে? এটুকু নিশ্চিত যে, কোন কাজ করতে তাদের দেখা যায় না। লিঞ্চিঙের পর শেরিফ আসতেই তার সঙ্গে দেখা করেছে বেনন। শেরিফের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছে এরা দু'জন শহরেই ঘুর ঘুর করে। ইচ্ছে মতো মদ খায় আর মারামারি করে বেড়ায়।

এরা যদি গরু চুরির সঙ্গে জড়িতই হয়, সেক্ষেত্রে ম্যানসেলের সঙ্গে এদের সদ্ভাব না থাকাই স্বাভাবিক; কারণ ম্যানসেলও গরু হারাচ্ছে। তবুও পারলে এদের তিনজনের ওপর নজর রাখবে ঠিক করল বেনন। এর ওর কাছে দু'একটা প্রশ্ন করে দেখা যেতে পারে। তবে সাবধান থাকতে হবে ওকে। কিছুতেই কাউকে জানতে দেয়া যাবে না আসলে পিঙ্কারটন এজেন্সির হয়ে কাজ করছে সে।

গলির মুখে দাঁড়িয়ে হোটেলের দিকে তাকাল রেনো আর ম্যাকলাস্কি। বোঝা গেল না ওকে তারা দেখেছে কিনা। কি যেন বলল রেনো তার সঙ্গীকে। জবাবে হাসল লোকটা। একটু পরই একসঙ্গে পা বাড়াল দু'জন। ঢুকে গেল সবচেয়ে কাছের সেলুনটাতে।

হোটেলে, নিজের ঘরে ফিরে এলো বেনন। খুব ক্লান্ত লাগছে নিজেকে ওর। ওয়াশস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। জানালা দিয়ে ভেসে আসছে হৈ-হল্লার আওয়াজ। কাছেই কোন একটা সেলুনে বাজছে পিয়ানো। একটা কুকুর ডেকে উঠল নেকড়ের অনুকরণে।

চোখ বন্ধ করল বেনন। এক মিনিট পূর্ণ হবার আগেই তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

৬

কতক্ষণ ঘুমাতে পেরেছে জানে না ও, কিন্তু কিসের শব্দে ঘুম ভেঙেছে তাতে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই। পায়ের আওয়াজ পেয়েছে ও ঘরের বাইরে, করিডরে।

বিছানায় আধবসা হয়ে কান পাতল বেনন। এতরাতে হোটেলের করিডরে কারও হাঁটাটা অস্বাভাবিক নয়। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বেরতেই পারে মানুষ। কিন্তু বেননের কাছে যেটা অস্বাভাবিক লেগেছে সেটা হলো লোকটার সতর্কতা। এত সাবধানে হোটেলে হাঁটে না কেউ। কারও ঘুমে ব্যাঘাত ঘটছে কিনা তা চিন্তা করতে বয়েই গেছে লোকের। কিন্তু এই লোকটা খুব সাবধানী। এতই সাবধানী যে কাউকে শুনতে দিতে চায় না পায়ের আওয়াজ। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন?

বেননের মনে পড়ল, ঘুমানোর আগে ঘরের দরজায় তালা দেয়নি ও। টুসনে বুদ্ধিমান লোক ঘুমের সময় কখনও দরজায় তালা না দিয়ে ঘুমায় না। আলগোছে পাশে রাখা চেয়ার থেকে সিক্সগানটা তুলে নিল বেনন। বাইরে ক্ষয়া চাঁদের আলো। জানালা পথে জ্যোৎস্না ঢুকছে। সেই আলোয় ফার্নিচার আর দরজাটা আবছা মতো দেখা যাচ্ছে।

এক সেকেন্ডের জন্যে থামল পায়ের আওয়াজ। যেন টের পেয়েছে জেগে

গেছে বেনন। তারপর আবার হলো পায়ের আওয়াজ।

লোকটা যে-ই হোক জুতো নেই, খালি পায়ে হাঁটছে। আওয়াজটা একটু পরই মিলিয়ে গেল। নিশ্চিন্তে বালিশে হেলান দিল বেনন। অপেক্ষা করছে। আবার ফিরে আসবে লোকটা। তিন মিনিটের মাথায় ফিরে আসার খসখস আওয়াজ পেল ও। পাশের ঘরের দরজার হাতলটা ঘুরল ক্লিক শব্দে। ওই ঘরেই আছে মিড বাসটিয়ান।

মুচকি হাসল বেনন। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়েছিল লোকটা। টাকা খোয়াবার ভয়ে খালি পায়ে গেছে যাতে কেউ টের না পায় যে সে ঘরে নেই।

কিন্তু তাহলে তো দরজাটা বন্ধ হবার কথা! হাসি উধাও হয়ে গেল বেননের মুখ থেকে। বন্ধ করা হয়নি দরজাটা। অথবা হয়েছে, এতই নিঃশব্দে যে ও শুনতেই পায়নি। নাকি খোলেইনি দরজাটা? অন্য কেউ চেষ্টা করে দেখল খুলতে পারে কিনা?

মেঝেতে পা নামাল বেনন। দেখতে চায় আসলে কি ঘটছে। বিছানায় বসে শুধু শুধু সময় নষ্ট না করাই উচিত।

আবার পাওয়া গেল খসখস আওয়াজটা। চলে যাচ্ছে দূরে। মনে মনে বেনন প্রার্থনা করল যাতে আওয়াজ না করে দরজাটা। করল না। উঁকি দিল বেনন। কোন আলো নেই করিডরে। কিন্তু একেবারে অন্ধকার হয়ে নেই জায়গাটা। সিঁড়ির বাঁকে একটা কেরোসিন লণ্ঠন জ্বলছে। সেটার আলোর ছটায় করিডরে একটা আবছা অন্ধকার তৈরি হয়েছে। বেনন দেখল করিডরের শেষ মাথার কাছে একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল ভেস্ট আর আন্ডারপ্যান্ট পরা একজন লোক। এত দূর থেকে লোকটাকে ও ঠিক চিনতে পারল না। কিন্তু অবয়ব আর হাঁটার ভঙ্গি কেন যেন বেশ পরিচিত মনে হলো ওর।

লোকটা আর দরজা খুলে করিডরে বেরল না। আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল বেনন। পাশের ঘর থেকে ভেসে এলো মিড বাসটিয়ানের নাক ডাকার আওয়াজ। বোঝা গেল লোকটা টের পায়নি যে তার দরজার ওপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ করেছে কেউ একজন। এক লাখ ডলার হোটেল কক্ষে রেখে নিশ্চিন্তে নাক ডাকাচ্ছে বাসটিয়ান।

নিজের ওপর আর অবিচার করল না বেনন। শুয়ে পড়ল। মোজা পরা লোকটা হয়তো টয়লেট থেকে ফেরার পথে ঘরের দরজা চিনতে ভুল করেছে। কিন্তু তাহলে এত সাবধানতা কিসের? ঠিক যেন খাপ খায় না। অনেক সম্ভাবনাই আসছে ওর মাথায়। সব চিন্তা মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিল ও। মিড সুস্থ আছে, টাকাগুলো ঘরেই আছে, এর বেশি কিছু ওর আর জানার প্রয়োজন নেই। কালকেই লোকটা ব্যাঙ্কে জমা দেবে ডলার। ব্যস, নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে সে, মন দেবে গরু চুরির রহস্য উদ্ঘাটন করতে।

চোখ বুজে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল বেনন।

দশ মিনিট পার হবার আগেই আবার বিছানায় চমকে লাফিয়ে উঠতে হলো ওকে। এবার আর সাবধানী পায়ের শব্দ নয়, কেউ একজন গলা ফাটিয়ে

চেঁচিয়ে উঠেছে।

'আগুন! আগুন! আগুন লেগেছে!'

ছয়

পোশাক পরে নিয়েই দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে এলো ও। করিডর ভরে আছে ঘন কালো ধোঁয়ায়। ধোঁয়ার স্তর পাক খেয়ে খেয়ে উঠে যাচ্ছে ছাদের দিকে।

করিডরের দু'পাশের দরজাগুলো একে একে খুলে যাচ্ছে। চেঁচামেচি হৈ-হুলস্থুল শুরু হয়ে গেল। একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করছে কি হয়েছে। জবাব দিতে পারল না কেউ। ঘুমিয়ে ছিল সবাই। কয়েকজনকে দেখা গেল আতঙ্কিত হয়ে ধোঁয়ার মধ্যে ছুটোছুটি করছে। কারও পরনে আন্ডারওয়্যার, কারও পরনে নাইট শার্ট আবার কেউ বা উলঙ্গ।

ধোঁয়া ভরা বাতাসে পোড়া কাঠের গন্ধ। সেই গন্ধকে ছাপিয়ে উঠেছে কেরোসিনের ঝাঁঝাল গন্ধ।

হঠাৎ করিডরের শেষ মাথায়, স্টেয়ারকেসের দিক থেকে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। বেনন দেখল হোটেলের ম্যানেজার ছুটে আসছে। সম্মিলিত গোলযোগ ছাপিয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর।

'আরে গাধার দল, পানির ব্যবস্থা করো! পানি আনো! গাধা নাকি তোমরা, পুরো হোটেলে আগুন ধরে যাবে তো!'

ভেড়ার পালের মতো তার দিকে ছুটে গেল লোকজন। এতোক্ষণে বুঝতে পেরেছে কি করা উচিত।

ধোঁয়া সবচেয়ে বেশি সিঁড়ি ঘরের কাছে। ওখানে পটপট শব্দে পুড়ছে শুকনো কাঠ। বেননের পাশের ঘরের কামরা খুলে গেল। দরজায় এসে দাঁড়াল মিড। ঘুম থেকে উঠে আসায় তার চুল এলোমেলো হয়ে আছে। পরনে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা একটা নাইট শার্ট। ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে দেখার চেষ্টা করল সে। জিজ্ঞেস করল, 'হচ্ছেটা কি এখানে?'

একজন লোক টয়লেট থেকে পানির বাকেট নিয়ে সিঁড়ি ঘরের দিকে ছুটে গেল। পরমুহূর্তেই সবাই ছুটল পানির বাকেটের খোঁজে। কেরোসিন আর পোড়া কাঠের গন্ধের সঙ্গে পানিতে ভেজা পোড়া কাঠের গন্ধ যোগ হলো। ছ্যাঁত ছ্যাঁত আওয়াজ করে নিভতে শুরু করল আগুন। সাদা ধোঁয়ায় করিডর ভরে গেল। প্রত্যেকটা ঘরের দরজা খোলা। ফলে ঘরগুলোতে ধোঁয়া ঢুকতে লাগল।

'দরজাগুলো বন্ধ করো কেউ একজন!' গলা ফাটিয়ে চেঁচাল ম্যানেজার। 'একবার ঘরে আগুন লাগলে পুরো হোটেলে আগুন ছড়িয়ে পড়বে।'

মিড বাসটিয়ানকে পা বাড়াতে দেখল বেনন। লোকটা করিডরে বেরিয়েই

ধাক্কা খেল একজনের সঙ্গে। তাল সামলাতে পারল না। হোঁচট খেয়ে পিছিয়ে গিয়ে পড়ে গেল ঘরের ভেতর। মাথা ঠুকে গেল ওয়াশস্ট্যান্ডে। বেশ জোরেই বোধহয় লেগেছে। কারণ আবার করিডরে বের হতে বেশ দেরি হলো লোকটার। তারপরও আগুন নেভাতে গেল সে।

ততোক্ষণে নিভে গেছে আগুন। দল বেঁধে ফিরে আসছে সবাই।

'ঠিক মতো ধরতেই পারেনি,' বেননকে দরজায় দাঁড়ানো দেখে বলল মিড। 'আগুন কম, ধোঁয়াই বেশি। হুক থেকে একটা লণ্ঠন খসে পড়েছিল।'

'খসে পড়েনি।' ঘোষণা দিল ম্যানেজার। 'কেউ একজন আগুন লাগিয়ে দিতে চেয়েছিল হোটেলে। হুক থেকে লণ্ঠনটা খুলে আগুন লাগানো হয়েছে। এমনি এমনি পড়লে সেই আওয়াজ কারও না কারও কানে যেত।'

'এই শহরে ওরকম ছোটখাট আওয়াজ কারও কানে যাবে না,' তিক্ত কণ্ঠে বলল একজন বোর্ডার। 'আর এই হোটেলে তো অসম্ভব। সারা রাত পায়ের শব্দ, হৈ-হল্লা আর নাক ডাকার আওয়াজের চোটে মাথা খারাপ হবার জোগাড়।' বিরক্ত চেহারায় দু'জন লোককে তাদের ঘরে ফিরতে দেখল সে। তারপর দড়াম করে লাগিয়ে দিল নিজের দরজা।

হোটেল ম্যানেজারকে একা রেখে যে যার নিজের ঘরে ফিরে গেল বোর্ডাররা।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল মিড বাসটিয়ান। লোকটা দরজায় তালা মারছে, আওয়াজে বুঝতে পারল বেনন। ঘরে ঢুকতে গিয়েও হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় আসায় ম্যানেজারকে ডাক দিল ও। জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি কি লণ্ঠনটা হুকে ঝোলানো ছিল, কেউ একজন ফেলে দিয়েছে?'

'বিশ্বাস না হলে তুমি নিজে গিয়ে দেখতে পারো,' ঝাঁজের সঙ্গে বলল ম্যানেজার।

লোকটার সঙ্গে করিডর ধরে স্টেয়ারকেসে পৌঁছুল বেনন। দেখল দেয়ালে গেঁথে আছে একটা বড় হুক। ওটার ঠিক নিচেই পড়ে আছে একটা লণ্ঠন। কন্টেইনারটা খালি। বার্নারটা কে যেন ঢিলে করে দিয়েছে। কাঁচটা ভেঙে গেছে। গড়িয়ে পড়া তেলে সহজেই আগুন লেগেছে।

'নিজের চোখে তো দেখলে, এবার বলো ওটা আপনা আপনি পড়েছে!' বলল ম্যানেজার। 'লণ্ঠনটা জাহাজের লণ্ঠন। হারিকেন হলেও হুক থেকে ওটা খসে পড়ার কথা নয়। তাছাড়া পড়লে টের পেতাম। আমি জেগেই ছিলাম।' বেননের দিকে তাকাল লোকটা। 'তুমি কোন শব্দ পেয়েছ?'

'না।' মোজা পরা সেই লোকটার কথা মনে পড়ল ওর। লোকটা বিশ মিনিট আগে ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। সে কি কিছু জানে? সত্যি কি কেউ হোটেলে আগুন লাগিয়ে দিতে চেয়েছিল? যদি তাই হয় তাহলে কেন, কি তার উদ্দেশ্য? কোন জবাব জানা নেই বেননের।

'সকাল বেলা পোড়া দেয়াল দেখতে আরও খারাপ লাগবে,' গজগজ করে বলল ম্যানেজার। 'বুঝি না লোকগুলোর মাথায় কি আছে। মাতাল হয়ে জুয়া খেলে ফতুর হয়েও পোষাচ্ছে না, এখন তারা নিজেদের কাবাব বানানোর চেষ্টা

করছে! করুক, কিন্তু অন্য কোথাও গিয়ে করুক, তাহলেই আর কোন মাথা ব্যথা থাকে না আমার।'

আপন মনে কথা বলতে বলতে চলে গেল লোকটা। নিজের ঘরে ফিরে এলো বেনন। ঘরের মধ্যে ধোঁয়ার কটু গন্ধ। ছাইয়ের হালকা স্তর পড়েছে আসবাবপত্রের ওপর। জানালা খুলে পরিষ্কার বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা করল ও।

বাইরে রাস্তাটা জনশূন্য, নীরব। ভূতুড়ে দেখাচ্ছে তারার আলোয়। মিডের জানালার দিকে তাকিয়ে বেনন দেখল এখনও জানালাটা বন্ধ করেই রাখা আছে। হাসল বেনন। ঘরে ধোঁয়া থাকুক আর না থাকুক, এক লাখ ডলার ঘরে রেখে কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না লোকটা।

তৃতীয়বারের মতো বিছানায় শুয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করল বেনন। সারাটা দিন ঘোড়া দাবড়েছে, তারওপর প্রায় সারারাতই উত্তেজনায় কেটেছে; এত ক্লান্তি জীবনে কখনও লাগেনি ওর। চোখ বন্ধ করতেই নেমে এলো রাজ্যের ঘুম।

কি ঘটতে যাচ্ছে জানলে যত ক্লান্তই হোক কিছুতেই ঘুমাতে পারত না ও।

সাত

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল ওর। নাস্তা এখনও তৈরি হয়নি, নিচতলায় নোংরা সাদা অ্যাপ্রন পরা এক লোক মেঝে মুছছে, এছাড়া আর কারও দেখা পাওয়া গেল না।

বাইরে, শহরটা অবশ্য ধীরেসুস্থে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। স্টোর মালিকরা গত দিনের ধুলো ময়লা ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করছে। হিচ র‍্যাকে সারারাত না খেতে পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়াগুলো চিঁহি হ্রেষাধ্বনি করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তাদের মালিকরা মাতাল হয়ে পড়ে আছে বোর্ডওয়াকে। নেশা কাটিয়ে এখন উঠছে একজন দু'জন করে।

তামাক কিনতে জেনারেল স্টোরে গিয়ে বেনন দেখল কয়েকজন ইতিমধ্যেই ওখানে পৌঁছে গেছে। বেশির ভাগই ফ্রেইটার আর মাইনার, শহর ছাড়ার আগে রসদ কিনতে এসেছে।

একটা কাউন্টারে ভারী চেহারার এক ওয়্যাগনার দোকান মালিকের সঙ্গে তর্ক করছে।

'তুমি কি বলতে চাও তোমার দোকানে কোন লবণ নেই? কোন্ জাতের স্টোর কীপার তুমি যে লবণ পর্যন্ত রাখোনি? ছয় সপ্তাহ কি আমি লবণ ছাড়া কাটাব নাকি!'

'দুঃখিত।' কাঁধ ঝাঁকাল দোকান মালিক। 'এক ফোঁটা লবণও নেই। দুইশো পাউন্ড ছিল, জেড ম্যানসেল সব কিনে নিয়ে গেছে। ফিনিক্স থেকে আগামী ফ্রেইট ট্রেন আসার আগে লবণ আর পাওয়া যাবে না।'

'দইশো পাউন্ড!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল ওয়্যাগনার। 'দুইশো পাউন্ড লবণ

দিয়ে কি করবে লোকটা?'

শ্রাগ করল দোকান মালিক। 'জেড বলল একটা সল্ট লিক বানাবে। কোথায় যেন পড়েছে গরুর জন্যে লবণ অত্যন্ত জরুরী।'

'তোমার উচিত ছিল অন্য খদ্দেরদের কথা একটু ভাবা,' অভিযোগের সুরে বলল ওয়্যাগনার।

'আমার কি, জিনিস বিক্রি হলেই হলো,' সাফ জানিয়ে দিল স্টোর কীপার।

উপযুক্ত জবাব খুঁজে না পেয়ে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে চলে গেল ওয়্যাগনার।

তামাক কিনে লিভারি স্টেবলে এলো বেনন। ওকে দেখে ঘুম চোখে অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এলো হসলার। টাকা বুঝে নিয়ে কালকের সেই ঘোড়াটায় স্যাডল চাপিয়ে বলল, 'তুমি যদি এখানেই থাকবে স্থির করে থাকো, তাহলে ঘোড়াটা তোমার কিনে নেয়াই উচিত হবে। তোমার জন্যে কম দামে ওকে ছেড়ে দেব আমি। একশো ডলার।' অনুসন্ধিৎসু চোখে বেননের দিকে তাকাল সে।

মাথা নাড়ল বেনন। 'বেশিদিন এখানে থাকব না।'

'স্যাডলটা বিনে পয়সায় দিয়ে দেব,' কণ্ঠস্বরের কৌতূহল লুকানোর চেষ্টা করে বলল হসলার। 'সপ্তাহ খানেক যদি থাকো, ঘোড়াটা ভাড়া নেয়ার চেয়ে কিনে নেয়া তোমার জন্যে অনেক কম খরচের হবে।'

আবার মাথা নাড়ল বেনন। 'হয়তো কালকেই চলে যাব। কবে যাব তার কোন ঠিক নেই, কাজেই ঘোড়াটা কিনব না। দুঃখিত।'

স্টেবল থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ে হিলা ভ্যালির দিকে এগোল বেনন। বিগ বিল রেনো, ম্যাকলাস্কি আর জেড ম্যানসেল সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা প্রয়োজন, অনুভব করছে ও অন্তর থেকে। কারও মনে কৌতূহল আর সন্দেহ না জাগিয়ে লোকগুলোর ব্যাপারে জানতে হলে হথর্নের কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোন গতি নেই।

দ্রুত ঘোড়া ছোটাল বেনন। ফ্লাইং জে-এর র‍্যাঞ্চ হাউজটা চোখে পড়তেই সিদ্ধান্ত বদলে রওয়ানা দিল খনির দিকে। রেঞ্জের ওপর দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথে চলেছে ও। খনিটা অমোঘ এক আকর্ষণে টানছে ওকে। তাছাড়া ওখানে মরুভূমিতে গরুর ট্র্যাক লুকানোও সহজ হবে। ওর ওদিকে যাওয়ার সেটাও একটা কারণ।

খনিটার সুড়ঙ্গের সামনে ঘোড়া থেকে নামল বেনন। ঘোড়া না বেঁধেই তক্তা দিয়ে বন্ধ টানেলের দিকে পা বাড়াল।

এমন কোন চিহ্ন নেই যা দেখে মনে হতে পারে গত বিশ বছরে খনির মুখটা খোলা হয়েছে। তক্তাগুলো প্রায় ঢেকে গেছে ঝোপঝাড়ের একগাদা মরা ডাল আর টাম্বলউইডের কারণে। দু'পাশের বোল্ডারের গায়ে বেঁচে থাকার জন্যে লড়াই করছে কয়েক গুচ্ছ ঘাস।

কয়েকটা ডাল সরিয়ে তক্তার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল বেনন। নাকে এলো পরিত্যক্ত খনির ভ্যাপসা গন্ধ। গুহাতে গভীর অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা গেল না।

'কেউ আছ? কেউ আছ? কেউ আছো?'

প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো বেননের গলা। ভূতুড়ে গুহায় ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে মিলিয়ে গেল আওয়াজটা।

ঘোড়ার কাছে ফিরতে গিয়ে বালির তলায় ঢাকা পড়া রেলে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল বেনন। হাতটা অজান্তেই বাড়িয়ে দিল ও পতনের সময়ে। একটা হাত পড়ল গিয়ে রেলের ওপর। বালি উড়ে যেতেই রেলটা পরিষ্কার দেখা গেল।

সেদিকে তাকাতেই আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর পেশি। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে রেলটা ভাল মতো দেখল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে রেল ধরে সামনে বাড়ল। মাঝে মাঝেই রেলের বালু সরিয়ে দেখছে।

রাইফেলের গুলিটা যখন এলো তখন বেনন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। ওর মাথার ওপর দিয়ে বিইঙঙ শব্দে চলে গেল গুলিটা। বালু সরিয়ে রেল দেখতে না ঝুঁকলে নির্ঘাত মারা পড়ত। বেঁচে গেল কপাল জোরে। গুলিটা যেই করুক, করেছে খুন করতে চায় বলেই।

বিস্ময় কাটিয়ে উঠেই লাফ দিয়ে একটা বোল্ডারের আড়ালে সরে গেল বেনন। সামলে নিয়ে তাকিয়ে দেখল যে নিচু জমিতে ও আছে, তার দুইশো গজ দূরে টিলার ওপর থেকে করা হয়েছে গুলিটা। পাথরের আড়াল থেকে হালকা নীলচে ধোঁয়া বেরচ্ছে।

চারপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারল বেনন, এখান থেকে না সরে কোন উপায় নেই। দ্বিতীয়বার সুযোগ পেলে আততায়ী হয়তো গেঁথে ফেলতে পারবে ওকে। আর এখানে থাকলে সুযোগ পাবেই। শুধু বাঁকা চাঁদের মতো টিলাটায় এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যেতে হবে লোকটাকে। জান বাঁচাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে খনির মুখের কাছে সরে যাওয়া। সেক্ষেত্রে দু'পাশে উঁচু বোল্ডারের আড়াল পাবে ও। তাছাড়া ওর ঘোড়াটা ওখানে আছে।

বাইরে বেরনোর ঝুঁকিটা বেনন নেবে বলে স্থির করল।

এক লাফে উঠে দাঁড়িয়েই খনির দিকে দৌড় দিল ও। গন্তব্য মাত্র বারো গজ দূরে, কিন্তু এই মুহূর্তে ওই দূরত্বটাই চাঁদে যাবার সমান। অন্তত তিনটে গুলি করার সুযোগ পাবে আততায়ী।

বিরতি না দিয়েই পরপর পাঁচটা গুলি বেননের পায়ের সামনের মাটিতে মাথা খুঁড়ল। অ্যাম্বুশ যে দু'জন মিলে করছে তাতে ওর মনে কোন সন্দেহ রইল না।

সিক্সগান বের করেই ধোঁয়া লক্ষ্য করে দুটো গুলি করল বেনন। কারও গায়ে লাগবে আশা করেনি ও। লাগলও না। পাথরে লেগে পিছলে গেল গুলি। টিলাটক্করে প্রতিধ্বনি শুনে মনে হলো সারা উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ছে আওয়াজটা।

অদৃশ্য ঘাতকের ষষ্ঠ গুলি বেননের কাঁধের চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। খনিমুখের সামনে একটা বোল্ডারের আড়াল নিয়ে ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখল ও। গুরুতর কিছু নয়, তবে জ্বলছে জায়গাটা। যারাই ওকে গুলি করুক, তিক্ত

মনে ভাবল বেনন, লোকগুলো অভিজ্ঞ রাইফেলবাজ নয়। ওদের জায়গায় ও নিজে হলে যে কাউকে তিনবার অন্তত এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারত। বিগ বিল রেনো আর ম্যাকলাস্কির কথা চিন্তা করল বেনন। ওরা দু'জন টিলার ওপরে থেকে থাকলে এরকম আনাড়ির মতো গুলি করার একটা কারণ পাওয়া যায়। রেনো মার খেয়ে ভূত হয়েছে, ফলে ওকে দেখে তাড়াহুড়োয় হয়তো তাক ঠিক রাখার কথা মনে ছিল না। আর ম্যাকলাস্কির তো কব্জি ভেঙে গেছে, কাজেই সে-ও ঠিক মতো গুলি করতে পারবে না।

তবুও লোকগুলো সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। যতক্ষণ দিনের আলো থাকছে ওকে এখানেই আটকে রাখতে পারবে তারা। আর গুলির শব্দে কেউ যদি এসেই পড়ে, তাহলে ঘোড়ায় চড়ে চম্পট দিতে কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়! কেউ টিলায় ওঠার আগে যথেষ্ট সময় পাবে তারা।

প্রায় এক ঘণ্টা বোল্ডারের পেছনে অসুবিধেজনক অবস্থানে অপেক্ষা করে বসে থাকল বেনন। আউট-ল জীবনে বহুবার প্রাণে বেঁচেছে সে ধৈর্য ধরার কারণে। এখনও তার ব্যতিক্রম হলো না। রাইফেলের গুলির ফাঁকে ফাঁকে সিক্সগান দিয়ে জবাব দিতে লাগল ও। ওর মনে ধারণা জন্মাল যে হয়তো রেনো আর ম্যাকলাস্কি আছে টিলার ওপরে, বোল্ডারের আড়ালে। কিন্তু কেন তারা এখানে ওর ওপর হামলা করে বসল তা বেনন মাথা খাটিয়েও বুঝতে পারল না।

দোকানে মার খাওয়ার প্রতিশোধ? তাই যদি হয়, তাহলে ভাল জায়গাতেই এসে আক্রমণ করেছে লোক দুটো। কিন্তু এই ঝুঁকি নেয়ার কি দরকার ছিল? শহরেই তো ওকে রাতের বেলায় সুযোগ বুঝে শেষ করে দিতে পারত তারা। আসলেই রেনো আর ম্যাকলাস্কি কিনা তাই বা কে জানে!

আর খনিতে এসেছে বলে যদি আক্রমণ করা হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে লোক দু'জন হিলা ভ্যালিতে রাসলিঙের সঙ্গে জড়িত। হথর্ন ছাড়া ওর আসল পরিচয় কেউ জানে না, কিন্তু ও যে গরু চুরির ব্যাপারে তদন্ত করছে তা হয়তো কোন কাউহ্যান্ডের মুখ থেকে আততায়ীরা শুনেছে। তাছাড়া পরপর দু'দিন খনির কাছে আসায় ওর ওপর লোকগুলোর সন্দেহ তৈরি হয়ে থাকতে পারে।

সূর্যটা মাথার ওপরে ওঠায় তেতে উঠল চারপাশ। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে ওকে! অস্বস্তিকর একটা অবস্থা। গুলির শব্দে ফ্লাইং জে থেকে কেউ আসুক, মনে প্রাণে প্রার্থনা করল বেনন। কিন্তু ঈশ্বর বোধহয় ধারে কাছে নেই, ওর প্রার্থনা শুনলেন না তিনি।

মার্কসম্যান দু'জন যতক্ষণ টিলার ওপরে আছে, ওকেও ততোক্ষণ এখানেই থাকতে হবে। অবশ্য আরেকটা ঝুঁকি নিয়ে দেখতে পারে। ঘোড়াটা কয়েকগজ দূরেই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছে করলে ঘোড়ায় চেপে পালানোর একটা চেষ্টা করা যায়। কিন্তু অনেক বড় একটা টার্গেট পাবে লোকগুলো সেক্ষেত্রে। খুব খারাপ তাকের লোকও অনায়াসে ফেলে দিতে পারবে ঘোড়াটাকে। এতক্ষণ তারা ঘোড়াটাকে কেন গুলি করেনি সেটাই

একটা বিস্ময়। ওদের জায়গায় বেনন হলে ঘোড়াটার সামনে পেছনে গুলি করে ভড়কে দিত, যাতে ওটা পালায়।

কি করবে সিদ্ধান্তে আসতে পারল না বেনন। সারা দিন এখানে কাটানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওর। সামনে জরুরী কাজ পড়ে আছে। শেষ পর্যন্ত যা হয় হবে এরকম একটা মন নিয়ে তৈরি হয়ে গেল ও। ঝুঁকি আছে ওর পরিকল্পনায়, কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায়ও নেই।

বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো বেনন। এমন ভঙ্গিতে সিক্সগান তাক করল যেন দেখতে পেয়েছে টার্গেটকে।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। গুলিটা লাগল বেননের মাথার দু'ইঞ্চি ওপরে কাঠের তক্তায়। কিন্তু হাত থেকে সিক্সগান ফেলে দিল বেনন। দেহটা ঘুরে গেল আধপাক। একটা আর্তচিৎকার করেই মুখ থুবড়ে বোল্ডারের পেছনে মাটিতে পড়ে গেল ও। ভাব দেখে মনে হলো বুকে গুলি খেয়েছে।

আড়ালে আছে টের পেতেই সিক্সগানটা আবার তুলে নিল ও। হাতটা বুকের তলায় রেখে পড়ে থাকল উপুড় হয়ে। কেউ কাছে এলেই ঝটকা দিয়ে চিৎ হয়ে গুলি করতে পারবে।

বোল্ডারের পেছন থেকে আধবোজা চোখে টিলার দিকে তাকিয়ে থাকল ও।

কেউ বেরল না। কোন কিছু ঘটল না। বিশ মিনিট অপেক্ষা করল বেনন। প্রতিটা মুহূর্ত টানটান হয়ে থাকল ওর পেশি। মাথার খানিকটা অংশ বের হয়ে আছে ওর। প্রতি মুহূর্তে ভয়ে ভয়ে কাটাল যে একটা শেষ বুলেট ওর পেছনে খরচা করবে লোকগুলো। ওর মনে কোন সন্দেহ নেই যে ও সত্যি মরেছে কিনা দেখতে অ্যাম্বুশার দু'জন আসবেই। বালুময় জমিতে লোকগুলো এলেই দু'জনকে সিক্সগানের নাগালে পাবে ও।

কিন্তু কিছুই ঘটল না। কেউ এলো না। ওরা বিশ্বাস করেছে যে বেনন মারা গেছে। তা নাহলে দ্বিতীয়বার গুলি করত বা দেখতে আসত। কিন্তু দুটোর কোনটাই না করে সংবত চলে গেছে লোক দুটো। কারা এই আক্রমণের পেছনে দায়ী তা আন্দাজ করলেও নিশ্চিত ভাবে জানার আর কোন উপায় নেই।

আরও আধঘণ্টা পরে ধীরে ধীরে উঠে বসল বেনন। কেউ গুলি ছুঁড়ল না।

ঘোড়াটাকে ধরে স্যাডলে বসল ও। ফিরে চলল টুসনের দিকে। মত পাল্টেছে, হথর্নের র‍্যাঞ্চে আর যাবে না। আজকের আবিষ্কার ওর চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। আরও ভাবনার জন্যে সময় দরকার। তাছাড়া ও দেখতে চায় শহরে রেনো আর ম্যাকলাস্কি আছে কিনা। যদি দেখা হয় তাহলে তারা কি রকম প্রতিক্রিয়া দেখায় সেটাও জানা জরুরী।

ফেরার পথে দু'জন ফ্রেইটার আর একজন কাউবয়কে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না ও। এরা আক্রমণকারী হতে পারে না।

শহরে ঢুকেই ও বুঝতে পারল কিছু একটা ঘটেছে। ইউনিয়ন প্যাসিফিক হোটেলের সামনে লোকের ভিড়। ঘোড়াটা স্টেবলে রেখে এসে হোটেলে

ঢোকার সময় রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি করে ঢুকতে হলো ওকে। ফয়ারে হোটেলের ম্যানেজারের দেখা পাওয়া গেল। ফ্যাকাশে হয়ে আছে লোকটার চেহারা।

সামনে গিয়ে দাঁড়াল বেনন। জিজ্ঞেস করল, 'আবার কিছু ঘটেছে নাকি, আগুন লেগেছে আবার?'

'না,' ভাঙা গলায় বলল ম্যানেজার। মাথা নাড়ল। 'এবার আগুন লাগেনি। খুন হয়েছে এক বোর্ডার।'

'খুন? কোথায়? হোটেলে?'

'হ্যাঁ।' সিঁড়ি দেখাল ম্যানেজার। 'শেরিফ আর তার ডেপুটি এখন তদন্ত করছে।'

হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল বেননের। মনে হলো ওটাকে খামচে ধরেছে কেউ। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ও, 'কে মারা গেছে?'

লোকটা জবাব দেয়ার আগেই মন থেকে জবাব পেয়ে গেল ও।

প্রায় অভিযোগ করার ভঙ্গিতে বেননের দিকে তাকাল ম্যানেজার। বলল, 'মিড বাসটিয়ান। তোমার পাশের ঘরের লোকটা। এগারো নম্বরের বোর্ডার। সকালে তার ভাই ঘরে গিয়ে দেখে বুকে কে যেন একটা ছুরি গেঁথে মিড বাসটিয়ানকে মেরে রেখে গেছে।'

আট

কথা না বাড়িয়ে সোজা দোতলায় উঠে এলো বেনন। মিড বাসটিয়ানের ঘরের দরজা খোলা। ভিড় করেছে অনেক মানুষ। লম্বা বলে তাদের মাথার ওপর দিয়ে তাকাতে সুবিধে হলো বেননের। দেখল শুকনো মুখে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে নেড, ন্যান্সি আর অপরিচিত তিনজন লোক। তাদের একজনের পোশাক দেখে ডাক্তার বলে মনে হয়।

কয়েকজনকে ঠেলেঠুলে ঘরে ঢুকে পড়ল ও।

সাদাচুলো ডাক্তারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে টুসনের শেরিফ জিম টাকার আর তার ডেপুটি। ডাক্তার ঝুঁকে আছে বিছানার ওপর। বাকি দু'জন পাশ থেকে দেখছে।

বেনন ঘরে ঢুকতেই সিধে হয়ে কালো ব্যাগের মুখ বন্ধ করল ডাক্তার। হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিল তার কিছু করার নেই। মুখে বলল, 'আমি দুঃখিত। সব সাহায্যের বাইরে চলে গেছে লোকটা।'

'কখন মারা গেছে, ডাক্তার?'

'অন্তত সাত-আট ঘণ্টা আগে। অভিজ্ঞ লোকের কাজ। একেবারে হৃৎপিণ্ডে গেঁথে দিয়েছে ছুরিটা।'

আরেকটু কাছে গিয়ে বিছানার দিকে তাকাল বেনন। মিড বাসটিয়ান শুয়ে

আছে। ছুরিটা আমূল বসিয়ে দেয়া হয়েছে বুকে। পরনের নাইটশার্ট শুকনো রক্তে খয়েরী হয়ে গেছে। ব্ল্যাংকেটও রক্তে ভেজা। বিকৃত মুখে ব্যথা আর আতঙ্কের ছাপ। শূন্যে তাকিয়ে আছে নিষ্প্রাণ দৃষ্টি মেলে। মরার আগে বোধহয় বুঝতে পেরেছিল কি ঘটতে যাচ্ছে।

লোকগুলো হঠাৎ করেই বেননের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। শেরিফ বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

'কি চাও এখানে?' কড়া গলায় জানতে চাইল সে। 'একে তুমি চেনো?'

'না।' সাবধানতা অবলম্বন করল বেনন। 'তবে একে আমি গত পরশু স্টেট এক্সপ্রেস থেকে নামতে দেখেছি। যতদূর জানি এর নাম মিড বাসটি...'

'সেসব আমরাও জানি,' থামিয়ে দিল শেরিফ। 'আমি জানতে চাইছি এর সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল কিনা।'

মাথা নাড়ল বেনন। 'আমরা অবশ্য একই ট্রেনে শিকাগো থেকে এসেছি। ওর পাশের ঘরটাই আমার।'

শেরিফের দৃষ্টিতে আগ্রহ দেখা দিল। 'ওর পাশের ঘরটাই তোমার? তাহলে বলো এই ঘটনা সম্বন্ধে কি জানো।'

'কিছুই না।' টাকা খোয়া গেছে কিনা জিজ্ঞেস করার কথা মনে এলেও প্রশ্নটা করল না বেনন। বলল, 'আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি যে কাল রাতে যখন হোটেলে আগুন লাগল তখনও লোকটা বেঁচে ছিল।'

'কি করে জানলে?'

'আর সবার সঙ্গে সে-ও করিডরে বেরিয়ে এসেছিল।'

'হ্যাঁ, আগুনের কথা আমি শুনেছি,' চিন্তিত স্বরে বলল শেরিফ। 'আমার মনে হয় তলে তলে কিছু একটা ঘটছে এখানে।' চোখ ভরা সন্দেহ নিয়ে বেননের দিকে তাকাল সে। 'তুমি বলছ তুমি বাসটিয়ানের সঙ্গে এক ট্রেনে এসেছ। সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তুমি টাকার ব্যাপারে কিছু জানো?'

'কিসের টাকা?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল বেনন।

আরও সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠল শেরিফ। 'তুমি বলতে চাও এত পথ একসঙ্গে এসেও পুরানো কার্পেট ব্যাগটার ব্যাপারে কিছুই জানো না?'

হাতের ইশারায় ঘরের কোনা দেখাল সে। ওখানে মুখ খোলা অবস্থায় পড়ে আছে মিড বাসটিয়ানের কার্পেট ব্যাগ।

'আমাদের মধ্যে খুব একটা কথাবার্তা হয়নি,' ধীরে ধীরে বলল বেনন। 'যতটুকু হয়েছে, তাতে বুঝেছি পুরনো একটা রূপার খনিতে আবার খনন করতে টুসনের হিলা ভ্যালিতে আসছে সে।'

'আর তুমি কেন এসেছ?'

'আমি একজন ক্যাটল-বায়ার...'

দরজার কাছ থেকে হোটেলের রিসেপশন ক্লার্ক বলে উঠল, 'লোকটা বলছে তার নাম জি. জোন্স।'

'হ্যাঁ, জর্জি জোন্স,' বিড়বিড় করে বলল বেনন।

ক্লার্কের দিক থেকে বেননের দিকে তাকাল শেরিফ। 'তুমি যদি

বাসটিয়ানের পাশের ঘরেই থেকে থাকো তাহলে খবরটা এতক্ষণে পেলে কেন?'

'ভোরেই আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম। হিলা ভ্যালি থেকে গরু দেখে একটু আগে এসেছি।'

'তারমানে তুমি খুনের ব্যাপারটা এখানে এসে জানতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ।'

'রাতে কোন শব্দ শুনতে পাওনি?'

'না। আগুন নিভে যাবার পর যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি আমরা। ঘরের দরজায় তালা মারার আগে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল বাসটিয়ান।' কথাটা বলেই চমকে গেল বেনন। আরে তাইতো, লোকটা ঘরে ঢুকে তালা আটকে দিয়েছিল!

একই চিন্তা শেরিফের মাথাতেও এসেছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'দরজা বন্ধ করেছিল এটা কি তুমি নিশ্চিত ভাবে জানো?'

'হ্যাঁ। শব্দ পেয়েছি, কাজেই সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।'

লাশের ওপর থেকে ঘুরে এলো শেরিফের দৃষ্টি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'অথচ আজকে সকালে দরজাটা বন্ধ ছিল না। নাস্তার টেবিলে আসতে দেরি করছে দেখে ওপরে উঠে এসে ওর ভাই দেখে যে এই অবস্থা।'

'আর জানালা, ওই পথে কেউ আসেনি তো?' প্রশ্নটা করেই বেননের মনে পড়ে গেল মিডের জানালা রাতে সে বন্ধ দেখেছিল। অবশ্য তার মানে এই নয় যে পরে কেউ বাইরে থেকে এসে জানালা খুলে ভেতরে ঢুকতে পারবে না। জানালার নিচেই একফুট চওড়া কার্নিস আছে। হালকা-পাতলা লোক হলে কাজটা করা সম্ভব।

'জানালা বন্ধ ছিল,' বলল শেরিফ। 'লোকটা যে-ই হোক, জানালা পথে আসেনি সে। আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না যে বাসটিয়ান দরজাটা পরে খুলেছিল বা শুনতে তোমার কোন ভুল হয়েছে?'

'শুনতে আমার ভুল হয়নি,' দৃঢ়স্বরে বলল বেনন। একটু থেমে বলল, 'তুমি বলছ তার কাছে অনেক টাকা ছিল। সেক্ষেত্রে দরজায় তালা দেয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক।'

'হ্যাঁ, অনেক টাকা ছিল তার কাছে,' এতক্ষণে মুখ খুলল নেড বাসটিয়ান। ফ্যাকাশে হয়ে আছে তার চেহারা। কিন্তু বেননের দিকে যখন তাকাল, দৃষ্টিতে ফুটে উঠল সন্দেহ। জানতে চাইল কর্কশ স্বরে, 'মিস্টার...জোন্স, তুমি কি জানো ঠিক কত টাকা ছিল আমার ভাইয়ের সঙ্গে?'

'না।' মিথ্যে বলল বেনন। এখনও নিজের পরিচয় প্রকাশ করার সময় আসেনি।

'এক লাখ ডলার,' তিক্ত স্বরে বলল নেড। 'এক লাখ ডলার – নগদ টাকায়। আমি জানি, কারণ আমাকে আর ন্যান্সিকে দেখিয়েছিল ও।'

'তাহলে তো লোকটাকে বোকা বলতে হয়,' সোজা সাপ্টা নিজের মতামত

জানাল ডাক্তার। 'টুসনের মতো জায়গায় যে লোক পকেটে দুই ডলারের বেশি রাখে সে বোকা ছাড়া আর কি? নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে এনেছে লোকটা।' নেডের দিকে তাকাল সে। 'তোমার তো বলা উচিত ছিল...'

'সবই ওকে আমি বুঝিয়ে বলেছি,' ডাক্তারকে থামিয়ে দিয়ে বলল নেড। 'আজকে সকালেই ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়ার কথা ছিল ওর। গতকালই ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করে এসেছিল।' গলা কেঁপে গেল নেডের। 'এত দেরি না করে আগেই যদি টাকাটা ও ব্যাঙ্কে জমা দিত...' কথা শেষ করতে পারল না সে।

সহানুভূতির দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখল শেরিফ টাকার। এতক্ষণ চুপ করে ফ্যাকাশে চেহারায় দাঁড়িয়ে ছিল ন্যান্সি। এবার সে বেননের দিকে আঙুল তাক করে বলল, 'আমার ধারণা এই লোক মিথ্যে কথা বলছে। এই লোক ডলারের কথা জানত। মিড চাচাকে সর্বক্ষণ অনুসরণ করতে দেখেছি একে। এমনকি গতকাল সাপারের সময়েও আমাদের পাশের টেবিলে বসেছিল। একবারের জন্যেও চাচার ওপর থেকে নজর সরায়নি।'

'আরে, তাইতো!' মেয়ের কথায় সায় দিল নেড। 'যেদিন মিড আমাদের ডলারের কথা বলেছিল সেদিনও এলোক পাশের টেবিলে বসে ছিল। নিশ্চয়ই আমাদের সমস্ত কথা শুনেছে। তাছাড়া মিড দরজা বন্ধ করেছিল তার নিশ্চয়তা কি? এমনও তো হতে পারে আগুন লাগার পর উত্তেজনার মাথায় তালা মারতে ভুলে গিয়েছিল। তারপর হয়তো মিড ঘুমাতেই এই লোক ওর ঘরে ঢুকে ওকে খুন করেছে।' গলা চড়ে গেল নেডের। শেরিফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওকে জিজ্ঞেস করো এত সকালে কেন বাইরে...'

'আমি আগেও বলেছি,' তাকে থামিয়ে দিল বেনন। 'হিলা ভ্যালিতে গরু দেখতে গিয়েছিলাম আমি।'

'আবার এমনও হতে পারে ডলারগুলো লুকাতে বাইরে বেরনো তোমার জন্যে জরুরী হয়ে পড়েছিল।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে বিদ্ধ করল নেড।

নেডের বক্তব্যকে সমর্থন করে ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। পরিস্থিতি সুবিধের নয়। লোকজনের মনমেজাজের হঠাৎ এই পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত লিঞ্চিঙে গড়াতে পারে।

অধৈর্য কণ্ঠে বলল বেনন, 'ফালতু কথা বাদ দাও, বাসটিয়ান। তোমার ভাইকে মেরে ডলার নিয়ে চলে গেলে আবার এখানে আসার ঝুঁকি নিতাম আমি?'

'হয়তো নিয়েছ, ভেবেছ এতে করে তোমার ওপর থেকে আমাদের সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।' চেহারায় একগুঁয়েমি নিয়ে বেননের দিকে তাকিয়ে থাকল নেড।

'যথেষ্ট হয়েছে, থামো তোমরা!' ধমক দিল শেরিফ। 'কি শুরু করেছ, নেড? প্রমাণ ছাড়া কাউকে এভাবে দায়ী করা যায় না। খুনটা কে করেছে সেটা আমরা ঠিকই জানব, হয়তো সময় লাগতে পারে; তবে কাউকে অভিযুক্ত করা বাদ দাও, ওটা আইনের এক্তিয়ার।'

'কে খুন করেছে জানলেও মিড চাচা আর ফিরে আসবে না,' ফোঁপাতে শুরু করল ন্যান্সি। মুখ গুঁজে দিল বাবার কাঁধে।

মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চোখে বিতৃষ্ণা নিয়ে বেননের দিকে তাকিয়ে থাকল নেড।

বেনন বুঝে পেল না মেয়েটার দুঃখ কতটুকু আন্তরিক আর কতটুকু ভণিতা। জনি উইলিয়ামসের সঙ্গে যেরাতে ন্যান্সি কথা বলেছিল সেরাতে চাচার ওপর মেয়েটাকে সন্তুষ্ট বলে মনে হয়নি ওর। তাছাড়া শেরিফ যদি জানে দুই ভাইয়ের মধ্যে টাকা খাটানো নিয়ে ঝগড়া চলছিল তাহলে ব্যাপারটা কোন্ দৃষ্টিকোণে দেখবে সে? নেড বাসটিয়ানের উপযুক্ত কারণ আছে ভাইকে হত্যা করার। এর চেয়ে অনেক কম টাকার জন্যেও মানুষ মানুষকে খুন করে।

নেড যদি তার ভাইকে সত্যি খুন করে থাকে তাহলে দরজা খোলা থাকার রহস্যের একটা সমাধান পাওয়া যায়। ও যে মিডকে দরজায় তালা লাগাতে শুনেছে এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এমনও তো হতে পারে পরবর্তীতে পরিচিত কারও গলা পেয়ে সে দরজা খুলে দিয়েছিল?

কিন্তু তাহলেও রহস্যের সমাধান করা যাচ্ছে না। ভাইয়ের ডাকে মিড যদি দরজা খুলেও থাকে, তারপরও তার বিছানায় শুয়ে থাকাটা বেমানান। এমন তো হতে পারে না যে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে নেডকে সে বলেছে যে আমাকে ছুরি মারো। তাহলে? মিডের চেহারায় আতঙ্ক দেখে বোঝা যায় অকস্মাৎ আঘাত হানা হয়েছে। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে নেড খুনী। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, ঘুমন্ত অবস্থায় মিডকে জখম করা হয়েছে। জেগে উঠেই মারা গেছে লোকটা।

কি ভাবছিল শেরিফকে বলতে গিয়েও থেমে গেল বেনন। ওর মন বলল এখন এসব সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলার সময় নয়। তাছাড়া ও নিজেও বিশ্বাস করতে পারছে না যে নেড টাকার জন্যে ভাইকে খুন করার মতো মানুষ। যত ঝগড়াই হোক দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ সত্ত্বেও দুই ভাইয়ের মধ্যে আন্তরিকতায় কোন ঘাটতি ছিল না। অন্তত ওর চোখে পড়েনি।

শেরিফের কথায় বেননের চিন্তায় ছেদ পড়ল।

শেরিফ বলল, 'নেড আর তোমাকে আমার সঙ্গে অফিসে আসতে হবে। কথা আছে তোমাদের সঙ্গে। এখানে সবার সামনে বলতে চাই না।'

'মিডের কি হবে?' জানতে চাইল নেড। বিছানার দিকে তাকিয়ে কালো হয়ে গেল চেহারা। 'ওকে এভাবে আর কতক্ষণ ফেলে রাখবে?'

শার্টের হাতায় বোতাম লাগিয়ে কোটটা গায়ে চাপিয়ে নিল ডাক্তার। তারপর বলল, 'এ নিয়ে চিন্তা কোরো না, আমি করোনারকে খবর দিয়ে দেব, সে এসে ওকে ফিউনারাল পার্লারে নিয়ে যাবে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তো আজকেই হবে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকিয়ে শেরিফের পিছু নিল নেড। তার সঙ্গে চলল বেনন। ন্যান্সিও আসছে পিছু পিছু।

হোটেল থেকে বেরিয়ে ওরা দেখল রাস্তায় এখনও জটলা করে দাঁড়িয়ে

আছে লোকজন। বিগ বিল রেনো আর ম্যাকলাস্কি আছে কিনা দেখার জন্যে ওদের ওপর নজর বোলাল বেনন। দেখতে পেল না। কাঁধে হাত দিল ও। কালো কোটের কারণে ক্ষতটা দেখা যাচ্ছে না। ওটা দেখার মতো কেউ এখন টুসনে নেইও। সবাই এখন বাসটিয়ানের হত্যা রহস্য নিয়ে মেতে আছে।

ওরা প্রায় শেরিফের অফিসের সামনে চলে এসেছে এমন সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল। ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলো লেযি এ-র মালিক, জেড ম্যানসেল। উত্তেজনায় লাল হয়ে আছে তার চেহারা। দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে শেরিফের কনুই আঁকড়ে ধরল সে। অন্য হাতটা বেননের দিকে তাক করে চেঁচিয়ে বলল, 'এতক্ষণে ওকে চিনেছি আমি! ও হচ্ছে কুখ্যাত আউট-ল! রক বেনন ওর নাম!'

নয়

'রক বেনন!'

'শুনেছ তোমরা? এই লোক রক বেনন! মন্ট্যানার আউট-ল!'

'এতক্ষণে বুঝলাম কে মিডি বাসটিয়ানকে খুন করেছে।'

বুকের খাঁচায় লাফ মারল বেননের হৃৎপিণ্ড। ভিড়ের ওপর থেকে ঘুরে এলো ওর দৃষ্টি। দেখল লোকজনের চেহারায় রাগ আর ঘৃণার ছাপ ফুটে উঠেছে। এদের কেউই বেননকে সামনে থেকে দেখেনি, তবে নাম শুনেছে। যখন আউট-ল ছিল অন্তত ছয়টা স্টেটে নাম ছড়িয়ে পড়েছিল ওর। এদের প্রায় কেউই জানে না বেননকে ক্ষমা করা হয়েছে। আর জানলেও গুরুত্ব দেয়ার মতো মানসিক অবস্থায় নেই এখন জনতা।

তিন দিক থেকে এগিয়ে এলো ভিড়টা। সবাই কিছু না কিছু বলছে। প্রায় প্রত্যেকের চেহারাতেই বিদ্বেষ। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল একজন, 'ঝুলিয়ে দাও! ঝুলিয়ে দাও খুনীটাকে!'

এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো শেরিফ জিম টাকারের কাছ থেকে বেননকে ছিনিয়ে নিতে যাচ্ছে উন্মত্ত জনতা। কিন্তু বাধা দিল টাকার। লোকটা ধীরস্থির আর একটু কম বুদ্ধির হলেও দু'বছর হলো টুসনের শেরিফ। এতদিন আর কেউ শেরিফ হিসেবে এশহরে টিকে থাকতে পারেনি। কপাল ভাল বলে নয়, লোকটার সাহস, ব্যক্তিত্ব, নিষ্ঠা আর একগুঁয়েমি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

সামনে বেড়ে বেননকে আড়াল করে দাঁড়াল সে। হাতে বেরিয়ে এসেছে কুৎসিত চেহারার একটা নাকবোঁচা বড়সড় কোল্ট। অস্ত্রটা জটলার ওপর তাক করে ধমকে উঠল সে, 'খবরদার! পিছিয়ে যাও সবাই। যে এক পা আগে বাড়বে গুলি খেতে হবে তাকে।'

'কিন্তু তুমি শুনেছ জেড ম্যানসেল বলছে এই সেই কুখ্যাত আউট-ল রক বেনন!'

'সেটা জেড ম্যানসেলের ব্যক্তিগত মতামত। তার কথার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ আছে? নেই। আর তোমাদের জানা উচিত, এ যদি রক বেননও হয় তাতেও আইনের কিছু বলার নেই। রক বেননকে কয়েকবছর আগেই ক্ষমা করা হয়েছে। যতক্ষণ না কোন কিছু প্রমাণ করতে পারছ অস্ত্রের ওপর ভুলেও হাত দিয়ো না, নাহলে বুট হিলে তোমাকে কবর দিতে হবে।' বেননের দিকে তাকাল শেরিফ। 'জেড ম্যানসেলের কথা কি সত্যি, তুমি আসলেই রক বেনন?'

'না।' দৃঢ় কণ্ঠে বলল বেনন।

'মিথ্যে বলছে! লোকটা মিথ্যে বলছে!'

'ও স্বীকার করবে ভেবেছ?'

'ঝুলিয়ে দাও বদমাশটাকে!'

নানা রকম মন্তব্য শোনা গেল ভিড়ের মাঝে।

ভয়ঙ্কর চেহারার অস্ত্রটা এদিক ওদিক নাড়ল শেরিফ। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ডেপুটি রলিন্স। সে-ও পিস্তল বের করে ফেলেছে। প্রয়োজনে গুলি করতে দ্বিধা করবে না। বেননের ডান হাতটা ওর কোল্ট ফরটি ফাইভের ওপর আলতো করে রাখা।

খেপে আছে জনতা। এখন যদি ওরা বেননকে নিরস্ত্র অবস্থায় পেত নিঃসন্দেহে টেনে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দিত। কোন শুনানির ধার ধারত না কেউ। সবাই ধরেই নিয়েছে যে বেনন খুনী। কিন্তু প্রাণের মায়া সবারই আছে। শেরিফকে তারা চেনে। এক কথার মানুষ। একবার যখন সতর্ক করেছে বিনা দ্বিধায় গুলি করবে লোকটা।

বাধ্য হয়ে অসন্তুষ্ট চেহারায় পিছিয়ে গেল লোকগুলো। শেরিফের ঠোঁটে ফুটে উঠল বিজয়ীর মৃদু হাসি।

'আমি যতক্ষণ টুসনের শেরিফ, ততক্ষণ কোন লিঞ্চিং চলবে না,' ভিড়ের উদ্দেশে বলল সে। 'সেদিনের ঘটনায় যারা যারা দায়ী তাদেরও খুঁজে বের করে জেলে পুরব আমি।' বেনন, নেড আর ন্যান্সির উদ্দেশে হাত নাড়ল সে। 'তোমরা আমার অফিসে গিয়ে অপেক্ষা করো। ডেপুটি তোমাদের নিয়ে যাবে। অনেক প্রশ্নের জবাব চাই আমার।...রলিন্স, তুমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, কেউ যদি গায়ের জোরে ঢোকার চেষ্টা করে তো মাথায় গুলি করবে, যাতে দ্বিতীয়বার গুলি করতে না হয়।'

অফিসে গিয়ে বসল ওরা। ঘরটা বেশ বড়। একদিকে কয়েকটা সেল, আরেক দিকে কাগজের স্তূপে ঢাকা শেরিফের টেবিল।

ঝড়ের গতিতে কাজ করছে বেননের মাথা। ম্যানসেলের কথাকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করতে হলে শেরিফকে জানাতে হবে যে সে আসলে পিঙ্কারটন এজেন্সির এজেন্ট। কিন্তু তা এখনই চাইছে না ও। একবার কথাটা প্রচার পেয়ে গেলে রাসলারদের ধরার আশা ছেড়ে দিতে হবে।

মিড বাসটিয়ানের মৃত্যু সবকিছু কেমন যেন ওলট পালট করে দিল। নিজেকে দোষ দিল বেনন। আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল ওর। উইলিয়াম

পিঙ্কারটনের দেয়া দায়িত্বটা পালনে সে ব্যর্থ হয়েছে, বাঁচাতে পারেনি লোকটাকে। তারওপর ডলারগুলোও গায়েব হয়ে গেছে। গোটা ব্যাপারটা ব্যক্তিগত পরাজয় হিসেবে দেখল বেনন। বিশ্বাস করে ওকে কাজটা দিয়েছিল পিঙ্কারটন। এখন নিশ্চিত করতে হবে যাতে রাসলাররা ধরা পড়ে। ওদের ধরতে পারলে অন্তত খানিকটা সান্ত্বনা নিয়ে ফিরে যেতে পারবে সে। তবে অপবাদের হাত থেকে বাঁচতে হলে খুনীকে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো এবং ডলারগুলো উদ্ধার করাটাও অত্যন্ত জরুরী, তা নাহলে লুইস জে. লালের মতো নিয়মিত এজেন্টরা বলতে পারে যে টাকাগুলো সে-ই মেরে দিয়েছে। ও জানে লাল ওকে দু'চোখে দেখতে পারে না। আউট-ল জীবনে কয়েকবার লালকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছে সে।

শেরিফের গলার আওয়াজে চটকা ভাঙল ওর। দেখল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে শেরিফ। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে জেড ম্যানসেল।

'ম্যানসেলের কথা কি মিথ্যে, তুমি আসলে রক বেনন নও?' জানতে চাইল শেরিফ।

'আমি বেননকে জীবনেও সামনে থেকে দেখিনি,' বলল বেনন। মনে মনে বলল, *মিথ্যে বলিনি, আয়নায় দেখি তাকে দাড়ি কামাতে গেলেই, কিন্তু সামনে থেকে আজও বেননকে দেখা হয়ে ওঠেনি। হবেও না কোনদিন।* 'না,' আবার বলল ও, 'আমি জর্জি জোন্স। শিকাগোতে থাকি। ম্যানসেলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সে কখনও ওখানে গেছে কিনা, সে বলল যায়নি। তাহলে আমার চেহারার সঙ্গে মিল আছে এমন কাউকে হয়তো কোথাও দেখেছে সে। তোমার মনে যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহলে নাথানিয়েল হথর্নকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। আমি গরু দেখতে গতকাল তার র‍্যাঞ্চে গিয়েছিলাম।'

'তারপরও আমি বলব ও রক বেনন,' বলল ম্যানসেল। আরও রেগে গেল লোকটা। লাল হয়ে গেল চেহারা। রাগ চেপে বলল, 'মন্ট্যানায় আমি রক বেননকে অ্যাকশনে দেখেছি, এ-ই সেই লোক তাতে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

'তাহলে বলতে হয় বেনন প্রায় আমার মতোই দেখতে,' মন্তব্য করল বেনন।

শেরিফের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'আমি শপথ করে বলতে পারি ও-ই রক বেনন। টাকার লোভে মিড বাসটিয়ানকে খুন করেছে ও।'

মাথা নাড়ল শেরিফ। বলল, 'আমি দুঃখিত, জেড, কিন্তু তুমি শপথ করলেও আইনত ওকে আমি আটকে রাখতে পারি না। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো। তোমার কথার বিপরীতে তার কথা, এবং তুমি কোন কিছুই প্রমাণ করতে পারছ না, এই অবস্থায় আমি কারও পক্ষ নিতে পারি না। তবু দেখছি, দাঁড়াও।' ড্রয়ার হাতড়ে একগাদা হলদে ওয়ান্টেড পোস্টার বের করল শেরিফ। সেরেছে, মনে মনে বলল বেনন।

'থাকলে এর মধ্যেই বেননের ছবি থাকবে,' বিড়বিড় করে বলল টাকার। কয়েক মিনিট পরে মাথা নাড়ল। 'নাহ্, এখানে বেননের ছবি নেই। তবে

তাতে কিছু যায় আসে না। আমার জানা আছে যে ক্যালামিটি রিভারের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার সময় অনেক লোকের জীবন বাঁচানোয় ওকে ক্ষমা করা হয়েছে।'

'যাই বলো, মিডকে যে ও খুন করেছে তাতে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই,' বলল ম্যানসেল। 'সেই শিকাগো থেকে ওকে অনুসরণ করে এসেছে লোকটা। পাশের ঘরে উঠেছে যাতে সহজেই ওর ওপর নজর রাখা যায়। তারপর সুযোগ বুঝে...' কথা শেষ না করে ভ্রূ নাচাল র‍্যাঞ্চার। 'তুমি আর কি প্রমাণ চাও, শেরিফ?'

টাকার কিছু বলার আগেই এবার মুখ খুলল নেড। বলল, 'তুমি সন্তুষ্ট হলেও আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি, শেরিফ। আমার মতামত হলো ওকে অন্তত সন্দেহজনক তৎপরতার জন্যে আটকে রাখতে পারো তুমি। আমি চাই না আমার ভাইয়ের খুনী বাইরে ঘুরে বেড়াক বা পালিয়ে যাক।'

'কি ধরনের সন্দেহজনক তৎপরতা?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল বেনন। 'হোটেলের একডজন বোর্ডারের মধ্যে যে কেউ কাজটা করে থাকতে পারে।'

'কেউ টাকার কথা জানত না,' বলল নেড, 'জানতাম শুধু ন্যান্সি, আমি আর তুমি।'

'কথাটায় খানিকটা সত্যতা আছে,' স্বীকার করল বেনন। তারপর বলল, 'তবে টাকার কথা আমিও জানতাম না।'

কথাটার মানে কি দাঁড়ায় অনুভব করে মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল ঘরের সবাই। টকটকে লাল হয়ে উঠল নেডের চেহারা। রাগ সামলাতে না পেরে সামনে বেড়ে বেননকে ঘুসি মেরে বসল সে। কিন্তু মাঝপথেই তাকে জাপটে ধরে ফেলল শেরিফ।

ন্যান্সি ফুঁপিয়ে উঠল। তারপর মুখ থেকে হাত সরিয়ে কড়া গলায় জানতে চাইল, 'তুমি কি বলতে চাও আমার বাবা মিড চাচাকে খুন করেছে?'

'আমি কি বলেছি সেকথা?' পাল্টা প্রশ্ন করল বেনন। 'আমি শুধু ঘটনা প্রবাহের সত্যতা তুলে ধরেছি।'

হাত উঁচু করে সবাইকে থামতে ইশারা করল শেরিফ। তারপর বলল, 'ঝগড়া করে কারও কোন লাভ হবে না।' বেননের দিকে তাকাল সে। 'তুমি কি নিশ্চিত, রাতে মিড বাসটিয়ান দরজায় তালা দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে হয়তো কেউ একজন আরেকটা চাবি জোগাড় করে নিয়েছিল। হোটেলে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করে ব্যাপারটা জেনে নিতে পারব। আবার এমনও হতে পারে রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার পর ফিরে এসে মিড আর দরজায় তালাই দেয়নি। সে যাই হোক, আমি চাই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তিনজন শহরের বাইরে যাবে না।' বেনন, নেড আর ন্যান্সির দিকে তাকাল শেরিফ।

'কিন্তু...' কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল ন্যান্সি।

প্রতিবাদ করে উঠল নেড। 'আমাকে যেতেই হবে। এমনিতেই অনেক দেরি করে ফেলেছি। শুধু উইলকে র‍্যাঞ্চে রেখে দু'দিন আমার শহরে থাকাটা

মোটেও উচিত হয়নি।'

'দুঃখিত,' বলল গম্ভীর শেরিফ। 'তোমাকে থাকতেই হবে, অন্তত করোনারের কাছ থেকে আমি অটপসি রিপোর্ট পাওয়ার আগে পর্যন্ত।'

'করোনারের রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করে লাভ হবে কিছু?' জিজ্ঞেস করল ন্যান্সি। মেয়েটার চোখে মুহূর্তের জন্যে আশংকার ছায়া দেখতে পেল বেনন। 'আমরা জানি মিড চাচাকে···খুন করা হয়েছে।'

'আত্মহত্যাও করে থাকতে পারে,' গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল টাকার। 'সেক্ষেত্রে খুনীকে খোঁজার দরকার পড়বে না। সেজন্যেই করোনারের রিপোর্ট দরকার।'

'কি যা-তা বলছ!' রেগে গেল বাসটিয়ান। 'কোন দুঃখে আমার ভাই আত্মহত্যা করতে যাবে!'

'আমি তা বলিনি,' বলল শেরিফ। 'তবু নিয়ম নিয়মই, আইন তো আমি বানাইনি, তবে আইনের প্রয়োগ করা আমার কর্তব্য। সাক্ষী হিসেবে তোমাদের তিনজনকে আমার দরকার, সেজন্যেই আমি পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত শহরে থাকতে হবে তোমাদের।'

'তোমার পরবর্তী নির্দেশটা কখন দেবে তুমি?' তীব্র ব্যঙ্গ ঝরল নেডের কণ্ঠে।

উপেক্ষা করল শেরিফ। 'হয়তো আগামী কাল।···তোমরা বরং এখন হোটেলে ফিরে যাও। হোটেলেই থাকবে, প্রয়োজনের সময় যাতে খোঁজ করে পাওয়া যায়।'

'আর আমি কি করব?' জানতে চাইল ম্যানসেল।

হাতের ইশারায় দরজা দেখাল শেরিফ। 'তোমাকে আটকে রাখার কোন কারণ ঘটেনি। তবে একটা ব্যাপারে সাবধান। লোকজনকে জর্জি জোন্সের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করলে, এবং সেজন্যে কেউ আহত বা নিহত হলে তোমাকে আমি দায়ী হিসেবে ধরে নিয়ে গ্রেফতার করতে বাধ্য হবো। "ইনসাইটিং এ রায়ট···",' আইনের বই থেকে মুখস্থ ঝাড়ল টাকার। 'সবচেয়ে ভাল হয় এখন যদি তুমি বাইরে গিয়ে ওই লোকগুলোকে বলো যে জর্জির ব্যাপারে ভুল হয়েছে তোমার। এটা তোমার কর্তব্য।'

মুখ কালো করে অফিস থেকে বেরল জেড। তার পায়ে পায়ে লেগে রইল জিম টাকার। নিশ্চিত করতে চায় যে র‍্যাঞ্চার লোকগুলোকে কথাটা বলেছে। বাইরে ম্যানসেল কথা বলছে, শুনতে পেল বেনন। দরজা খুলে দেখল হতাশ হয়ে জটলা ভেঙে চলে যাচ্ছে সবাই।

বাধ্য হয়ে যাই বলুক, ম্যানসেল লোকটা আসলে ওকে চিনে ফেলেছে, এই ব্যাপারে বেননের মনে কোন সন্দেহ নেই। এমন অনেকেই ভিড়ের মধ্যে আছে যারা র‍্যাঞ্চার কথা উল্টে নিলেও তাকে বিশ্বাস করবে। বিগ বিল রেনো আর ম্যাকলাস্কিই শুধু নয়, এখন থেকে আরও অনেকেই লোকচক্ষুর আড়ালে বা অন্ধকার গলিতে ওকে পেলে খুশি হবে।

শেষবারের মতো ঘৃণার চোখে বেননকে দেখে বাবার পিছু পিছু ঘর ছেড়ে

বেরিয়ে গেল ন্যান্সি। দরজার দিকে এগোল বেনন, কিন্তু বেরতে পারল না। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে শেরিফ।

'তোমার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই,' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল সে। 'জেড ম্যানসেল বাজে কথা বলার মানুষ নয়। আমার উচিত ছিল শিকাগোতে তার করে তুমি কে তা নিশ্চিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তোমাকে আটকে রাখা। কিন্তু তা আমি করছি না। কেন জানো? কারণ হথর্নকে আমি ভালমতো চিনি। সে তোমার হয়ে কথা বলবে তোমার এই কথাটা আমি বিশ্বাস করেছি বলেই তোমাকে যেতে দিচ্ছি।'

'প্রমাণ চাইলে যে কোন সময়ে আমাকে নিয়ে হথর্নের ওখানে যেতে পারো তুমি,' বলল বেনন।

'আপাতত তার কোন প্রয়োজন দেখছি না।' শেরিফের চেহারায় স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল। 'তবে আমাকে না জানিয়ে শহর ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। গেলে অনেকে মনে করবে তুমিই খুনটা করেছ।'

হোটেলে নিজের ঘরে বসে চিন্তার রাজ্যে ডুবে গেল বেনন। এখন ওর হাতে তিনটে রহস্য। ডলারগুলো খুঁজে বের করতে হবে, বের করতে হবে কে খুনটা করেছে; জানতে হবে কারা হিলা ভ্যালিতে গরু চুরি করে রেঞ্জ ওয়ারের ক্ষেত্র তৈরি করছে। খুনটাকেই বেশি প্রাধান্য দেবে, স্থির করল বেনন, কারণ এব্যাপারটার সঙ্গে ওর সততা জড়িত; খুনীকে ধরিয়ে দিতে না পারলে পিঙ্কারটন এজেন্সি ভেবে বসতে পারে টাকার লোভে খুনটা ও-ই করেছে। তাতে কিছু যাবে আসবে না, কারণ কিছুই কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। তবুও মানুষের সন্দেহের শিকার হতে চায় না বেনন।

এখনও ভেবে বের করতে পারেনি ও কিভাবে খুনী মিড বাসটিয়ানের ঘরে ঢুকল। দরজায় তালা ছিল, জানালাটা ছিল বন্ধ। পরিচিত কেউ, যেমন নেড বা ন্যান্সি না ডাকলে কি মাঝরাতে দরজা খুলে দিত লোকটা? এমন কি হতে পারে ন্যান্সিই খুনটা করেছে? তেমনটা ভাবতে বেননের ভাল লাগল না, কিন্তু এটাও একটা সম্ভাবনা।

জনি উইলিয়ামসের সঙ্গে মেয়েটার কথাবার্তা মনে আছে ওর। ন্যান্সি পুবে যাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। জনিকে চুরি বা ডাকাতিতে পরোক্ষ ভাবে উৎসাহিত করেছে মেয়েটা। নিজেও খুনের কথা ভেবেছে। তাছাড়া আজকে বেননকে খুনী প্রমাণের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। কিন্তু কেন? নিজের ওপর থেকে সন্দেহ দূরে রাখার জন্যে?

চেষ্টা করেও কেন যেন মেয়েটাকে হত্যাকারিণী ভাবতে পারল না বেনন। নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মেয়েটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; চালাক আর দুঃসাহসীও বটে, তবে রাত বিরেতে চাচার ঘরে ঢুকে বুকে ছুরি বিঁধিয়ে খুন করার মতো অসুস্থ মানসিকতা মেয়েটার আছে একথা বিশ্বাস করা যায় না।

কিন্তু জনি উইলিয়ামস? এটা নিশ্চিত যে যুবক ন্যান্সিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাকে পাবার জন্যে খুনটা কি সে করতে পারে না? মিড

বাসটিয়ানের ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি আছে তার কাছে? কিন্তু মিডের চাবি যদি তালায় ঢোকানো থাকে তাহলে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলতে পারার কথা নয়। না, আপন মনে মাথা নাড়ল বেনন, খুনী অন্য কোন ভাবে ঘরে ঢুকেছে।

হঠাৎ করে রহস্য সমাধানের একটা সূত্র পেয়ে গেল বেনন। সে-রাতে মোজা পরা সেই লোকটার কথা মনে পড়ল ওর। লোকটা মিডের ঘর পেরিয়ে কিছুক্ষণ পর আবার নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছিল। একবার চেষ্টা করেছিল দরজাটা খোলার। তার কিছুক্ষণ পরই আগুন জ্বলে উঠল। ব্যাপারটা দুর্ঘটনা ছিল না। ইচ্ছে করেই একটা উদ্দেশ্য সামনে রেখে আগুনটা লাগানো হয়েছিল।

'আরে তাই তো!' উত্তেজনায় বিছানার ওপর উঠে বসল বেনন। 'এ-কথাটা আগে কেন আমার মাথায় আসেনি!'

আগুন জ্বলে ওঠার পর করিডর ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল। খুনী অপেক্ষা করছিল তখন। মিড বাসটিয়ান যেই করিডরে বেরিয়েছে অমনি লোকটা ঘরে ঢুকে পড়েছে। তারপর হয়তো লুকিয়ে ছিল বিছানার তলায়। ধরা পড়ার ভয়ে তখনই ব্যাগ নিয়ে বেরতে পারেনি।

খুনীকে ঘরের মধ্যে রেখেই তালা বন্ধ করে বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল মিড বাসটিয়ান!

দশ

দুপুরের পর আবার ঘর থেকে বেরল বেনন। সেরাতে মোজা পরা লোকটা কোন ঘরে ঢুকেছিল একবার দেখে নিয়ে নেমে এলো হোটেলের ফয়ারে। ওকে কাউন্টারের দিকে এগোতে দেখে নিস্পৃহ চেহারায় তাকিয়ে থাকল ক্লার্ক।

'কিছু লাগবে, মিস্টার জোন্স?' নামটার ওপরে বেশ জোর দিল সে।

'হ্যাঁ, কয়েকটা তথ্য লাগবে। বিনে পয়সায় নয়, বিনিময়ে টাকা দেব।' ওয়ালেট থেকে দশ ডলারের একটা নোট বের করে ক্লার্কের নাকের সামনে ধরল বেনন।

নোটটা ধরতে গিয়েও থেমে গেল ক্লার্ক। চেহারায় ফুটে উঠল সন্দেহ। জিজ্ঞেস করল, 'কি জানতে চাও, মিস্টার জোন্স?'

'একটা নাম। গতকালকে ষোলো নম্বর ঘরে কে ছিল?'

ভ্রূ ওপরে তুলে ক্লার্কটি সমঝদারের মতো হাসায় বিস্মিত হলো বেনন।

'ও, তুমিও মজে গেছ?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল সে। তারপর বলল, 'শহরে এসেছ পাঁচ দিনও হয়নি, এরইমধ্যে দেখছি ভালই চোখ খুলেছে তোমার! তবে আমার পরামর্শ যদি চাও তো বলব অনেক টাকা খরচা হয়ে যাবে তোমার।'

'তুমি বলতে চাইছ দশ ডলারে চলবে না?' নোটটা একবার দুলিয়ে জানতে-

চাইল বেনন।

হাসল ক্লার্ক। দশ ডলারের নোটটা নিয়ে পকেটে গুঁজে বলল, 'আমার জন্যে দশ ডলারই যথেষ্ট, কিন্তু তুমি যা চাইছ...' মাথা নাড়ল সে। ওপর দিকে আঙুল তুলে গোপন কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে গলা নিচু করে বলল, 'অন্তত পঞ্চাশ ডলার। তাও যদি তোমাকে পছন্দ করে তবেই, নাহলে আরও বেশি খরচা হতে পারে। অনেকে বলে ও এত টাকা পাবার যোগ্য নয়। তার চেয়ে আমার চেনা একটা জায়গা আছে...'

মাথা নাড়ল বেনন। বলল, 'তুমি আমাকে বুঝতে ভুল করেছ, বন্ধু। আমি আসলে জানতে চেয়েছি কালকে রাতে কোন্ লোক ওই ঘরে ছিল।'

'ও, সেটা তো আমি বলতে পারব না। আমি আসলে জানিই না। এত লোক যায় যে আমরা আর খেয়াল করি না।' চেহারা দেখে মনে হলো সাহায্য করতে না পেরে হতাশ হয়েছে লোকটা।

'তার মানে তুমি বলছ একটা মেয়ে থাকে ওই ঘরে?' দশ ডলারের নোটটা ফেরত চাইবে কিনা ভাবল বেনন।

বিস্মিত দেখাল ক্লার্ককে। 'তুমি যদি না-ই জানো, তাহলে এত আগ্রহ দেখাচ্ছ কেন?'

'মনে হলো কালকে রাতে পরিচিত একজনকে ওই ঘরে ঢুকতে দেখেছি আমি।'

'পরিচিত কেউ? তাহলে সে হয়তো দরদাম করে তোমার খরচা কমিয়ে দিতে পারবে।' চোখ টিপল ক্লার্ক। বেননকে মুখ কালো করতে দেখে ভয় হলো তার লোকটা হয়তো দশ ডলার ফেরত চাইবে। তাড়াতাড়ি বলল, 'ঘরটা বেলার। সারা বছরের চুক্তিতে ভাড়া নিয়েছে। সিলভার ডলার সেলুনে রাত না কাটালে ঘরেই থাকে সে।'

'এখন বেলাকে ঘরে পাওয়া যাবে?' কৌশলে বেনন জানতে চাইল ওই ঘরে সে ঢুকতে পারবে কিনা।

'না।' মাথা নাড়ল ক্লার্ক। 'সেলুনে গেছে রিহার্সালের জন্যে। একদল মেয়েকে নিয়ে রাতে সেলুনে নাচ দেখায় বেলা। ওকে চাইলে বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে। আরেক কাজ করতে পারো, সিলভার ডলারে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে পারো। তবে আগেই বলে দিচ্ছি, পঞ্চাশ ডলারের কমে বেলাকে পাওয়া যাবে না। অবশ্য তোমাকে ওর পছন্দ হলে তবেই...'

'ধন্যবাদ।' লোকটাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ঘুরে সিঁড়ির দিকে হাঁটা ধরল বেনন। টের পেল পেছন থেকে তাকিয়ে আছে ক্লার্ক। ঠোঁটে ঝুলছে বোদ্ধার হাসি।

মিড বাসটিয়ানের মৃতদেহ করোনারের ফিউনারাল পার্লারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হোটেলটা এখন খালি। নেড আর ন্যান্সির দেখা পাওয়া গেল না। হয়তো ঘরে আছে। শেরিফের নির্দেশ না পেলে শহর ছেড়ে যাবে না ওরা এব্যাপারে বেনন নিশ্চিত।

ষোলো নম্বর ঘরের সামনে থামল বেনন। করিডরে কেউ নেই। একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে দরজার হাতলে চাপ দিল ও। ভাবতেও পারেনি যে হাতলটা ঘুরবে। কিন্তু ওকে বিস্মিত করে ঘুরে গেল হাতল। চিন্তিত হয়ে পড়ল বেনন। বেলা ঘরে নেই তো? বেলাকে স্পষ্ট মনে আছে ওর। সিলভার ডলার সেলুনে বেলাই ওকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছিল।

হয় বেলা ঘরে আছে, নাহলে মেয়েটা বেপরোয়া বা বোকা। দরজায় প্রথমে আস্তে টোকা দিল বেনন। পরে টোকার জোর বাড়াল। জবাব দিল না কেউ। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল ও।

হোটেলের আর সব ঘরের তুলনায় বেলার ঘরটা রীতিমত রাজকীয়; দামী আসবাবপত্রে সাজানো। মেঝেতে ইরানী পুরু কার্পেট, জানালায় সুদৃশ্য নেটের পেছনে ঝুলছে ভেলভেটের অভিজাত পর্দা। সুন্দর করে সাজানো রয়েছে এক সেট দামী সোফা আর একটা গোল টেবিল। টেবিলের ওপর সাজানো আছে কয়েকটা মদের বোতল ও গ্লাস।

সব মিলিয়ে চমৎকার ভাবে গোছানো একটা ঘর। দেখে মনেই হয় না এ-ঘর এক পতিতার।

ডান পাশে আরেকটা দরজা দেখে বেনন বুঝল বেলা আসলে পুরো একটা স্যুইট ভাড়া নিয়েছে। সেজন্যেই এই ঘরে কোন খাট নেই। পাশের ওই ঘরটা নিশ্চয়ই বেডরূম।

পা বাড়াল ও। বেড রূমে ঢুকে দেখল ঘরে মেহগনি কাঠের মস্ত একটা খাট, একটা ড্রেসিং টেবিল আর একপাশে একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার ছাড়া ঘরে আর কোন আসবাবপত্র নেই। কোনার দিকে মার্বেল পাথরের চমৎকার একটা ওয়াশস্ট্যান্ড; দেখলেই হাত-মুখ ধুতে ইচ্ছে করে।

বিছানায় অগোছাল পড়ে আছে পেটিকোট আর মেয়েদের কাপড়চোপড়। সবগুলো দামী। বেলা অত্যন্ত বিলাসী জীবন যাপন করে।

চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঘরটা সার্চ করতে শুরু করল বেনন। কি খুঁজছে নিজেও জানে না ও। মনে মনে আশা করছে কোন একটা সূত্র পেয়ে যাবে, বুঝতে পারবে কে সেরাতে সিঁড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এই ঘরে ঢুকেছিল। তবে ও এটাও জানে যে কোন সূত্র পেলেও লোকটাকে খুনী হিসেবে প্রমাণ করা সহজ হবে না। বেলা হয়তো সেরাতে কয়েকজনকে সঙ্গ দিয়েছিল, কে বলতে পারে!

বিছানার নিচে খুঁজতে গিয়ে পায়ার কাছে কয়েক টুকরো কাঁচ পেল বেনন। সাবধানে টুকরোগুলো তুলে নিয়ে কাছ থেকে দেখল। ভারী কাঁচ। পাওয়ার আছে। এজিনিস চশমার জন্যে ব্যবহার হয়। বাঁ হাতের তালুতে রেখে ভাঙা কাঁচগুলো জোড়া দিল ও। ডিমের আকৃতি পেল টুকরোগুলো। চশমার কাঁচ তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না।

মোজা পরা লোকটার হাঁটার ভঙ্গি মনে পড়ে গেল ওর। মিড বাসটিয়ান খুন হওয়ার রাতেও লোকটার হাঁটার ভঙ্গি পরিচিত ঠেকেছিল, এখন বিদ্যুতের মতো চিন্তাটা খেলে গেল মাথায়; মুহূর্তের মধ্যে বুঝে ফেলল ও কে ছিল সেই

লোকটা।

দশ মিনিট পর ব্যাঙ্কে ঢুকল বেনন। গত কালকের মতোই আজকেও ব্যাঙ্কে প্রচুর লোক। কিন্তু আজকে বেনন কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর ধার ধারল না, টেলারের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ঢুকে পড়ল ফ্ল্যাপ উঠিয়ে। যেতে চায় ম্যানেজারের কামরায়।

'অ্যাই, হচ্ছেটা কি!'

টেলারের দিকে গম্ভীর চেহারায় তাকাল বেনন। ওর শীতল দৃষ্টি দেখে ভয় পেয়ে গেল লোকটা।

'আমি মিস্টার বেইমারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' শান্ত গলায় বলল বেনন।

'আজকে সে আসেনি,' চোখ সরিয়ে নিয়ে জানাল টেলার। 'খবর পাঠিয়েছে সে অসুস্থ।'

আমিও জানতাম সে আসবে না, মনে মনে বলল বেনন। মুখে বলল, 'কোথায় থাকে ম্যানেজার?'

'রাস্তার শেষ মাথায় বামদিকের বাড়িটাতে...'

টেলার তার কথা শেষ করার আগেই হাঁটা দিল বেনন। ব্যাঙ্ক থেকে বেরনোর সময় অনুভব করল কয়েক জোড়া চোখ ওকে অনুসরণ করছে।

পাঁচ মিনিটের মাথায় বাড়িটার সামনে পৌঁছে গেল ও। টুসনের আর দশটা বাড়ির মতোই, রং জ্বলে গেছে বাড়িটার; সামনের দিকে বেশ কয়েকটা চৌকো জানালা। পর্দা ঝুলছে। ছোট্ট একখণ্ড বাগান পেরিয়ে সদর দরজা।

দরজার নকার ঠুকে আওয়াজ করল বেনন। আশা করেনি কেউ আসবে। কিন্তু ওকে বিস্মিত করে এগিয়ে এলো পায়ের শব্দ। দরজা খুলে দিল হাড় জিজ্জিরে এক লম্বা মহিলা। বেননকে দেখে নীরস কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কাকে চাই? তোমাকে ব্যাঙ্কের ওরা বলেনি যে আমার ভাই অসুস্থ?'

'আমার কাজটা জরুরী, সেজন্যেই আসতে বাধ্য হয়েছি, ম্যাম।' আঙুলে হ্যাট ছুঁয়ে সম্মান দেখাল বেনন।

'যত জরুরীই হোক আমি তাকে ডাকতে পারব না, সারা রাত ব্যাঙ্কে কাজ করে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে ও এখন। তুমি বরং পরে এসো।'

বেইমার সারা রাত জেগেছে, তবে ব্যাঙ্কে কাজ করেনি। মহিলা কতটুকু জানে ভাবল বেনন। আঁচ করতে পারল না। অস্বস্তিকর একটা অবস্থায় পড়ে গেছে ও। কাঁচের টুকরো পেলেও এটা প্রমাণ করার কোন উপায় নেই যে বেইমারই খুনী। তাছাড়া কাউকে অভিযুক্ত করতে হলে নিজের পরিচয় ফাঁস করতে হয়, বলে দিতে হয় পিঙ্কারটন এজেন্সির কথা, নাহলে কেউ গুরুত্ব দেবে না। কিন্তু তা এখন করা সম্ভব নয়। এখনও সময় আসেনি।

বেননের সামনে এখন একটাই উপায় খোলা আছে। ধোঁকা দিয়ে লোকটার মুখ থেকে স্বীকারোক্তি বের করতে হবে। কাজটা শুনতে সোজা মনে হলেও কঠিনই হবে। যে লোক এত পরিকল্পিত ভাবে খুন করতে পারে তার

স্নায়ু ইস্পাতদৃঢ় এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে বেইমারই খুনী এমন না-ও হতে পারে। কারণ স্নায়ু যদি অত শক্তই হবে তাহলে লোকটা ব্যাঙ্কে না গিয়ে ঘরে বসে থাকত না। আচরণ দেখে মনে হয় ভয় পেয়েছে লোকটা।

দোতলায় একটা দরজা খুলে গেল। ওপর থেকে ভেসে এলো বেইমারের গলা, 'কে এসেছে, লুসি?'

'তোমার কাছে এসেছে। নাম জানি না। বলছে তোমাকে জরুরী দরকার।'

মহিলার কাঁধের ওপর দিয়ে চেঁচাল বেনন, 'আমি মিড বাসটিয়ানের মৃত্যু নিয়ে তদন্ত করছি। কালকে সে তোমার ব্যাঙ্কে গিয়েছিল।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। তারপর ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, 'বেশ, ওপরে চলে এসো। লুসি, ওকে আসতে দাও।'

নাক সিটকাল মহিলা। দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে অসন্তুষ্ট চেহারায় বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি মরে গেলেও এরা তোমাকে শান্তি দেবে না।'

মহিলাকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলো বেনন। দেখল ঘরের চৌকাঠ ধরে ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। আজ তার নাকের ওপর চশমাটা নেই। বেননকে দেখে জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল বেইমার। গলার স্বর স্থির রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, 'বলো, কি জন্যে এসেছ?'

'এই জন্যে।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে চশমার কাঁচের টুকরোগুলো বের করল বেনন। হাতটা বাড়িয়ে দিল যাতে লোকটা ভালমতো দেখতে পায়।

রক্ত সরে সাদা হয়ে গেল ম্যানেজারের চেহারা। চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে কোনমতে পতন ঠেকাল। ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'কোথায় পেয়েছ এটা?'

'কোথায় পেয়েছি ভালমতোই জানো তুমি,' গম্ভীর স্বরে বলল বেনন। 'কাল রাতে তুমি ছিলে বেলার ঘরে। তুমিই বাসটিয়ানকে খুন করেছ। বাইরের লোকের মধ্যে একমাত্র তুমিই জানতে ডলারের খবর।'

'না···বিশ্বাস করো···না···আমি না···'

'কালকে রাতে তুমি জুতো খুলে ঘর থেকে বের হও, তারপর করিডর পেরিয়ে সিঁড়িঘরের লণ্ঠন মেঝেতে ফেলে আগুন লাগিয়ে দাও,' এমন ভঙ্গিতে বলছে বেনন, যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে দৃশ্যটা, 'আগুন যখন ভালমতো ধরল, ধোঁয়ায় করিডর ভরে গেল, তুমি অপেক্ষায় থাকলে; তারপর যখন মিড ঘর ছেড়ে বের হলো, অমনি সুযোগ বুঝে ঢুকে গেলে তার ঘরে। লুকিয়ে থাকলে তুমি। বেচারা ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ার পর বুকে ছুরি মেরে খুন করলে তাকে। তারপর ডলারগুলো হাতিয়ে ফিরে গেলে বেলার ঘরে।' কড়া চোখে ম্যানেজারের দিকে তাকাল বেনন। কণ্ঠে কাঠিন্য ফুটিয়ে জানতে চাইল, 'এ ব্যাপারে কিছু বলার আছে তোমার?'

'কিভাবে···কি করে···'

লোকটা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে বলে মনে হলো বেননের। 'আমি

তোমাকে দেখেছি;' শান্ত গলায় বলল ও। 'আমি তখন জানতাম না কি কীর্তি করে ফিরছ তুমি। মনে করেছিলাম মাতাল, টয়লেট থেকে ফিরছ।'

পিছিয়ে গিয়ে ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল বেইমার। ঘেমে নেয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্তে বয়স বেড়ে গেছে যেন বিশ বছর। থরথর করে কাঁপছে হাত-পা। চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে তীব্র আতঙ্ক।

ফিসফিস করে কোনমতে বলল সে, 'ভুল করছ তুমি! আমি না! আমি ওকে খুন করিনি! ডলার নিয়েছি…ঠিকই বলেছ তুমি…কিন্তু…কিন্তু আমি ওকে খুন করিনি! ঈশ্বরের শপথ…আমি খুন করিনি!'

স্পষ্ট বুঝল বেনন মিথ্যে কথা বলছে না লোকটা। ভয় পেয়েছে সন্দেহ নেই কোন। কিন্তু খুন যদি না-ই করবে তাহলে এত আতঙ্কিত হওয়ার কি আছে? টাকা নিয়েছে স্বীকার করেছে লোকটা। টাকা নেয়ার সময় কি কোন কিছু দেখে ভয় পেয়েছে সে? খুন হতে দেখেছে বাসটিয়ানকে? সেজন্যেই ভয়ের চোটে আজকে ব্যাঙ্কে যায়নি?

ঠাণ্ডা চোখে লোকটার দিকে তাকাল বেনন। জানতে চাইল, 'খুনটা তুমি না করে থাকলে কে করেছে?'

কথার বদলে গোঙানি বেরল বেইমারের গলা থেকে। দু'হাতে মুখ ঢাকল লোকটা। ঝুলে গেল কাঁধ। চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হলো মার খাওয়া অসুস্থ কুকুর।

'কি হলো, কথা বলছ না কেন?' নির্দয় শোনাল বেননের গলা।

'আমি জানি না,' ফিসফিস করে বলল ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। 'আমি লোকটাকে দেখিনি। শুধু শব্দ শুনেছি…' জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল সে। 'বাসটিয়ানকে মরতে শুনেছি।…তারপরই তো দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আবার।'

'ঠিক মতো বলো কি ঘটেছিল। একদম প্রথম থেকে।'

'আচ্ছা,' কাঁপা গলায় বলল বেইমার। ঢোক গিলল। 'বাসটিয়ান বাইরে বেরতেই ওর ঘরে ঢুকে বিছানার তলায় লুকালাম আমি। তখন তখনই ডলার খোঁজার সাহস হয়নি। তারপর ঘরে ঢুকে সে ঘুমিয়ে পড়ার পর বেরিয়ে এসে খুঁজতে লাগলাম।' লজ্জিত চেহারায় থামল লোকটা। খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'আমি জানি তুমি বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যি বলছি, সেরাতে…বেলার সঙ্গে ছিলাম যখন…একবারও আমার ডলার চুরির কথা মনে হয়নি। তারপর বেলার সঙ্গে ঝগড়ার পর…'

'ঝগড়া কি নিয়ে হয়েছিল, টাকা-পয়সার ব্যাপারে?'

আবার লজ্জা পেল লোকটা। 'হ্যাঁ। বেলার দাবি অনেক। আমার পক্ষে অত টাকা খরচ করা সম্ভব ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্ক থেকে বেশ অনেক টাকা সরিয়ে ফেলেছি আমি ওর জন্যে। পরবর্তী অডিটের আগে কিভাবে টাকাটা শোধ করব ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হওয়ার দশা হয়েছিল আমার। তারপর বেলা বলল…'

'টাকা না থাকলে ওর কাছে না ভিড়তে,' বাকি কথা শেষ করল বেনন।

'হ্যাঁ।' মাথা দোলাল ম্যানেজার। 'তারপর বেলা ঘুমোতেই টাকার কথা ভাবতে বসলাম আমি। মনে পড়ল মিড বাসটিয়ানের কথা। আমি জানতাম লোকটার কাছে নগদ এক লাখ ডলার আছে। কোন্ ঘরে সে থাকে সেটাও আমার অজানা ছিল না। আমি ডলার হাতিয়ে ব্যাঙ্কের ঘাটতি পূরণের পরিকল্পনা করলাম। ঠিক করলাম কিছুদিন অপেক্ষা করে, মানুষের সন্দেহ না জাগিয়ে, বাকি টাকা নিয়ে টুসন ছেড়ে পুবে চলে যাব। বেলাও যাবে আমার সঙ্গে। ভেবেছিলাম···ভেবেছিলাম সব ঠিকঠাক মতো চলবে। মিস্টার···'

'জোন্স। জর্জি জোন্স।'

'মিস্টার জোন্স, আমি খুব নিঃসঙ্গ মানুষ। ভেবেছিলাম টাকাগুলো হাতে পেলে বেলাকে নিয়ে সংসার করব। আগেও আমি ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি, কিন্তু আমার বেতন কত জানে বলে রাজি হয়নি ও। ভেবেছিলাম এবার···'

চুপ মেরে গেল লোকটা। চেহারায় জমেছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম।

'তুমি বিছানার নিচ থেকে বেরিয়ে ডলার খুঁজতে লাগলে, তারপর কি হলো?' অধৈর্য হয়ে জানতে চাইল বেনন।

'বাসটিয়ান জেগে উঠবে সেই ভয়ে বাতি জ্বালতে সাহস পেলাম না আমি। জানালার পর্দা সরিয়ে দিলাম যাতে খানিকটা আলো আসে। কার্পেট ব্যাগটা পেলাম টেবিলের ওপর। প্রথমে ভেবেছিলাম ব্যাগ নিয়ে সরে পড়ব। কিন্তু পরে মনে হলো কেউ যদি ব্যাগ হাতে আমাকে দেখে ফেলে বা ব্যাগটা যদি পরে আমার···বেলার ঘরে পাওয়া যায় তাহলে বিপদ হয়ে যাবে। সেজন্যে ডলারগুলো নাইট শার্টের পকেটে ভরলাম।'

'পকেটে আঁটল এক লাখ ডলার?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল বেনন।

'কষ্ট করে আঁটালাম। বেশিরভাগই ছিল একশো ডলারের নোট।'

'তারপর?'

'তারপর দরজার তালা খুললাম আমি। বেরতে যাব এই সময়ে শুনতে পেলাম কে যেন আসছে। পায়ের শব্দ থেমে গেল দরজার সামনে। ভয় পেয়ে আবার খাটের তলায় লুকালাম আমি। তারপর নিঃশব্দে খুলে গেল দরজাটা। তারপর···' রক্ত সরে গেল ম্যানেজারের মুখ থেকে। বেননের দিকে চাইল সে বোবা দৃষ্টি মেলে।

'তারপর?' অতি কষ্টে আগ্রহ গোপন করল বেনন।

'আমি ভীষণ ভয় পেলাম। মনে করেছিলাম লোকটা নেড। বুঝতে পারছিলাম লোকটা যদি মিডকে জাগায় তাহলে দু'জনই টের পেয়ে যাবে যে ডলারগুলো গায়েব হয়ে গেছে। হৈচৈ শুরু হয়ে গেলে ধরা পড়ে যাব আমি। কিন্তু সে ডাকল না। বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। ঘ্যাচ করে একটা আওয়াজ হলো। আর্ত চিৎকার···না···গুঙিয়ে উঠল বাসটিয়ান। তারপর যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল লোকটা। আমি···আমাকে একা রেখে···মৃতদেহটা···' কথা শেষ করতে পারল না, বেননের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল লোকটা।

'তারপর কি করলে তুমি?' কিছুটা নরম হলো বেননের গলা।

'আমি বুঝতে পারলাম না কি করব। অনেকক্ষণ শুয়ে থাকলাম বিছানার নিচে। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে বাসটিয়ান মারা গেছে। ভয় লাগছিল ধরা পড়ে যাব। তারপর আমার হাতে তরল কি যেন পড়ল। আঠা-আঠা। রক্ত!' দু'হাতে মুখ ঢাকল ম্যানেজার। তাগাদা দিল না বেনন। একটু পর নিজেই মুখ খুলল লোকটা। সরাসরি বেননের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বিছানার নিচ থেকে বেরিয়ে দেখি বাসটিয়ানের বুকে একটা ছোরা ঢুকিয়ে দিয়েছে সেই লোকটা। তারপর কিভাবে বেলার ঘরে ফিরে গেছি আমি নিজেও বলতে পারব না।'

'কিন্তু ডলারগুলো নিতে তোমার কোন ভুল হয়নি।' শীতল হয়ে উঠল বেননের দৃষ্টি।

'না…তা নয়…ঘরে ফেরার অনেকক্ষণ পর খেয়াল করি যে ডলার আমার পকেটেই আছে। ঠিকমতো কিছু চিন্তা করার মানসিক অবস্থা তখন ছিল না আমার। বেলা ঘুমাচ্ছিল। ওকে আর জাগাইনি। ইচ্ছে করছিল ডলার ফেরত দিয়ে আসি, কিন্তু সাহসে কুলায়নি। হোটেলের পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে ভোর রাতে বাড়ি ফিরে এসেছি। লুসিকে বলেছি সারারাত ব্যাঙ্কে ছিলাম।' অসহায় দৃষ্টিতে বেননের দিকে তাকাল সে।

'মিস্টার জর্জি, বিশ্বাস করো, ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বলছি আমি বাসটিয়ানকে খুন করিনি। মিথ্যে বললে মরলে যেন দোজখে পুড়ি। হ্যাঁ ডলার চুরি করেছি, কিন্তু খুনটা আমি করিনি।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম,' ভারী গলায় বলল বেনন। 'কিন্তু শেরিফ বিশ্বাস করে কিনা সেটাই দেখার ব্যাপার। তৈরি হয়ে নাও, এক্ষুনি শেরিফের অফিসে যাবে তুমি আমার সঙ্গে। তুমি নিজে গেলে লোকটা হযতো বিশ্বাস করতেও পারে। টাকাগুলো নিতে ভুলো না।'

বেইমারকে দেখে মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ে যাবে। কথা যখন বলল শোনার জন্যে ঝুঁকে দাঁড়াতে হলো বেননকে।

ফিসফিস করল বেইমার, 'কিন্তু…কিন্তু…টাকাগুলো যে আমার কাছে নেই!'

এগারো

দীর্ঘ একটা প্রলম্বিত মুহূর্ত একেবারে বোবার মতো নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকল বেনন। তারপর কথা যখন বলল গলাটা কর্কশ শোনাল।

'কি বলতে চাও, টাকাগুলো নেই মানে? কোথায় গেছে?'

'হোটেল থেকে যখন ফিরলাম মাথা কাজ করছে না আমার,' বলতে শুরু করল বেইমার। 'হোটেলের ওই ঘটনার পর ডলার রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয় এটা বুঝতে পেরে…'

'কেন সম্ভব নয়?'

'কারণ ওই ডলারের জন্যে একজন খুন হয়েছে। ওগুলোর গায়ে লেগে আছে মরা মানুষটার রক্ত।'

'আচ্ছা, বলে যাও।'

'তারপর আমি চিন্তা করলাম ডলার নিয়ে কি করব। নিজের কাছে তো রাখবই না, কিন্তু রাখব কোথায়? বাসায় রাখতে ভরসা হলো না, কারণ লুসি হয়তো দেখে ফেলবে, দেখলেই মনে করবে আমিই খুনটা করেছি। হোটেলে যেতেও আর সাহস করলাম না, ডলারসহ কেউ যদি আমাকে ধরে ফেলে...শেরিফের অফিসেও সেজন্যেই যাইনি। চোখে পড়বে এমন কোন জায়গাতেও রাখতে পারলাম না কারণ যে দেখবে সে-ই আত্মসাৎ করবে।

'ভেবে দেখলাম মিড বাসটিয়ান মারা যাওয়ায় এক লাখ ডলারের ন্যায্য মালিক এখন তার বড় ভাই নেড। বুঝতে পারলাম ডলার তার হাতে পৌঁছলে আমার অপরাধ খানিকটা কমে। দরজায় তালা মারা ছিল। আমি ভেতর থেকে খুলে বেরনোর সময় লোকটা...খুনী আসে। দোষটা আমার । আমি তালা না খুললে হয়তো সে ঘরে ঢুকতে পারত না। যাই হোক, হোটেলে যখন লাশ নিয়ে হৈচৈ শুরু হলো সেই সুযোগে একটা থলেতে ভরে ডলারগুলো আমি নেডের র‍্যাঞ্চে রেখে আসতে গেলাম।'

'তাই করলে বুঝি?' অবিশ্বাস মাখা গলায় জানতে চাইল বেনন।

'হ্যাঁ। ঘোড়ায় চড়ে শহর থেকে বেরিয়েছি আমি। খেয়াল করে দেখেছি কেউ আমাকে দেখেনি। দেখলেও কারও সন্দেহ হতো না। তবুও আমি মেইন ট্রেইল এড়িয়ে গিয়েছি। নেডের র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দেখলাম র‍্যাঞ্চ হাউজে কেউ নেই। থাকার কথাও নয়। দূরে প্যাসচারে কাজ করছিল নেডের কাউহ্যান্ড উইল। সে আমাকে দেখেনি। থলেটা আমি ফায়ার প্লেসের সামনে রাখা কাঠের টুকরোগুলোর পাশে রেখে দিলাম। নেড বাড়ি ফিরলেই ওর চোখে পড়বে।'

'একবারও কি ভেবে দেখেছ আর কেউ থলেটা পেলে কি হবে?' গম্ভীর হয়ে গেল বেননের চেহারা। 'ধরো শেরিফ যদি খুঁজে পায়? কি ভাববে সে?'

'সেটাও ভেবেছি আমি,' বলল ম্যানেজার। 'সেজন্যেই এমন জায়গায় রেখেছি যাতে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। অন্য কেউ পেলেও বুঝবে যে নেড ওটা লুকাবার কোন চেষ্টাই করেনি, কাজেই সে খুনী হতে পারে না। তাছাড়া আমি জানি নেড সন্দেহভাজনদের মধ্যে নেই। সারারাত হোটেলে কাটিয়েছে সে। সকালে নাস্তা খেয়েছে হোটেলে। মিড়কে খুন করে ডলারগুলো র‍্যাঞ্চে রেখে আবার টুসনে ফিরে এসে মিডের মৃতদেহ আবিষ্কার করা এত অল্প সময়ে তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর পরেও সে ডলার রাখতে র‍্যাঞ্চে যায়নি, এটা প্রমাণিত সত্য। তুমি বোধহয় জানো অটপসি রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত ওদেরকে শহর ছেড়ে কোথাও যেতে মানা করেছে শেরিফ।'

'ভাল বুদ্ধি বের করেছিলে।' প্রশংসা না করে পারল না বেনন। তারপর বলল, 'এবার তৈরি হয়ে নাও, শেরিফের অফিসে যাচ্ছি আমরা। সেখান থেকে

যেতে হবে নেডের র‍্যাঞ্চে।'

বেননের পাশে ঘোড়া নিয়ে এলো শেরিফ টাকার। শক্ত মাটিতে খুরের শব্দ হচ্ছে তাই গলা চড়িয়ে বলল, 'খুনটা নেডও করে থাকতে পারে। সারারাত হোটেলে ছিল সে। ঘরটা একটু দূরে, একতলায়, কিন্তু তাই বলে ওকে আমি সন্দেহের বাইরে রাখছি না।'

'সেক্ষেত্রে লোকটাকে ফয়ার পেরিয়ে আসতে হতো। তাকে দেখতে পেত কেউ না কেউ। ম্যানেজার জেগেই ছিল।' বাম দিকে ঘাড় ফেরাল বেনন। 'বেইমার, লোকটার চেহারা দেখেছিলে তুমি?'

'না। শুধু বুটজুতো জোড়া।'

'তাহলে আমরা নেডকে বাদ দিতে পারি,' বলল টাকার। 'নেড এত বোকা নয় যে বুট পরে শব্দ করে খুন করতে আসবে। লোকটা যেই হোক কাছাকাছি ছিল। জানত সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।...অবশ্য সকালে যদি আমি জানতাম নেড আর মিডের মাঝে টাকা খাটানো নিয়ে ঝগড়া হয়েছে তাহলে নির্দ্বিধায় নেডকে আমি গ্রেফতার করতাম।'

'ডলারের ব্যাপারটা আমাকে ধাঁধায় ফেলেছে,' বলল বেনন। 'বেইমার যা বলল তাতে মনে হয় খুনী সোজা এসে বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে মিডকে খুন করেছে, তারপর চলে গেছে। একবারও সে ডলারের খোঁজ করেনি। তারমানে হয় সে ডলারের ব্যাপারে কিছু জানত না, নাহলে ও-ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ ছিল না!'

'আমাকে একজন লোক দেখাও যে এক লাখ ডলার পায়ে ঠেলবে,' বলল শেরিফ। একটু থেমে যোগ করল, 'তবে তোমার কথার মানে আমি বুঝতে পেরেছি। খুনী যদি নেড হয় তাহলে ডলার হাতানোর ঝুঁকি নেয়ার কোন প্রয়োজন পড়ে না তার। এমনিতেই ভাইয়ের মৃত্যুর পর সবকিছু তারই হবে। যতদূর জানি মিডের স্ত্রী নিঃসন্তান ছিল। মারা গেছে মহিলা। মিড আর বিয়ে করেনি। নেড আর ন্যান্সি ছাড়া তার আর কোন ওয়ারিশান ছিল না।...নেড হয়তো চাইছিল না খনিতে মিড টাকা খাটাক।'

'কিন্তু নেড বুট পরে আসবে কেন?' ভ্রূ কুঁচকে গেল বেননের।

জবাব দিল শেরিফ। 'হয়তো ভেবেছিল দরজা বন্ধ থাকবে। তাকে কার্নিসে উঠে ঢুকতে হবে জানালা দিয়ে। কেন বুট পরেছিল বুঝতে পারছি না। তবে শহরে ফিরেই তাকে তলব করব আমি। বেশ কয়েকটা প্রশ্ন আছে যেগুলোর উত্তর জানা দরকারী। রলিন্সকে আমি ওর ওপর নজর রাখতে বলে দিয়েছি, যাতে সে শহর ছেড়ে না বেরতে পারে।'

'আর ন্যান্সি?' চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকাল বেনন। 'তোমার কি মনে হয়, ওই মেয়ে খুনটা করে থাকতে পারে?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল শেরিফ। এটা স্পষ্ট যে ভাবনাটা তার পছন্দ হচ্ছে না। ঠোঁট জোড়া পরস্পরের ওপর চেপে বসল। অবশেষে জবাব দিল সে, 'আমার মনে হয় না ন্যান্সির কাজ। যে খুনটা করেছে তার গায়ে অনেক জোর

আছে, এটা আঘাত দেখে বোঝা যায়। তাছাড়া রাতের অন্ধকারেও ঠিক হৃৎপিণ্ডে গেঁথেছে। ওই লোক ছোরা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত।'

'আর জনি উইলিয়ামস?' জিজ্ঞেস করল বেনন। 'ন্যান্সি ডলারের কথা জানত, কাজেই ধরে নেয়া যায় যে জনিরও খবরটা অজানা ছিল না।' ন্যান্সি আর জনি যে গলির মধ্যে আলাপ করেছিল সেকথা শেরিফকে জানায়নি ও।

শেরিফের চোখে একই সঙ্গে কৌতূহল আর সন্দেহ ফুটে উঠল। 'টুসনে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই অনেক লোক সম্বন্ধে জানা শোনা হয়ে গেছে দেখছি তোমার! আসলে কে তুমি?'

'জি. জোন্স।' আন্তরিক হাসল বেনন। 'যখন ইচ্ছে হথর্নের কাছ থেকে জেনে নিতে পারো, মিথ্যে পরিচয় দিচ্ছি না। জি'টা হচ্ছে…'

'জর্জির। আমি জানি।' ওকে থামিয়ে দিল চিন্তিত শেরিফ। কিছুক্ষণ পরে বলল, 'এই ঝামেলাটা শেষ করেই আমি হথর্নের সঙ্গে আলাপ করব। আমার জানা দরকার কেন তুমি সব ঝামেলা দূর করতে এরকম উঠে পড়ে লেগেছ।'

'কারণ আমিই হচ্ছি সন্দেহভাজনদের মধ্যে এক নম্বর,' বলল বেনন। 'নেড আর ন্যান্সি চাইছে আমাকে খুনী প্রমাণ করতে, জেড ম্যানসেল বলছে আমিই নাকি রক বেনন – সবদিক থেকে বিপদের মধ্যে আছি, নিজেই তো দেখলে আরেকটু হলে আমাকে ঝুলিয়ে দেয়া হতো; এই অবস্থায় আর কি করতে পারতাম আমি?'

বেননের দিকে তাকাল শেরিফ। 'তুমি রক বেনন নও তাই বা কে বলছে? টুসন ভরে গেছে-আউট-লয়ে। সবাই ছদ্ম নাম ব্যবহার করে। সেজন্যেই মিড বাসটিয়ানের খুনীকে খুঁজে পাওয়া অত সহজ হবে না।'

বাকি পথটা নীরবে ঘোড়া দাবড়াল ওরা। দূরে দেখা গেল নেডের হোমস্টিড। হথর্নের র‍্যাঞ্চ হাউজের তুলনায় নেডেরটা অনেক ছোট। বাড়িটার এখানে ওখানে মেরামতের চিহ্ন। রং জ্বলে গেছে জায়গায় জায়গায়। একটু দূরে একটা ছোট বার্ন। সেখানে আট-দশটা ঘোড়া দেখা গেল। বাড়ির সামনে একটা বাকবোর্ড। একটা বাদামী মেয়ার এখনও জুতে রাখা আছে হার্নেসের সঙ্গে।

'সকালে ওটা এখানে দেখিনি!' বলল বেইমার। 'ওটা নেড বাসটিয়ানের বাকবোর্ড। তাহলে কি নেড…'

'অসম্ভব।' মাথা নাড়ল শেরিফ। 'রলিন্স তাকে আসতে দেবে না। চলো আগে দেখা যাক ডলার আছে কিনা।'

ঘোড়া থেকে নেমে বেইমারের পিছু পিছু বাড়িতে ঢুকল ওরা। কোথাও না থেমে চলে এলো ফায়ারপ্লেসের কাছে। কাঠের টুকরোগুলোর দিকে চাইতেই শরীরের পেশি আড়ষ্ট হয়ে গেল ম্যানেজারের। মুখ থেকে রক্ত সরে গেল বেনন আর শেরিফের।

ফিসফিস করল বেইমার, 'নেই! টাকাগুলো নেই!'

'তুমি ডলার এখানেই রেখেছিলে, এতে কোন ভুল নেই তো?' সন্দেহের সুরে জানতে চাইল শেরিফ।

'ঈশ্বরের শপথ, আমি...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি বিশ্বাস করলাম তোমাকে,' বলল শেরিফ। 'এমনকি তুমিও এত বড় চাপাবাজি করতে পারবে না।' দরজার কাছে গিয়ে হাঁক ছাড়ল সে। কিছুক্ষণ পর হাজির হলো ছেঁড়া তালি মারা পোশাক পরা লম্বা এক লোক। এ-ই হচ্ছে নেডের কাউহ্যান্ড, উইল সোমার্স।

লোকটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ানোর পর জানতে চাইল শেরিফ, 'বাকবোর্ডটা কে চালিয়ে এনেছে?'

'কেন, মিস ন্যান্সি!'

'কোথায় সে এখন?'

'তা তো বলতে পারব না। এসেই ঘরে ঢুকে কাপড় পাল্টে শার্ট-প্যান্ট পরে একটা ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে।'

'তার সঙ্গে কোন কিছু ছিল? মনে করো ব্যাগ বা আর কিছু?'

কৌতূহলী চোখে শেরিফের দিকে তাকাল উইল, কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না। ধীরে ধীরে মাথা দোলাল। 'হ্যাঁ, মিস ন্যান্সির সঙ্গে একটা পুরানো গানি-স্যাক ছিল। জিনিসটা দেখে অবশ্য খুব একটা ভারী বলে মনে হয়নি। কি ছিল ওটার ভেতর?'

জবাব দিল না শেরিফ। 'কোন্ দিকে গেছে মেয়েটা?'

'ওই যে ওদিকে।' হাত নেড়ে দিক নির্দেশ করল উইল।

'কখন গেছে?'

'এই তো একটু আগে।'

'ওদিকে লেযি এ র‍্যাঞ্চ,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল শেরিফ। 'জনি উইলিয়ামসের সঙ্গে দেখা করতে গেছে মেয়েটা। আমরা যদি তাড়াতাড়ি না যাই, ওদের দু'জনকে আর ধরতে পারব না।'

'তোমার ধারণা ডলার নিয়ে পালাবে ওরা?' শ্বাস আটকে জানতে চাইল বেইমার।

'এটা সীমান্ত এলাকা, দক্ষিণে নদীটা পেরলেই মেক্সিকো – আমাকে এমন একজন লোক দেখাও যে পালাবে না,' তিক্ত স্বরে বলল শেরিফ। 'মেঘ না চাইতেই জল, আকাশ থেকে মেয়েটার কোলে এসে পড়েছে এক লাখ ডলার। বেশির ভাগ লোক ওই টাকার বিনিময়ে নিজের দাদীর গলা কেটে ফেলতেও দ্বিধা করবে না।'

'হথর্ন বলেছিল জনি উইলিয়ামস অত্যন্ত সৎ যুবক,' বলল বেনন। শেরিফের মতামত জানতে চাইছে।

নাক দিয়ে শব্দ করল শেরিফ টাকার। 'সৎ তো বটেই, তবে কোন্ পর্যায় পর্যন্ত, সেটা বিবেচনায় আনা উচিত। মাসে চল্লিশ ডলারের সততা আর এক লাখ ডলারের ব্যাপারে সততা এক কথা হলো না। এখন তো আমার মনে হচ্ছে সে আর ন্যান্সি মিলেই খুনের পরিকল্পনাটা করেছে। রাতে জনি মিডকে খুন করে ঠিকই, কিন্তু ডলার খোঁজার সময় করে উঠতে পারেনি। হয়তো কোন একটা আওয়াজে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। পরে হয়তো আবার মিডের ঘরে

গিয়েছিল সে, কিন্তু ডলার ততোক্ষণে গায়েব। এদিকে ন্যান্সি চেষ্টা-করতে লাগল যাতে তোমার ওপর সন্দেহ হয় সবার। তারপর প্রথম সুযোগেই মেয়েটা আমার নির্দেশ অমান্য করে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।'

'কি উদ্দেশ্যে?'

'ও বোধহয় ধারণা করেছিল ডলারগুলো জনির কাছে আছে। তারপর এখানে টাকা পেয়ে ছুটল সে জনির কাছে।'

'তাহলে লেযি এ-তে না গিয়ে আগে এখানে এলো কেন মেয়েটা,' জানতে চাইল বেইমার।

'সহজ ব্যাপার,' বলল শেরিফ, 'কাপড় পাল্টাতে এসেছিল। পালাবে এটা সে নিশ্চিত ভাবে জানত। এমনও হতে পারে যে টাকাটা এখানে রেখে যেতে হয়তো জনিকে ও রাজি করিয়েছিল। জনি ওর কথা শুনবে। ন্যান্সির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে ছোকরা।'

মন থেকে শেরিফের কথাগুলো মেনে নিতে পারল না বেনন। কি যেন মিলছে না। কোনমতেই ন্যান্সিকে খুনী ভাবতে পারল না ও। তবে এটাও সত্যি যে শেরিফের নির্দেশ অমান্য করে শহর থেকে বেরিয়ে এখানে এসে টাকা নিয়ে লেযি এ-এর দিকে যাচ্ছে মেয়েটা।

ঘর থেকে আগে বেরল শেরিফ। পিছু নিল ওরা। ঘোড়ায় উঠে টাকার বলল, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমরা রেঞ্জের ওপর দিয়ে যাব। ওখানে যদি ওদের না-ও পাই, জানা যাবে কোন্ দিকে গেছে ওরা। জেড ম্যানসেলকে ওখানে পাওয়া যাবে। তিন ঘণ্টা আগে টুসন ছেড়ে র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছে সে।'

ঘোড়া ছোটাল ওরা লেযি এ-র দিকে। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে জিম টাকার।

লেযি এ র‍্যাঞ্চ আর মাত্র মাইল দুয়েক এমন সময় হঠাৎ করেই শেরিফ টাকার বেননকে বলল, 'ফ্রেইট ওয়্যাগন ট্রেনটা দেখেছ তুমি, যেটা আমার অফিসের সামনে থেমেছিল?'

'হ্যাঁ, দেখেছি,' জানাল বেনন। 'বেশ বড় আউটফিট। প্রায় সারা রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছিল।'

'অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটেছে একটা,' বলল টাকার। 'ওয়্যাগন-মাস্টার আমার কাছে নালিশ জানাতে এসেছিল। হিলা ভ্যালির ছয় মাইল দক্ষিণে তিনজন মুখোশ-পরা সশস্ত্র লোক ওদের ওয়্যাগন থামিয়ে সার্চ করে। মোটমাট পঁচিশটা ওয়্যাগন ছিল। পছন্দ মতো জিনিস পাওয়ার আগে পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে সবকয়টা ওয়্যাগন খুঁজেছে ওরা। কি ডাকাতি করেছে জানো?'

'টাকা?' জানতে চাইল বেনন।

'লবণ,' বলল শেরিফ।

'লবণ?'

'হ্যাঁ, লবণ। একটা ওয়্যাগনে মোট ছয়শো পাউন্ড লবণ তুলে চম্পট

দিয়েছে ওরা।'

লেযি এ র‍্যাঞ্চে পৌঁছে কারও দেখা পেল না ওরা। কাউহ্যান্ডরা রেঞ্জে গেছে। কেউ নেই, খাঁ-খাঁ করছে খালি বাড়ি। রান্নাঘরের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে দেখে হাঁক ছাড়ল শেরিফ।

আধ মিনিট পরে বেরিয়ে এলো সাদা অ্যাপ্রন পরা বাবুর্চি। জনি উইলিয়ামসকে দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করতেই মাথা দোলাল সে।

'এই তো একটু আগে দেখলাম করালের বেড়া মেরামত করছে। তারপর বাসটিয়ানের মেয়ে ন্যান্সি আসতেই দু'জনে বার্নে গিয়ে ঢুকল।' সমঝদারের হাসি হাসল লোকটা।

'কখন বেরিয়েছে···কোন্ দিকে গেছে ওরা?' জানতে চাইল টাকার।

'বেরতে দেখিনি। অবশ্য বার্নের পেছনে একটা দরজা আছে। ওদিক দিয়ে বেরলেও বেরতে পারে।'

বেননের সঙ্গে চোখে চোখে কথা হলো শেরিফের। বাবুর্চির দিকে তাকাল শেরিফ। জিজ্ঞেস করল, 'ম্যানসেল এসেছে?'

'হ্যাঁ। মেয়েটা আসার পনেরো মিনিট পরেই এসেছে। সে-ও বার্নে ঢুকেছিল, কিন্তু ততোক্ষণে ন্যান্সি আর জনি বোধহয় চলে গেছে, কারণ জেড একা বেরিয়ে এসেছিল। ওদের দেখেছে কিনা সে সম্বন্ধে কোন কথাও বলেনি।'

'কোথায় সে?'

'উপত্যকায় গেছে। বলল গরুর পালের ওপর একটু নজর বোলানো দরকার। ইদানীং গরু চুরি বেড়ে গেছে।'

মুখ দিয়ে সশব্দে দম ফেলল শেরিফ। তাকাল বেননের দিকে। বলল, 'ওরা ভাল বুদ্ধিই করেছে! সন্ধে হয়ে আসছে, এখন শহরে ফিরে পাসি তৈরি করতে পারার আগেই অনেক পথ পেরিয়ে যাবে ওরা। আজকে আর অনুসরণ করা সম্ভব নয়। এমনিতেই সারাদিনে আমরা চল্লিশ মাইলের বেশি পথ চলেছি। কালকে সকালে পাসি নিয়ে বেরব আমি।' শেরিফ টাকারের মনে আর কোন সন্দেহ নেই কে মিডকে খুন করেছে। ভাবছে এখন শুধু ধাওয়া করে ওদেরকে ধরতে পারার অপেক্ষা, তারপরই বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারবে সে ওদের দু'জনকে।

শেরিফের সঙ্গে একমত হতে পারল না বেনন। ন্যান্সি আর জনি উইলিয়ামসকে খুনী ভাবতে সায় দিচ্ছে না ওর মন। এটা সত্যি যে মেয়েটা টাকা চুরির কথা ভেবেছে, কিন্তু তারমানে এই নয় যে খুন করাবার কথা ভাববে সে। তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার মিলছে না। বাবাকে সন্দেহভাজনদের একজন রেখে চলে যাবার মতো মেয়ে ন্যান্সিকে মনে হয়নি ওর। তবে এটাও ঠিক যে টাকার লোভ মানুষকে ভালবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতা, শ্রদ্ধা – অনেক কিছু ভুলিয়ে দিয়ে অমানুষ করে তোলে।

ওরা যখন বাবুর্চির কফি শেষে ফিরতি পথ ধরল তখন সাঁঝের ছায়া গাঢ়

হয়ে উঠেছে। আঁধার নামছে চারপাশে। একটু পরেই নিজের হাত দেখা যাবে না। রেঞ্জে হঠাৎ করেই টুপ করে ডুবে যায় সূর্যটা দিগন্তের ওপাশে।

আজকে আকাশে মেঘ নেই। তারার আবছা আলোয় পথ চলছে ওরা। বেইমার এতো দীর্ঘ পথ চলতে অভ্যস্ত নয়। প্রায়ই বিড়বিড় করে অনুযোগ করছে সে। ভাগ্যকে দোষ দিচ্ছে। শেরিফের সঙ্গে কফি খেতে খেতে কথা হয়েছে তার। এখন সে জানে চুরির অপরাধে টুসনের জেলে থাকতে হবে তাকে। সার্কিট জাজ তার বিচার করবেন।

অনেক দূরে, উপত্যকার আরেক প্রান্তে একফোঁটা হলদে দেখতে পেল বেনন। এতই দূরে যে আলোটা নড়ছে নাকি স্থির হয়ে আছে বুঝতে পারল না। শেরিফকে আলোটা দেখাল বেনন। জিজ্ঞেস করল, 'কি ওটা?'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শ্রাগ করল টাকার। 'ফ্রেইট ট্রেনের আলো। আজকে মাঝরাতের আগে টুসনে পৌঁছতে পারবে না ওরা।'

'কন্সট্রাকশন ক্যাম্পের ফ্রেইট ট্রেন, ডুরাংগো যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'সপ্তাহে কয়বার যায়?'

'কমপক্ষে দুইবার। পনেরোশো মজুর আর শহরের লোক – সবার চাহিদা মেটাতে হয়। শুনলাম রেলরোড নাকি দিনে দশ মাইল করে এগোচ্ছে।' থামল শেরিফ। একটু পর বলল, 'চিন্তা করে দেখেছ রেলরোড কিরকম খরচ করছে? তবে খরচ না করে উপায়ও নেই, রেলরোড আমাদের লাগবেই।'

আস্তে করে মাথা দোলাল বেনন। খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'ঠিকই বলেছ, রেলরোড আমাদের লাগবেই।' মনে মনে বলল, 'আর রেলরোড তৈরির জন্যে যারা কাজ করছে তাদের লাগবে গরুর মাংস।'

বারো

পরদিন ভোরে পুবাকাশে সূর্যটা উঁকি দিতেই জনি আর ন্যান্সিকে অনুসরণ করার জন্যে পাসি নিয়ে তৈরি হয়ে গেল শেরিফ টাকার।

শেরিফের অনুরোধ উপেক্ষা করে পাসির সঙ্গে না গিয়ে শহরেই রয়ে গেল বেনন।

মিড বাসটিয়ানের খুনীকে খুঁজে বের করে ডলার উদ্ধার করাই ছিল বেননের প্রথম কাজ, কিন্তু বেইমার তার চুরির কথা স্বীকার করাতে খুনীকে খুঁজে বের করা শেরিফের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ও-ব্যাপারে এখন ওর মাথা না ঘামালেও চলে। তবে কাজ এখনও ফুরোয়নি ওর। গরু চুরি ঠেকাতে হবে। যে করে হোক সফল ওকে হতেই হবে। পিঙ্কারটন বিশ্বাস করে ওকে কাজটা দিয়েছে, সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

অদ্ভুত একটা অনুভূতি কাজ করছে বেননের ভেতরে। কেন যেন ওর মনে

হচ্ছে খুন আর গরু চুরির মধ্যে সম্পর্ক আছে। জনি উইলিয়ামসকে কিছুতেই সে মিডের খুনী হিসেবে ভাবতে পারছে না। বরং ওর মনে হচ্ছে খুনী হতে পারে বিগ বিল রেনো বা ম্যাকলাস্কি। কিন্তু তাদের স্বার্থ কি? তারা কেউ টাকার ব্যাপারে কিছু জানত না। জানলে ডলার না নিয়ে বেরত না। সবকিছু কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে বেননের মাথায়।

নাস্তা সেরে লবণ ডাকাতি হওয়া ফ্রেইট ওয়্যাগন-মাস্টারের সঙ্গে কথা বলল বেনন, তারপর চলে এলো রেল রোডের কাছে। রেল রোডটা প্রধান সড়কের সঙ্গে সমান্তরালে এগিয়েছে। স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে কালকে রাতে দেখা সেই ফ্রেইট ট্রেন। আটটা মাল বওয়া বগিকে টানছে একটা লোকোমোটিভ এঞ্জিন। চারটা বগির গায়ে চক দিয়ে লেখা আছে: ময়দা, সল্ট পর্ক, ড্রাই গুডস,আর গ্রেইন। দুটো বগিতে লেখা টুলস আর রেলওয়ে ইকুইপমেন্ট। বাকি দুটো বগিতে কিছু লেখা নেই। কোনকিছু না লেখা বগি দুটো তাৎপর্যপূর্ণ মনে হলো ওর। গভীর চিন্তায় ডুবে গেল বেনন। কুঁচকে গেল ওর ভ্রূ। সিদ্ধান্ত নিয়ে হাঁটতে শুরু করল ও।

ড্রাইভার আর ফায়ারম্যানকে একটা রেস্টুরেন্টে খুঁজে পেল বেনন। ভেতরে ঢুকে তাদের পাশের একটা টেবিলে বসল সে এক গ্লাস বিয়ার হাতে নিয়ে।

লোক দুটো খেয়াল করছে না ওকে। কান খাড়া রাখল বেনন। এক পলকে দেখে নিল তাদের বৈশিষ্ট্য।

দু'জনের কাঁধই ভারী। ষাঁড়ের মতো ঘাড়। গায়ের চামড়ার রং বোঝা যায় না কয়লার কালি আর ঘাম মিশ্রিত ধুলোয়। ক্ষুধার্ত তারা। কোঁত কোঁত করে খাবার গিলছে, যেন পেট ভরানোটাই আসল, খাবারের স্বাদ নেয়ার কোন দরকার নেই। বোঝা যায় তাড়া আছে। তবে মাঝে মধ্যে কথাও বলছে তারা।

বেননের জানা হয়ে গেল যে বয়লারের জন্যে পানি আর কর্ড উড ভরতে গিয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা লেগেছে ওদের। যেতে হবে ডুরাংগোতে, কাজেই জ্বালানী কম নেয়ার কোন অবকাশ নেই। তবে পানির জন্যেই বেশি সময় ব্যয় হয়েছে। চাপকলের সাহায্যে পানি তুলে বাকেটে করে বয়লার ভরতে হয়েছে তাদের।

ড্রাইভার আর ফায়ারম্যানের খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো বেনন। চলে এলো স্টেশনে। উদ্দেশ্যহীন ভাবে তাকিয়ে আছে এমন ভঙ্গিতে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বগিগুলোর ওপরে চোখ বোলাল। শেষ ওয়্যাগনটার দরজার ফ্রেমে একটা জিনিস দেখতে পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠল ও। এগিয়ে গিয়ে ওটার কাছাকাছি এসে ঝুঁকে দাঁড়াল বেনন। ও সোজা হচ্ছে এমন সময়ে স্টেশনে এসে ঢুকল ট্রেনের দুই ক্রু।

'কি হচ্ছেটা কি ওখানে?' জানতে চাইল ফায়ারম্যান। দু'জনের মধ্যে তার পোশাকেই কয়লার আস্তর বেশি।

'কই, কিছুই হচ্ছে না!' সরে দাঁড়াল বেনন। 'এমনি দেখছিলাম।'

'অন্য কোথাও গিয়ে এমনি এমনি দেখা করো গিয়ে যাও,' ধমকে উঠল ড্রাইভার। 'এখানে ওসব চলবে না।'

অপমানটা গায়ে মাখল না বেনন। জানতে চাইল, 'তোমরাই কি সবসময় ডুরাংগোতে ট্রেন নিয়ে যাও?'

ভ্রূ কুঁচকে গেল ড্রাইভারের। 'তাতে তোমার কি দরকার? এত প্রশ্ন করার তুমি কে, আইনের লোক নাকি তুমি?'

'না। দুঃখিত।' ঘুরে হাঁটা দিল বেনন। ডিপো থেকে বেরিয়ে চট করে একবার পেছনে তাকিয়ে লোক দু'জনকে দেখে নিল ও। ক্যাবে উঠল তারা। একটু পরেই চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বের হতে লাগল। ট্রেন ছাড়ার জন্যে অপেক্ষা না করে লিভারি স্টেবলে চলে এলো বেনন।

ওকে দেখে কপালে ভাঁজ পড়ল হসলারের। জানতে চাইল, 'এখনও ঘোড়াটা তুমি কিনতে চাও না? গত তিনদিনে পঞ্চাশ ডলার খরচ হয়ে গেছে তোমার। একশো ডলারে ঘোড়াটা দিয়ে দেব বলেছি – তা-ই দেব।'

'আমি ভেবে দেখব,' বলল বেনন। আসলে স্পীডিকে হারানোর পর থেকে নিজের পছন্দসই কোন ঘোড়া আজও খুঁজে পায়নি ও। এই ঘোড়াটা নিঃসন্দেহে ভাল, তবে স্পীডির তুলনায় কিছুই না। 'আচ্ছা,' হসলারের চোখে চোখ রাখল ও, 'ফ্রেইট ট্রেন তো ডুরাংগোতে যায়, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল হসলার।

'আচ্ছা, সেখান থেকে কোথায় যায় ট্রেনটা?'

'কোথাও না।' হাসল হসলার। 'রেল লাইন এখনও তৈরি হয়নি, তাই মাল নামিয়ে আবার ফিনিক্সে ফিরে যায়। ফিনিক্সেই ইউনিয়ন প্যাসিফিকের স্টোর। ওখান থেকেই ডুরাংগোতে রসদ পাঠানো হয়।'

'ফিনিক্স আর টুসনের মাঝে ট্রেনটা আর কোথাও থামে?'

'থামে।' মাথা ঝাঁকাল হসলার। 'হিলা ভ্যালির আরেক প্রান্তে পানি নিতে থামে। প্যাসেঞ্জার থাকে না, শুধু মাল থাকে।'

'জায়গাটা কত দূরে?'

'এই ধরো চল্লিশ মাইল।'

'ধন্যবাদ।' ঘোড়ার রাস ধরে স্টেবল থেকে বেরল বেনন। দরজার বাইরে এসে ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'ঘোড়াটা কেনার কথা আমি চিন্তা করে দেখব।'

রাস্তা ধরে টুসন ছাড়ার সময় বেনন সচেতন ভাবে খেয়াল করল অনেকগুলো চোখ ওকে অনুসরণ করছে। খবর ছড়িয়ে গেছে যে বেইমারকে গ্রেফতার করানোয় ওর হাত ছিল। অনেকেই চিন্তা করছে মিডের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কতটা জানে ও।

লেযি এ র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে তিন ঘণ্টা লাগল ওর। সময় বেশি লাগার কারণ হচ্ছে ট্রেইল ধরে এগোয়নি ও। ক্যানিয়ন, অ্যারোয়ো, ঝোপ-ঝাড় আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ চলেছে, যাতে ম্যানসেলের কাউবয়দের সঙ্গে দেখা না হয়। বেনন চাইছে না ম্যানসেল জানুক কোথায় চলেছে ও।

র‍্যাঞ্চ হাউজটা চোখে পড়তেই বার্নের সামনে আকাশে মাথা ছোঁয়ানো একটা বিশাল সোনালী-ওকের আড়ালে ঘোড়া থামিয়ে অপেক্ষা করল বেনন। যখন নিশ্চিত হলো যে ধারেকাছে কেউ নেই তখন ঘোড়া থেকে নেমে দ্রুত

পায়ে এগোল বার্নের দিকে। বাড়ির দিকে মুখ করা বার্নের সদর দরজাটা বন্ধ, কিন্তু ওর দিকের দরজাটা আধখোলা। একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে অন্ধকার বার্নে ঢুকে পড়ল ও।

ভেতরে কেউ নেই। বার্নের আরেক প্রান্তে কয়েকটা স্টল। দুটোর ভেতরে ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়েছে। বার্নে মালামালের অভাব নেই। গাদা করে রাখা আছে স্যাডল-ট্র্যাপিংস, হার্নেস, খড় আর শষ্যের বস্তা। ধীরেসুস্থে সার্চ করতে লাগল বেনন। বাদ দিল না কোন কিছু। উল্টে দেখল খড়ের গাদা আর খালি বাক্সগুলো। তাৎপর্য আছে তেমন কিছু একটা খুঁজছে ও। এমন কিছু যেটা ওর সন্দেহকে দৃঢ় করবে।

তেমন কিছু পেল না ও। কিন্তু যা আশা করেনি সেটাই চোখে পড়ল ওর একটা খড়ের গাদার পেছনে।

বিস্ময় কাটিয়ে উঠে জিনিসটা তুলে নিল ও। মাঝারি আকারের একটা থলি ওটা। মুখটা চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা হয়েছে।

ফিতে খোলার সময় বেনন টের পেল হাত কাঁপছে ওর।

ভেতরে হাত ভরে কাগজের স্পর্শ পেল ও। বের করে আনল এক তোড়া কাগজ। চোখের সামনে নিয়ে এসে দেখল ওগুলো একশো ডলারের নোট। এরকম আরও নয়টা তোড়া বের হলো গানি-স্যাক থেকে।

মিড বাসটিয়ানের টাকা খুঁজে পেয়েছে ও!

তেরো

প্রায়-অন্ধকার বার্নে দাঁড়িয়ে একটা ব্যাপারে বেনন নিশ্চিত হয়ে গেল, আর যে-ই হোক জনি আর ন্যান্সি মিড বাসটিয়ানের খুনের সঙ্গে কোনমতেই জড়িত নয়। খুনটা যদি তারা করত তাহলে এক লাখ ডলার এখানে এভাবে ফেলে যেত না।

গানি-স্যাকটা লুকানোর ঝামেলাতেও যায়নি ওরা। স্রেফ খড়ের গাদার পেছনে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। কোন সূত্র পাবে এই আশায় খুঁজতে না এলে থলে হয়তো ওর চোখেই পড়ত না। যেখানে ওটা পেয়েছে সেখানটা ঝুঁকে পরীক্ষা করল বেনন। দেখল খড়ের গাদায় একটা জায়গা বেশ খানিকটা ডেবে আছে। বোঝা যায় কেউ এখানে লুকিয়ে শুয়ে ছিল।

কে? এবং কেন?

টাকার থলের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে মানুষটা জনি বা ন্যান্সিই হবে। ওর মনে পড়ল কুকের কথা। লোকটা বলেছিল জেড ম্যানসেলকে বার্নে ঢুকতে দেখেছে। কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে চলে গিয়েছিল র‍্যাঞ্চার। নিঃসন্দেহে তার নজর থেকে বাঁচতেই লুকিয়েছিল ন্যান্সি আর জনি। কিন্তু তারপর যখন ওরা বেরিয়ে চলে গেল, তখন টাকার থলে ফেলে গেল কেন? যদি পরে এসে ওটা

নেয়ার ইচ্ছেই থাকত তাহলে ভাল কোন জায়গা বেছে লুকিয়ে রেখে গেল না কেন?

হাতের গানি-স্যাকটার দিকে তাকাল বেনন। ওর মনে হলো ডলারের রহস্য মিড বাসটিয়ানের হত্যা রহস্যকেও দুর্বোধ্যতার দিক থেকে ছাড়িয়ে গেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে কেউ এই টাকা চায় না! বেইমার টাকাগুলো নিয়েছিল, কিন্তু সে মিডকে খুন করেনি। আর যে খুন করেছে সে কার্পেট ব্যাগে কি আছে সেটা জানতই না। তাহলে মিডকে মরতে হলো কেন?

নেড যদি খনির কাজে হাত দেয়া থেকে মিডকে নিরস্ত করার জন্যে খুন করে থাকত, তাহলে কাজটা সে করত মিড ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়ার পর, কারণ মিড মরলে এমনিতেই সব টাকা তার হয়ে যাবে এটা সে জানত। জনি উইলিয়ামস খুনটা করে থাকলে ডলার ফেলে গেল কেন?

শেরিফ জিম টাকার আভাস দিয়েছে যে খুনী হঠাৎ করে সাহস হারিয়ে ফেলেছিল। এটা মেনে নেয়া যায় না। লোকটা মিডের ঘরে ঢুকে বুকে ছুরি বিঁধিয়ে খুন করতে পারল আর যে জন্যে এসেছে সেকাজটা, অর্থাৎ ডলার খোঁজা তার সাহসে কুলাল না এটা স্রেফ অসম্ভব।

তাছাড়া বেইমারের জবানবন্দি অনুযায়ী লোকটার মধ্যে কোন চাঞ্চল্য দেখা যায়নি। খুনী বিছানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, খুন করেছে, তারপর আবার বেরিয়ে চলে গেছে। এমনকি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেও ভুল হয়নি তার।

একটা মাত্র সমাধান বেননের মাথায় এলো। মিডের মৃত্যু আর ডলার চুরির মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। টাকার জন্যে খুন হয়নি মিড বাসটিয়ান।

কিন্তু তাহলে কেন মরতে হলো তাকে? টুসনে এসেছিল বেশিদিন হয়নি, কোন শত্রু ছিল না তার। তাহলে কি ঘর ভুল করে ভুল মানুষকে মেরে গেছে খুনী? মাথা নাড়ল বেনন। বড় বেশি কাকতালীয় হয়ে যায়।

হঠাৎ করেই বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো চিন্তাটা মাথায় খেলে গেল ওর। মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। প্রথমে চিন্তা করে একটা ঘটনার সঙ্গে আরেকটা ঘটনার কোন মিল পাওয়া না গেলেও আসলে পুরো ব্যাপারটাই একই সুতোয় গাঁথা। মিড টাকার জন্যে খুন হয়নি, কেউ প্রতিশোধও নেয়নি; অন্য কেউ ভেবেও তাকে মেরে রেখে-যায়নি খুনী।

নাথানিয়েল হথর্ন জানতে চাইল, 'কতজন লোক আমাদের লাগবে বলে মনে হয়?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল বেনন, 'আমাদের সহ অন্তত দশজন। ওরা কতজন সেটা আমাদের জানা নেই। আমরা ওদের চমকে দেয়ার সুবিধেটা পাব, কিন্তু কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। যেকোন সময়ে লড়াইয়ের মোড় ঘুরে যেতে পারে।'

'তুমি একেবারে নিশ্চিত তো?' একটু সন্দেহ প্রকাশ পেল র‍্যাঞ্চারের গলায়। 'আমরা ঝামেলায় না গিয়ে তদন্ত করে দেখলেই তো পারি। তাহলে

অত পথ ঘোড়ায় করে যাওয়ার দরকার পড়বে না সবার।'

'আমি ভেবেছিলাম ওদেরকে হাতেনাতে ধরতে চাও তুমি,' বলল বেনন।

'ওরা চলে গেলেও নিশ্চয়ই ওখানে অনেক প্রমাণ থাকবে?' জানতে চাইল হথর্ন।

'নিশ্চিত হবার কোন উপায় নেই। এমনকি আমি যে সঠিক পথে চিন্তা করছি তা-ও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। শুধু একটা ব্যাপারই নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, যদি আমার ধারণা সঠিক হয় তাহলে জান দিয়ে লড়বে ওরা।'

'বেশ।' চিন্তিত দেখাল র‍্যাঞ্চারকে। সময়ের হিসেব সেরে বলল, 'আমরা রওয়ানা দিলে দু'দিন লাগবে হর্স নেক পাসে পৌঁছতে। তারমানে ফ্রেইট ট্রেনটা তখন মাত্র ফিনিক্স থেকে যাত্রা শুরু করবে।'

'তাই।' সায় দিল বেনন। 'আমার ধারণা আস্তে চালাবে ওরা, যাতে সন্ধের সময় হর্স নেক পাসে পৌঁছয়। সেখানে যখন ওরা পানি আর কাঠ নিতে থামবে ততক্ষণে ডিপোতে ডিউটিরত লোকটার বিশ্রামের সময় হয়ে যাবে। কেউ কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইবে না কেন ট্রেনটা যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়েও রাতের আঁধার নামার অপেক্ষা করছে।...একটা কথা; যদি আক্রমণ করতেই হয় তাহলে আকাশে চাঁদ ওঠার পর আক্রমণ করব আমরা।'

'ন্যান্সি আর জনির ব্যাপারটা বুঝলাম না,' গম্ভীর স্বরে বলল হথর্ন। 'ওরা যদি টাকা নাই নিয়ে থাকে তাহলে পালাল কেন? তাছাড়া গেলই বা কোথায়? আজ নিয়ে তিনদিন হলো ওদের ধরার জন্যে পাসি নিয়ে বেরিয়েছে শেরিফ।'

'সে-প্রশ্নের জবাব টাকার ফিরলে জানা যাবে,' বলল বেনন। 'ডলার পাওয়ার পর আমি ভেবেছিলাম জনি আর ন্যান্সি নিজেরাই শহরে এসে হাজির হবে, যাতে লোকের সন্দেহ না হয়। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে হয় তারা ভয় পাচ্ছে, নাহলে...'

বেনন কথা শেষ করার আগেই কথা শুরু করল হথর্ন। 'হয়তো পুরো টাকা নিতে ভয় পেয়েছে ওরা। হিসেব করলে হয়তো দেখা যাবে কয়েক হাজার ডলার কম। ফিনিক্স থেকে স্টেট এক্সপ্রেসে উঠে সম্ভবত এতক্ষণে রওয়ানা হয়ে গেছে ওরা শিকাগোর দিকে।'

মাথা নাড়ল বেনন। 'আমি গানি-স্যাক বুঝিয়ে দেয়ার পর আমার সামনে গুনেছে রলিন্স। এক ডলারও কম ছিল না। পুরো এক লাখ ডলার বুঝে নিয়েছে সে।'

টাকরা দিয়ে শব্দ করল র‍্যাঞ্চার। বলল, 'শেরিফ যখন খবরটা শুনবে তখন যদি তার চেহারাটা দেখতে পেতাম তাহলে প্রাণ খুলে হাসতে পারতাম। আগামী এক বছর চিন্তা করতে হবে ওকে, তবুও কিছু বুঝে উঠতে পারবে না।'

'লোকটা সময় মতো ফিরলে ওকেও আমাদের সঙ্গে যেতে বলতাম,' বলল বেনন। 'তিনদিন তার জন্যে অপেক্ষা করেছি। আর বসে থাকা সম্ভব নয়। এতক্ষণে ট্রেন ডুরাংগো থেকে ফিনিক্সের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে। কালকে ফিরতি পথে থামবে হর্স নেক ডিপোয়। দেরি না করে এখনই যেতে

হবে আমাদের।'

'তুমিই আজকের বস্!' আন্তরিক হাসি হাসল হথর্ন।

এক ঘণ্টা পর ফ্লাইং জে র‍্যাঞ্চ থেকে দশজনের একটা দল ঘোড়ায় চেপে বেরল। দলে বেনন আর হথর্ন ছাড়াও রয়েছে হথর্নের সবচেয়ে বিশ্বস্ত আটজন কাউহ্যান্ড। প্রত্যেকে আজ উত্তেজিত হয়ে আছে। চেহারায় ফুটে আছে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ। লড়তে এবং প্রয়োজনে মরতে রাজি সবাই।

রাসলিং ঠেকাতে এবং রাসলারদের ধরতে একশো মাইলের এই দূরত্ব কেউ গায়েই মাখছে না। হর্স নেক পাসে পৌছতে ব্যাকুল হয়ে আছে কাউহ্যান্ডরা। এতদিনে অদৃশ্য শত্রুর মোকাবিলা করার সুযোগ পেয়ে নিজেদের ভাগ্যবান মনে হচ্ছে ওদের।

উত্তর থেকে দক্ষিণে হিলা ভ্যালির বিস্তার ষাট মাইল। উপত্যকা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে হর্স নেক পাস আরও চল্লিশ মাইলের পথ। প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ মাইল করে এগোতে পারবে, ধারণা করল বেনন। সময়মতো পৌছতে পারাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের আগে বা পরে হর্স নেক পাসে পৌছনো চলবে না।

কাউহ্যান্ডদের মধ্যে দু'একজন এই দীর্ঘ যাত্রার কারণ বুঝতে পারল না। তাদের একজন বেননকে জিজ্ঞেস করল, 'গরু চুরি সম্বন্ধে তোমার ধারণা যদি সঠিক হয় তাহলে আমরা উপত্যকায় যখন ট্রেন আসবে সেই জন্যে অপেক্ষা করছি না কেন? ট্রেনে ওঠার বদলে এখানে অপেক্ষা করলেও তো আমরা রাসলারদের ধরতে পারব।'

মাথা নাড়ল বেনন। 'ব্যাপারটা শুনতে যতটা সোজা মনে হচ্ছে আসলে তা নয়। সারাদিন ওরা চারপাশে নজর রাখবে। যত সতর্কই আমরা থাকি না কেন ওরা টের পেয়ে যাবে যে আমরা উপত্যকায় নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করছি। একটা ঘোড়া ডেকে উঠলেই ফাঁস হয়ে যাবে আমাদের উপস্থিতি। একটু ভুল করলেই সরে পড়বে ওরা। একবার ওরা সরে পড়লে কোন কিছুই আমরা প্রমাণ করতে পারব না। কিন্তু হর্স নেক পাসে গিয়ে ট্রেনে উঠলে ওদের মুখোমুখি হওয়ার একটা সুযোগ পাব আমরা। প্রমাণ থাকবে আমাদের হাতে যে ওরা গরু-চোর।'

'আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না কেউ এভাবে চুরি করবে,' বলল হথর্ন। চেহারা কঠোর হয়ে উঠল তার। বলল, 'কয়েক বছর ধরে ওকে চিনি আমি। সেজন্যেই বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।'

বেনন কোন জবাব না দেয়ায় কথা বন্ধ হয়ে গেল। যে যার নিজের চিন্তায় ডুবে এগিয়ে চলল উপত্যকা ধরে। যতটা পারছে আড়ালে আড়ালে এগোচ্ছে ওরা। মাঝে মধ্যেই দিগন্তের দিকে তাকাচ্ছে বেনন। মনে মনে আশা করছে দেখতে পাবে শেরিফ টাকার তার পাসি নিয়ে ফিরছে। কিন্তু তাদের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। এক সময় না এক সময় হতাশ হয়ে লোকটাকে ফিরতেই হবে, নিজেকে সান্ত্বনা দিল ও।

সেরাতে হিলা ভ্যালির আরেক প্রান্তে, সুউচ্চ ঢালের পাশে একটা গোপন

ড্রয়ে ক্যাম্প করল ওরা। নিজেদের মধ্যে খুব একটা কথা হলো না ওদের। ঘোড়ার পরিচর্যা শেষে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই।

পরদিন ভোরে সূর্য উঠতেই নাস্তা সেরে রওয়ানা দিল ওরা। যেতে হবে আরও পঞ্চাশ মাইল।

'ওই যে দেখা যায়,' বলল হথর্ন।

গাছের সারির আড়ালে থেমেছে ওরা। পাতার ফাঁক দিয়ে সামনে দেখা যাচ্ছে হর্স নেক পাসের রেলওয়ে ডিপো। একটা কেরোসিনের লণ্ঠন ঝুলছে বারান্দায়। খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে একটা স্যাডল চাপানো ঘোড়া। একজন লোক উঠানে কর্ড উড জড় করে রাখছে। শেষ বিকেলের পড়ন্ত রোদে চকচক করছে রেল লাইন। গলা বাড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে কাউবয়রা।

আঙুল তুলে লোকটাকে দেখাল একজন। বলল, 'হয়তো ডিপোর ওই লোকটাও রাসলিঙের সঙ্গে জড়িত।'

'হতে পারে,' জানাল বেনন। 'তবে আমার ধারণা শুধু ট্রেনের ক্রুরা রাসলারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ট্রেনটা আসুক তারপর দেখা যাবে কি ঘটে।'

ওদের কাছে মনে হলো অনন্ত কাল পার হয়ে যাচ্ছে, ট্রেনের কোন খবর নেই। অবশেষে ঘণ্টা খানেক পরে দূর থেকে ওরা ডুরাংগোগামী ট্রেনটার হুইসল শুনতে পেল। তাকিয়ে থাকল ওরা। একসময় দেখতে পেল কালো ধোঁয়া ছেড়ে এগিয়ে আসছে ট্রেন। ছয়টা ফ্রেইট কার টানছে এঞ্জিনটা।

ফায়ার বক্সের আলোয় ড্রাইভার আর ফায়ারম্যানের চেহারা দেখতে পেল বেনন। দূর থেকেও চিনতে পারল। এরা হচ্ছে চারদিন আগে যাদের সঙ্গে ওর কথা হয়েছিল সেই দুই ক্রু।

ডিপোতে ট্রেন থামতেই লাফ দিয়ে ক্যাব থেকে নেমে পড়ল তারা। সময় নষ্ট না করে কর্ড উড তুলতে লাগল ফায়ারম্যান। ড্রাইভারও বসে থাকল না, বয়লারে পানি ভরল সে। আধঘণ্টার মধ্যে আবার যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে গেল তারা।

কাজ শেষ করে কি যেন আলাপ জুড়ে দিল দু'জন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শ্রাগ করল ডিপোর গার্ড। কেরোসিনের লণ্ঠনটা এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়ে বিদায় জানিয়ে ঘোড়ায় চেপে বাড়ির পথ ধরল। একটু পরই দূরে মিলিয়ে গেল খুরের আওয়াজ। অখণ্ড নীরবতা নামল চারপাশে।

'এখন!' হাতের ইশারা করে উত্তেজিত স্বরে বলল বেনন। ব্যাগলের কথা মনে পড়ল ওর। ব্যাগলে থাকলে টানটান এই পরিবেশটা খুব উপভোগ করত।

বেননের পিছু নিয়ে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সবাই। ট্রেনের ক্রুরা কিছু বোঝার আগেই ডিপোতে ঢুকে তাদের ঘিরে ফেলা হলো। অস্ত্র বের করে তাক করল হথর্ন আর বেনন।

'কি হচ্ছে! ডাকাতি?' ভয় লুকিয়ে রেগে ওঠার ভান করল ড্রাইভার।

'যেটা ভাবতে তোমার সুবিধে,' বলল বেনন। 'তবে ট্রেনটা আমরা নিয়ে

যাচ্ছি। সঙ্গে তোমাদেরও যেতে হবে।'

চোখ সরু করে বেননকে দেখল ফায়ারম্যান। তারপর ঢোক গিলে বলল, 'আমি তোমাকে চিনেছি! টুসনে তুমিই আমাদের ট্রেনের কাছে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছিলে!'

'ঠিক ধরেছ। তোমাকে পরীক্ষায় একশোতে একশো দেয়া হলো। এবার আমি আরও একটু ছোঁক-ছোঁক করব, কেমন?' গম্ভীর হলো ওর চেহারা। 'কোন রকম চালাকির চেষ্টা করলে মরবে। একটা কথা মনে রেখো, তোমাদের ছাড়াও আমাদের চলবে।'

ড্রাইভার ভড়কে গিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'তোমরা যদি টাকার জন্যে হোল্ডআপ করে থাকো তাহলে ভুল করেছ। এটা ফ্রেইট ট্রেন। ফিনিক্স থেকে ডুরাংগোর কন্সট্রাকশন ক্যাম্পে খাবার আর যন্ত্রপাতি নিয়ে যাচ্ছি আমরা। তোমরা নিশ্চয়ই ক্রোবার আর ময়দার বস্তা চুরি করতে আসোনি?'

'নিশ্চিন্তে থাকো, আমরা কিছুই চুরি করব না,' বলল বেনন। 'আমরা শুধু তোমাদের সঙ্গে প্যাসেঞ্জার হিসেবে ডুরাংগো যাচ্ছি। ওখানে জরুরী কাজ আছে আমাদের।'

'দুঃখিত,' বলল ড্রাইভার। 'একটা বগিতেও জায়গা নেই। তোমাদের অন্য কোন ব্যবস্থা করে নিতে হবে। ঘোড়ায় চেপে চলে যাও না, সময় একটু বেশি লাগবে, কিন্তু তাতে কি।'

'জায়গা নেই বগিতে?' জানতে চাইল বেনন।

'না।' এক সঙ্গে উত্তর দিল ফায়ারম্যান আর ড্রাইভার।

'আমার ধারণা বগিতে জায়গা আছে।' ডিপোর লণ্ঠনটা জ্বেলে ট্রেনের দিকে পা বাড়াল বেনন। বলল, 'এই মাত্র ঈশ্বর আমাকে বলে গেলেন পেছনের বগি দুটো খালি পাব।'

এক এক করে শেষ বগি দুটোর দরজা খুলে লণ্ঠনের আলোয় ভেতরটা দেখল বেনন। দুটো বগিই খালি।

'চমৎকার!' ফিরে এসে বলল বেনন। 'ঈশ্বর আমাকে ঠিকই বলেছিলেন, তিনি এমনকি ঘোড়াগুলো সঙ্গে নেবার ব্যবস্থাও করে রেখেছেন!'

ঝটপট শেষ বগির আগেরটায় ঘোড়াগুলো তুলে ফেলা হলো। একজন কাউবয় সঙ্গে থাকল যাতে ওগুলো আওয়াজ না করে। স্যাডল বুট থেকে রাইফেল নিয়ে শেষ বগিতে উঠে গেল বাকি সাতজন কাউবয়। বেনন আর হথর্ন ড্রাইভার আর ফায়ারম্যানকে নিয়ে এঞ্জিন ক্যাবে উঠল। ক্যাবের পেছনে, ফায়ার বক্সের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের ওপরে সিক্সগান তাক করে রাখল ওরা।

'তোমাদের ধারণা তোমরা ডুরাংগোতে তাড়াতাড়ি যাবার উপায় খুঁজে পেয়েছ, কিন্তু একবার পৌঁছে নিই, তারপর দেখবে শেরিফ...' থেমে গেল ড্রাইভার।

কথা বলে উঠেছে বেনন, 'ডুরাংগো পর্যন্ত যাচ্ছি না আমরা। পরের স্টপেজেই নেমে যাব।'

'পরের স্টপেজই ডুরাংগো,' বলল ফায়ারম্যান। 'মাঝখানে আর কোথাও

থামি না আমরা।'

'আমার ধারণা তোমরা থামো,' বলল গম্ভীর বেনন। 'একশো মাইল দূরের হিলা ভ্যালিতে থামো তোমরা।'

ভয়ের ছায়া খেলে গেল ড্রাইভারের চেহারায়। কাঁপা গলায় জানতে চাইল লোকটা, 'কে তোমরা? কি চাও?'

'সময় হোক, নিজেই জানতে এবং দেখতে পারবে,' শীতল স্বরে বলল বেনন। 'এখন যা বলছি তাই করো, নাহলে তোমাদের কপালে খারাবি আছে।'

'কি করতে হবে আমাদের?'

'রওয়ানা দাও। মনে রেখো, কোন চালাকি নয়। উল্টোপাল্টা দেখলে বিনা দ্বিধায় মাথায় একটা গুলি ঢুকিয়ে দেব। মনে কোরো না যে ট্রেন চালাতে পারব না।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিল ড্রাইভার। ফায়ারম্যান কাঠ ফেলল ফায়ার বক্সে। দু'জনই বুঝে ফেলেছে মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না, প্রয়োজনে যা বলছে তা-ই করবে লোকগুলো।

অতি ধীরে ডিপো থেকে বেরিয়ে এলো ট্রেন। আস্তে আস্তে গতি বাড়তে লাগল। খটাখট বাড়ি খেল বগিগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে। গতি আরও বেড়ে স্থির হওয়ার পরে ঝিকঝিক আওয়াজটা একই তালে হতে লাগল। চাঁদের আলো পড়ে রূপালী দেখাচ্ছে সামনের ট্র্যাক। দ্রুত ছুটে চলল ওরা হিলা ভ্যালির দিকে।

'তাড়া নেই আমাদের,' র‍্যাঞ্চারকে বলল বেনন। 'আজ রাতে অনেকক্ষণ থাকবে চাঁদের আলো।' ড্রাইভারের দিকে তাকাল ও। 'তোমরাও তাড়াহুড়ো কোরো না, তাই না?'

'আমি জানি না কি নিয়ে কথা বলছ তুমি,' ভ্রূ কুঁচকে জবাব দিল ড্রাইভার। 'যদি তোমরা ভেবে থাকো এসব করে পার পাবে তাহলে ভুল...'

'এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু করে পার পেয়েছ তোমরা,' তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল র‍্যাঞ্চার। রেগে উঠেছে। ধমক দিল, 'আর একটা কথাও নয়। যা করতে বলা হবে চুপচাপ তাই করবে।'

নীরবতা নামল ক্যাবে। আঁধারের বুক চিরে ছুটে চলল ফ্রেইট ট্রেন। দেড় ঘণ্টা পর হিলা ভ্যালিতে ঢুকল ওরা।

যতই এগোল মুখ-চোখ শুকিয়ে যেতে লাগল ড্রাইভার আর ফায়ারম্যানের। চট করে একবার ক্যাবের দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল ফায়ারম্যান। আন্দাজ করার চেষ্টা করল ঝাঁপ দিয়ে নিচের পাথুরে জমিতে পড়লে বাঁচবে কিনা।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করল র‍্যাঞ্চার। সিক্সগানের নল ইঞ্চি খানেক উঠিয়ে বলল, 'তোমার জায়গায় আমি হলে ভুলেও চেষ্টা করতাম না। তুমি ঘাড় ভেঙে মরলে জল্লাদের একটা কাজ কমে যাবে। সেটা উচিত হবে না।'

ঘন ঘন ঢোক গিলতে লাগল লোকটা।

আরও একঘণ্টা পর ভাঙাচোরা আকৃতির টিলাগুলো দেখতে পেল বেনন।

সামনেই আর আধমাইলটাক দূরে মিড বাসটিয়ানের সেই রূপার খনি। ফায়ারম্যানের পাঁজরে সিক্সগানের নল চেপে ধরল বেনন। ওর দেখাদেখি ড্রাইভারকে কাভার করল র‍্যাঞ্চার।

'ওরা যখন আসবে কোন চালাকি করতে যেয়ো না,' গল্প করছে এমন ভঙ্গিতে বলল বেনন। 'ওদেরকে বলবে যাতে গরু বোঝাই শুরু করে।'

'কিসের গরু? কাদের বলব?' নিরীহ চেহারায় জানতে চাইল ড্রাইভার।

'তুমি ভালমতোই জানো আমি কি বলেছি।' কঠোর হয়ে গেল বেননের চেহারা। 'ট্রেনটা থামাও। চালাকি করতে যেয়ো না। একটু বেচাল দেখলেই খুন করে ফেলব।'

হ্যান্ডেলটা নিচের দিকে নামিয়ে বাষ্প বন্ধ করে দিল ড্রাইভার। লাথি দিয়ে ফার্নেসের দরজাটা আটকে দিল ফায়ারম্যান। জ্বলন্ত কয়লার লাল আভা এঞ্জিন ক্যাব থেকে মিলিয়ে গেল। গতির তাড়নায় কয়েকশো গজ এগিয়ে আস্তে আস্তে থেমে দাঁড়াল লোকোমোটিভ।

জায়গা বদল করল হথর্ন আর বেনন। বেননের অস্ত্র মেরুদণ্ডে খোঁচা দেয়ায় দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচাল ড্রাইভার: 'মাল নিয়ে আসো!'

চাঁদের আলোয় একশো গজ দূরে অন্ধকার গুহার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেল ওরা। বেনন গতবার যখন দেখেছিল সেই তুলনায় আজকে আরও আঁধার লাগছে টানেলটা।

চাঁদের আবছা আলোয় তিনজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখল ওরা। একটা লোহার ট্রাক খনি থেকে বের করে সরু ট্র্যাক ধরে ঠেলে নিয়ে আসছে দু'জন। পাশে হাঁটছে একজন। চতুর্থ লোকটা দাঁড়িয়ে আছে খনির টানেলের সামনে। এসব ট্রাক খনিতে মাইনাররা ব্যবহার করে ওপরে 'ওর' তোলার জন্যে। মসৃণ গতিতে এগোচ্ছে জিনিসটা। আজকে রেলের ওপরে বালি নেই। ট্র্যাক চলে এসেছে রেল রোডের লাইন পর্যন্ত। তারপর ছাড়িয়ে চলে গেছে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে।

এগিয়ে আসছে লোকগুলো। কোনকিছু সন্দেহ করেনি। কাছে আসতে তাদেরকে চিনতে পারল বেনন। অনুভব করল শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল বেড়ে গেছে। শুনতে পেল ফোঁস করে শ্বাস ফেলল হথর্ন। 'তুমি ঠিকই বলেছিলে!' বিড়বিড় করে বলল সে।

বেননের সিক্সগানের খোঁচা খেয়ে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে চেঁচাল ড্রাইভার, 'এই ট্রিপে কয়টা দিচ্ছ?'

'একশোটা। নেমে এসে আমাদের সাহায্য করো, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন! আরও দশটা গাড়ি বোঝাই করে মাল আনতে হবে।'

চাঁদের আলো না থাকলেও গলা শুনেই লোকটাকে চিনতে পারত ওরা। কথাগুলো বলেছে জেড ম্যানসেল। সরু মুখ, বাঁকা নাক আর ঝুলে থাকা গোঁফের কারণে লোকটাকে দেখতে লাগছে শিকারি পাখির মতো। তার পেছনে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিগ বিল রেনো।

আবার ড্রাইভারের পিঠে খোঁচা মারল বেনন। ভয় লুকিয়ে বিরক্ত একটা

ভঙ্গি নিয়ে ক্যাব থেকে নামল লোকটা। জানে যে তার পিঠে অস্ত্র তাক করে রেখেছে বেনন।

ড্রাইভারের দিকে তাকাল না ম্যানসেল। জানতে চাইল, 'সবসময়ের মতোই শেষ বগি দুটো?' লোকটা মাথা ঝাঁকানোয় বলল, 'আজকে তুমি আগেই থামিয়ে দিয়েছ। ফ্র্যাঙ্ককে বলো গাড়ি নিয়ে এগোতে, নাহলে সময় বেশি লেগে যাবে।'

ফায়ারম্যানকে ইশারা করল হথর্ন। থ্রটল খুলে ট্রেনটাকে সামনে বাড়াল লোকটা। থেমে গেল মাইনিং ট্রাকটা শেষ বগির সমান্তরালে আসতে। ওই একই মুহূর্তে ড্রাইভাব টের পেল যে কয়েক ফুট সরে যেতে পারলেই বেননের অস্ত্রের আওতা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে সে। প্রকাণ্ড লাফ মেরে সরে গেল লোকটা। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'দৌড়াও! পালাও সবাই! ওরা আমাদের ওপর হামলা করেছে!'

'কি বলছ এসব যাতা কথা, তোমার মাথা ঠি...'

বিস্মিত জেড ম্যানসেল কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই খুলে গেল শেষ বগি দুটোর দরজা। লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো ফ্লাইং জে-এর কাউবয়রা। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল।

চমক কাটিয়ে উঠেই মাটিতে ডাইভ দিয়ে পড়ল ম্যানসেল। বুকে হেঁটে চলে গেল লোহার ট্র্যাকের পেছনে। ওখান থেকে রেনো আর ম্যাকলাস্কিকে ডাক দিল সে।

খনির মুখ থেকে এগিয়ে এলো চতুর্থ লোকটা। এখনও বোঝেনি রেলগাড়ির সামনে কি হচ্ছে। কিন্তু বগি থেকে লোক নামতে দেখেই বুঝে নিল সে যা বোঝার। ঘুরেই সুড়ঙ্গ লক্ষ্য করে দৌড় দিল।

ফ্লাইং জে-এর একজন কাউবয় দেখতে পেল তাকে। রাইফেলটা তুলেই নির্দ্বিধায় গুলি চালাল সে। দড়াম করে পড়ে গেল লোকটা। কয়েক পাক দিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহ। আর নড়ল না। হাত-পা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল বালিতে।

কয়েক সেকেন্ড পরেই ম্যানসেল আর তার দুই স্যাঙাত ট্র্যাকের আড়াল ছেড়ে বোল্ডারের পেছনে আশ্রয় নেবার জন্যে ছুটল। ড্রাইভার লোকটা লাফ দিয়ে রেলগাড়ির চাকার পাশে পড়ল। সেখান থেকে নিচু হয়ে চলে গেল গাড়ির অপর পাশে। ছুটল সে, চলে গেল প্রায় বিশগজ দূরে। কিন্তু বাঁচতে পারল না। এঞ্জিন ক্যাব থেকে তাকে গুলি করে মারল হথর্ন।

হথর্নকে ব্যস্ত দেখে সুযোগটা নিল ফায়ারম্যান। ক্যাব থেকে নেমে বেনন গুলি করতে পারার আগেই চলে গেল সে জেড আর তার সঙ্গীদের কাছে। একটা বড় বোল্ডারের পেছনে আশ্রয় নিয়েছে তারা।

এক মুহূর্ত পরেই রাইফেল আর সিক্সগানের আওয়াজে ভেঙে খানখান হয়ে গেল উপত্যকার জমাট বাঁধা নীরবতা। বালিতে গাঁথতে লাগল বুলেট। বোল্ডারে পিছলে গিয়ে দিক পাল্টে ছুটল গুঞ্জনরত মৌমাছির মতো। পাল্টা গুলি করতে লাগল ম্যানসেলরা। ফ্রেইট ট্রেনের কাঠের বগি থেকে উড়তে শুরু

করল ছালবাকলা। চাকায় যেগুলো লাগল আগুনের ফুলকি ছড়াল সেগুলো।

হঠাৎ বুক চেপে ধরে মাটিতে পড়ে গেল হথর্নের একজন কাউহ্যান্ড। ঘড়ঘড় করে গলা দিয়ে আওয়াজ বের হলো। বেনন বুঝল বেশিক্ষণ আর বাঁচবে না লোকটা। ওর পাশে দাঁড়ানো আরেকজন কাউবয় কাঁধে গুলি খেয়ে পড়ে গেল। আঘাতটা গুরুতর নয়, তবে ভোগাবে। লোকটার গালাগালি আর অভিশাপে ভরে উঠল চারপাশ।

বগির দরজা বন্ধ করা হয়নি। গোলাগুলির আওয়াজে ভীত হয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো ঘোড়াগুলো। আবছা আঁধারে কালো একটা ঢেউয়ের মতো দেখাল ওগুলোকে।

খনি মুখের উল্টো পাশের পাথরের আড়াল থেকে বিগ বিল রেনোকে মাথা উঁচু করতে দেখল বেনন। সতর্কতার সঙ্গে নিশানা ঠিক করে ট্রিগারে আঙুল ছোঁয়াল ও। গুলি করেই বুঝতে পারল লক্ষ্যে আঘাত করতে পেরেছে। আর্তচিৎকার করে পড়ে গেল রেনো। তার সিক্সগানটা ঠন করে উঠল পাথরে পড়ে।

পাল্টা জবাব দিল ম্যানসেল আর ম্যাকলাস্কি। আগেই বসে পড়েছে বেনন, তাদের গুলি রাগী ভ্রমরের মতো ছুটে গেল ওর মাথার ওপর দিয়ে। পালিয়ে যাওয়া ফায়ারম্যান রেনোর অস্ত্রটা কুড়িয়ে নিয়ে শেষ দুটো গুলি বেহুদা খরচ করল। দুটোই লাগল রেলগাড়ির চাকায়। আর গুলি নেই বুঝতেই দিশে হারিয়ে খনির সুড়ঙ্গটার দিকে দৌড় দিল লোকটা।

ক্যাবের ভেতর থেকে পাখি মারার মতো অনায়াসে তাকে ফেলে দিল হথর্ন।

প্রায় বিশ মিনিট থেমে থেমে গোলাগুলি চলল। লড়াইয়ের ফলাফল স্থির হয়ে গেছে তা দুই পক্ষই বুঝতে পারছে। ম্যানসেলরা কাভার ছেড়ে নড়তে পারছে না, অথচ দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে তাদের গুলি। ধীরে ধীরে আগে বাড়ছে কাউহ্যান্ডরা। একটানা পনেরো মিনিট ওই পক্ষ থেকে গুলি না আসায় র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে আলাপ সেরে বেনন চেঁচাল, 'তোমরা ইচ্ছে করলে মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে আসতে পারো। কিছু বলা হবে না তোমাদের।'

দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেল, জবাব দিল না কেউ। টানটান উত্তেজনার মাঝে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল বেনন, হথর্ন আর কাউহ্যান্ডরা। তারপর ম্যানসেলের গলা ভেসে এলো।

'আমাদের এখানেই ঝুলিয়ে দেয়া হবে না তার নিশ্চয়তা কি?'

'আমি কথা দিচ্ছি,' জবাব দিল বেনন।

'আমিও,' বলল র‍্যাঞ্চার। 'শহরে নিয়ে তোমাদেরকে শেরিফের হাতে তুলে দেব আমি।'

'তাহলেও তো আমাকে মরতে হবে,' বলল ম্যানসেল।

'ওখানে যেতে চাইলে তবুও একটা বিচার পাবে,' বলল হথর্ন, 'এখানে মরতে হবে তোমাকে আমার কথা না শুনলে। দুটোর মধ্যে কোন্‌টা ভাল?'

আবার নীরবতা।

তারপর পাঁচ মিনিটের মাথায় পাথরের পেছনে নড়াচড়া দেখা গেল। বেরিয়ে আসছে ম্যানসেল। মাথার ওপরে দু'হাত। তার সঙ্গে যোগ দিল ম্যাকলাস্কি। পাথুরে ঢাল বেয়ে নেমে এলো তারা। বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে পড়ে ম্যানসেল বলল, 'আমরা নিরস্ত্র। গুলি কোরো না।'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই ঢালের অপর পাশ দিয়ে উপস্থিত হলো আঠারোজন অশ্বারোহী। রেলগাড়ির সদ্য জ্বালানো গোল আলোতে বেননদের ছায়া দেখতে পেল তারা । ঘোড়া থামাল সবাই। সামনের লোকটার বুক পকেটের ওপর ঝিক করে উঠল একটা রূপালী তারা।

খেয়াল করতেই বেনন দেখল লোকটা শেরিফ জিম টাকার। খালি হাতে পাসি নিয়ে শহরের পথে ফিরে যাচ্ছিল লোকটা।

বিস্ময় কাটিয়ে উঠে ঘোড়া নিয়ে হথর্ন আর বেননের সামনে এসে থামল সে। অন্য অশ্বারোহীরাও চেপে এলো।

শেরিফকে ক্লান্ত, রাগান্বিত আর বিরক্ত দেখাচ্ছে। বোঝা যায় এই কদিন একটানা ঘোড়া দাবড়ে সারাশরীর ঝনঝন করছে তার।

'এখানে হয়েছেটা কি?' পালা করে বেনন আর হথর্নকে দেখে নিয়ে রাগ চেপে জানতে চাইল সে।

শেরিফ টাকার, নাথানিয়েল হথর্ন, বেনন আর পাসির আধ ডজন সদস্য দাঁড়িয়ে আছে পরিত্যক্ত রূপার খনির সামনে। ট্রাকটা দেখছে ওরা। একসময় জিনিসটা খনির 'ওর' বওয়ার কাজে ব্যবহৃত হতো, কিন্তু এখন আর ওটাতে কোন ওর নেই। ট্রাক ভরে আছে চামড়া ছাড়ানো বারোটা বাছুরে। লবণ দিয়ে মাখানো হয়েছে বাছুরগুলোকে। মার্কেটে বিক্রির জন্যে তৈরি।

'নিজের চোখে না দেখলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না,' বলল হথর্ন। রাগের ছাপ পড়ল তার চেহারায়। জানতে চাইল, 'তাহলে এভাবেই আটশো গরু পাচার করেছে ও?'

মাথা দোলাল বেনন। 'একবার বুদ্ধিটা মাথায় আসার পর ব্যাপারটা ওদের কাছে ছেলেখেলা হয়ে গিয়েছিল। শুধু পছন্দের গরু খেদিয়ে এনে জবাই করা। চোখের আড়ালে নিয়ে গিয়ে একেকবারে একটা করে জবাই করত যাতে বাকিগুলো ভয় পেয়ে স্ট্যাম্পিড না করে। আর চিহ্ন থাকার ভয় ওদের ছিল না, কারণ খুরের ছাপ মরুভূমির বালিতে দ্রুত মুছে যেত। জবাই করা গরুগুলোকে খনির ভেতরে নিয়ে গিয়ে চামড়া ছাড়িয়ে লবণ মাখিয়ে ড্রেসিং করত ওরা। তারপর অপেক্ষায় থাকত কখন ডুরাংগোতে যাবার ট্রেন আসবে।

'ট্রেনের দুই ক্রু ম্যানসেলের সঙ্গে জড়িত ছিল। ওদেরকে হাত করতে না পারলে তার গোটা পরিকল্পনা মার খেয়ে যেত। ক্রু দু'জন শেষ দুই বগিতে গরু নিয়ে ডুরাংগোর কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পে সরাসরি বিক্রি করে দিত। আমার বিশ্বাস কন্স্ট্রাকশন ক্যাম্পের সুপারিন্টেন্ডেন্টও এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। কারণ ভাল লাভ থাকার কথা তার। ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেল রোডের কাছে একেকটা গরুর জন্যে কমপক্ষে বিশ ডলার করে বিল পাঠিয়েছে সে। আটশো

গরুতে প্রচুর লাভ থাকার কথা।'

'বিশেষ করে গরুগুলো যখন আর কারও,' তিক্ত কণ্ঠে যোগ করল হথর্ন। তাকাল বেননের দিকে। দৃষ্টিতে ফুটে উঠল প্রশংসা। বলল, 'কে ভাবতে পেরেছিল ম্যানসেল এসবের পেছনে! নিজের গরুও বিক্রি করছিল সে!'

মাথা নাড়ল বেনন। 'আমার তা মনে হয় না। ওসব ওর মুখের কথা, যাতে কেউ ওকে সন্দেহ করতে না পারে।'

'লেযি এ-র আর কেউ জড়িত বলে মনে হয় তোমার?' জানতে চাইল হথর্ন।

একটু চিন্তা করে জবাব দিল বেনন, 'সম্ভাবনা খুবই কম। পাঞ্চাররা জড়িত থাকলে রেনো আর ম্যাকলাস্কিকে সঙ্গে নিতে হতো না ম্যানসেলের। তাছাড়া ম্যানসেল চালাক লোক। যত কম লোক জানবে ততোই ভাল এটা সে জানত। জানত যে কাউহ্যান্ডরা মুখ খুললে কি বিপদে পড়তে হতে পারে। গরু চুরির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, এটাও তার অজানা ছিল না, কাজেই দলে শুধু ফোরম্যানকে নিয়েছিল সে। চতুর্থ লোকটা, গুলি খেয়ে মারা গেছে।'

'কি কারণে ম্যানসেলকে তোমার সন্দেহ হলো?' জানতে চাইল শেরিফ টাকার।

'আমার ধারণা ছিল খুনের সঙ্গে রেনো আর ম্যাকলাস্কি জড়িত। কিন্তু এটাও বুঝতে পারছিলাম অল্প পানির মাছ ওরা। পেছন থেকে কেউ একজন ওদের পরিচালিত করছে। এক রাতে ম্যানসেলের আকৃতির একজনকে আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে দেখি। পরের দিন আমি খনির কাছে আসতেই আমাকে গুলি করে মেরে ফেলার চেষ্টা হলো। আমি বুঝলাম এখানে আমি আসি তা কেউ একজন মোটেও চাইছে না।'

'তারপর?'

'মাথা খাটাতে লাগলাম আমি। ভেবে বের করার চেষ্টা করলাম কি করে কোন চিহ্ন না রেখে গরু চুরি করা যায়। চিন্তা করলাম আমি হলে কি করতাম। আমার মনে হলো একটা কাজ করলে চিহ্ন লুকাতে পারব। যদি মরুভূমির ওপর দিয়ে গরু সরিয়ে নিই তাহলে কয়েক ঘণ্টা পরেই দাগ মুছে যাবে বাতাসের বাড়িতে। কিন্তু তাই বলে কি একটু দাগও থাকবে না?

'এখানেই অতি চালাকি করে ভুল করে বসেছে ম্যানসেল। গরু চুরির পর ঝোপ দিয়ে ঝাড় দিয়ে বালির ওপর থেকে সমস্ত দাগ মুছে দিত সে। এমনকি নিজেদের ঘোড়ার চিহ্নও। কিন্তু একটা ব্যাপার সে খেয়াল করেনি। সুড়ঙ্গের মুখের কাছে বোল্ডারে ঘাস আছে। সেই ঘাস খানিকটা চিবিয়ে খেয়েছে একটা গরু। অথচ দুই বোল্ডারের মাঝে গরুর কোন চিহ্ন নেই। ওখানে বাতাসের বাড়িতে দাগ মুছে যেতে পারে না।

'আরেকটা ব্যাপার আমাকে অবাক করে,' থেমে দম নিয়ে আবার শুরু করল বেনন, 'যেদিন রেনো আর ম্যাকলাস্কি হামলা করল সেদিন হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে নতুন রেল আবিষ্কার করি আমি। রেলে জং ছিল; কিন্তু বিশ বছর পড়ে থাকলে যে রকম জং পড়ার কথা সেরকম পড়েনি। অথচ তার আগের

দিন মিস্টার হথর্নের সঙ্গে এসে পাথর ফেলার বেসিনের কাছটায় রেলটা আমি দেখেছি – ওখানে রেলটা অনেক বেশি জং ধরা।

'এক জায়গায় রেলটা বোধহয় ভেঙে গিয়েছিল। সেই জায়গাটায় নতুন রেল বসানো হয়েছে, এটাও আমার সন্দেহের একটা কারণ। মনে প্রশ্ন জাগল কে ব্যবহার করছে এই পুরনো খনি? কি তার উদ্দেশ্য?

'তাছাড়া খনির ভেতর থেকে কেমন যেন একটা গন্ধ আসছিল। প্রথমে আমি পুরনো খনির আর সব গন্ধের কারণে বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে মনে হয়েছে গন্ধটা কোন কিছু পচার। যেমন...'

'গরুর চামড়া!' বলে উঠল শেরিফ। 'এই মাত্র ভাবছিলাম চামড়াগুলো কি করেছে ওরা! আরও কোন প্রমাণের যদি দরকার পড়ত তাহলে খনির ভেতরে পেতাম আমরা। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আটশো গরুর চামড়া। চিন্তা করে দেখেছ? সর্বনাশ!'

'বেশির ভাগই আমার গরু,' আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল হথর্ন। বেননের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কিন্তু এখনও বলোনি কিভাবে তোমার সন্দেহ হলো ম্যানসেলকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল বেনন। 'লবণ। ম্যানসেলের পরিকল্পনায় সবচেয়ে বড় খুঁতই হলো লবণ। ট্রেন আসার আগে পর্যন্ত মাংস তাজা রাখার জন্যে প্রচুর লবণের দরকার হয়ে পড়ে ম্যানসেলের। খনির তাপমাত্রা মাংস তাজা রাখতে খানিকটা সাহায্য করেছে, কিন্তু মাংস পাঠাতে হবে বক্স কারে করে সেই দুইশো পঞ্চাশ মাইল দূরের ডুরাংগোতে। লবণ ছাড়া মাংস পচে যেতে পারত।

'আমি জানতাম শহরের প্রায় সব লবণ ম্যানসেল কিনে নিয়েছে। স্টোর মালিকের মুখে শুনেছি সে একটা সল্ট লিক বানাবে। তখন খটকা লাগলেও বুঝতে পারিনি। পরে যখন চিন্তা করে দেখলাম পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। ট্রেনের ক্রুরা মাঝে মধ্যে দু'এক ব্যাগ লবণ জোগাড় করে দিত, কিন্তু ব্যাপারটা তাদের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ কিনতে হবে ডুরাংগো বা ফিনিক্স থেকে। মানুষের কৌতূহল সৃষ্টি হতে পারে যে এত লবণ দিয়ে করে কি তারা। আর তাছাড়া ওই সামান্য লবণে ম্যানসেলের চাহিদা মেটেনি। ফলে সে এতই বেপরোয়া হয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত ওয়্যাগন ট্রেন ডাকাতি করে বসে। টাকা-পয়সা কিছুই না নিয়ে ছয়শো পাউন্ড লবণ নেয়াটা তার মস্ত বড় ভুল ছিল।'

'তুমি কি করে বুঝলে যে কাজটা ম্যানসেলের?' জানতে চাইল শেরিফ টাকার। 'ওয়্যাগন-মাস্টারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। লোকটা তো বলল ডাকাতির সময় মুখোশ পরে ছিল সবকয়জন।'

'আমিও লোকটার সঙ্গে আলাপ করেছি,' বলল বেনন। 'লোকটার দেয়া বর্ণনা বিগ বিল রেনো আর ম্যাকলাস্কির সঙ্গে মিলে যায়। তৃতীয় লোকটা হয় ম্যানসেল নাহলে তার ফোরম্যান। চুরি করা ওয়্যাগনটা পাথর ফেলার ওই গভীর বেসিনে খুঁজে পাওয়া গেলে আমি অবাক হব না।'

'তাহলে মিড বাসটিয়ান ডলারের জন্যে খুন হয়নি!' বলল শেরিফ টাকার।

'ডলারের কথা ম্যানসেল জানতও না; বেচারা মিড খুন হয়েছে এই খনির

জন্যে। সে যদি খনিতে কাজ করতে না চাইত তাহলে মরতে হতো না তাকে।'

'আচ্ছা, এবার অন্য একটা প্রসঙ্গে আসি,' গলা খাঁকারি দিল হথর্ন। সবাই তাকানোয় বলল, 'ম্যানসেল যদি মিডের খুনের ব্যাপারে দায়ী হয়ে থাকে তাহলে জনি উইলিয়ামস ন্যান্সিকে নিয়ে পালাল কেন?' শেরিফের দিকে তাকাল সে। 'তুমি বলছ ওদের কোন চিহ্নই পাওনি। তাহলে ওরা গেল কোথায়?'

'হয়তো…আমি জানি না।' কাঁধ ঝাঁকাল শেরিফ। 'প্রায় দুইশো মাইল চষে বেড়িয়েছি আমরা। ওদের কোন চিহ্ন পাইনি। ফেরার পথে গোলাগুলির আওয়াজে এদিকে এসেছি। মনে মনে আমার একটা আশা ছিল টুসনে ফিরে দেখব ওরা শহরেই আছে। আমার বিশ্বাস হয় না যে চাচার সারা জীবনের সঞ্চয় মেরে দিয়ে চলে যাবার মতো বাজে মেয়ে ন্যান্সি।'

'অমন কাজ ও করেওনি,' বলল বেনন। 'তোমাদের বলার সুযোগ হয়নি, তবে মিডের একলাখ ডলার এখন শহরে, ডেপুটি রলিন্সের কাছে জমা রাখা আছে। জেড ম্যানসেলের বার্নে একটা থলিতে ডলারগুলো আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। ওখানেই থলিটা ফেলে যায় জনি আর ন্যান্সি।'

বেননের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকল শেরিফ। হাঁ হয়ে গেল তার মুখটা। কিছুক্ষণ পরে ভাষা ফিরে পেয়ে বলল, 'তুমি পেয়েছ? হায় ঈশ্বর! তুমি নিশ্চয়ই আমার চাকরি খাওয়ার তাল করছ না, জোন্স? আমার তো মনে হচ্ছে তোমার মতো ধুরন্ধর লোক এশহরে থাকলে শেরিফ, মার্শাল এদের প্রয়োজন ফুরাবে।…আচ্ছা, এটা বলতে পারো গেছে কোথায় ওরা – ন্যান্সি আর জনি?'

'সম্ভবত জানি,' বলল বেনন। মনে মনে প্রার্থনা করল যেন ওর ধারণা সঠিক হয়।

উপস্থিত আটজন মানুষ উৎকর্ণ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করল বেনন। বলল, 'জেড ম্যানসেলকে জিজ্ঞেস করলে জবাবটা জানা যেত।'

'কিন্তু তাকে তো শহরে পাঠিয়ে দিয়েছি পাসির বাকি সদস্য আর ফ্লাইং জে-এ কাউবয়দের সঙ্গে!' বলল টাকার। 'তুমি রহস্য করছ কেন, বলে ফেলো।'

'তাহলে চলো যাওয়া যাক খনির ভেতরে,' বলে পা বাড়াল বেনন।

ওকে অনুসরণ করল সবাই।

খনির মুখ থেকে সাবধানে সরিয়ে ফেলা হয়েছে কাঠের গুঁড়ি, টাম্বল উইড আর ঝোপঝাড়। এখন ভেতরে ঢুকতে আর কোন বাধা নেই। তবে এখনও বিশ্বাস হতে চায় না যে খনিটা মানুষ আজকেও ব্যবহার করেছে। দেখে মনে হয় গত একশো বছরে এখানে কারও পায়ের চিহ্ন পড়েনি। কাঠের গুঁড়ি, টাম্বল উইড আর অন্যান্য ঝোপঝাড় আগের মতো করে রেখে দিলে কারও কোন কিছু সন্দেহ করার থাকবে না।

টানেলটা উর্ধ্বমুখী। মেঝেটা বেলে মাটির। ভেতরে ঢুকে এগোল ওরা। সামনে থেকে মশালের কাঁপা-কাঁপা লালচে আলো আসছে। খনির সুড়ঙ্গ দিনের

বেলাতেও অন্ধকার। ম্যানসেল মশাল জ্বেলে কাজ করত তা বুঝতে দেরি হলো না কারও।

বেনন আর শেরিফ টাকার আগে আগে চলেছে। পেছনে বাকিরা। ওরা যত সামনে বাড়ল, আলোটা ততই জোরাল হয়ে উঠল।

প্রধান সুড়ঙ্গ থেকে সরু সরু আরও মাকড়সার পায়ের মতো অনেকগুলো সুড়ঙ্গ চলে গেছে খনির অভ্যন্তরে। ছাদে ঠেকা দেয়া বেশির ভাগ গুঁড়িই এখনও দাঁড়িয়ে আছে। দু'পাশের ধূসর পাথুরে দেয়ালে মাঝে মধ্যেই রুপোর ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। আরও খানিক এগোতেই আলোটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বোটকা একটা গন্ধ নাকে ঝাপটা মারল ওদের। গন্ধটা আগেও ছিল, কিন্তু এতটা প্রকট মনে হয়নি তখন।

নাকে হাত চাপা দিল সবাই। নাক টিপে ধরে নাকি গলায় শেরিফ বলল, 'ঈশ্বর! এই গন্ধও মানুষকে সহ্য করতে হয়! এত কষ্ট করেছে ম্যানসেল! অন্তর থেকে ওকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। ভাগ্যিস জাজরা কেউ আসেনি, নাহলে তারাও ওকে মাফ করে দিত!'

টানেলটা বাম দিকে মোড় নিল। বাঁক ঘুরে থমকে দাঁড়াল সবাই। সামনে মস্ত বড় একটা প্রাকৃতিক হলঘর। ব্রাশউড মুচড়ে তাতে আলকাতরা মাখিয়ে তৈরি করা দুটো মশাল জ্বলছে ঘরের দু'পাশে। দেয়ালের গায়ে ব্যবহারের জন্যে তৈরি রাখা আছে আরও ডজন খানেক মশাল।

গুহার মেঝে কালো হয়ে আছে শুকনো রক্তে। ঘরের মাঝখানে পড়ে আছে আশি-নব্বইটা চামড়া ছাড়ানো গরু। উল্টো দিকের দেয়ালে গাদা করে রাখা আছে গরুর চামড়া, খুর আর মাথা। চোখের জায়গায় বড়বড় গর্ত। লাল আলোয় ভৌতিক দেখাচ্ছে।

বমি এসে গেল সব কয়জনের। 'ফুহ্!' মুখের ভেতর থেকে দুর্গন্ধ দূর করতে চেষ্টা করল শেরিফ। তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াল ফিরে যাবার জন্যে। বাকিরাও পিছিয়ে থাকল না। সবাই এখান থেকে বেরতে পারলে বাঁচে।

পা বাড়িয়েও থামতে হলো ওদের। অস্ফুট একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছে ওরা।

'ওটা কিসের শব্দ?' কাঁপা গলায় জানতে চাইল একজন।

থেমে দাঁড়াল ওরা। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল।

আবার হলো আওয়াজটা। কিছু একটা নড়ছে বা নড়ার চেষ্টা করছে। তারপর মৃদু গোঙানোর মতো একটা শব্দ হলো।

'হায় ঈশ্বর!' ফিসফিস করে বলল হথর্ন। 'দু'একটা গরু কি এখনও বেঁচে আছে – চামড়া ছাড়ানোর পরেও?'

ঘরের এক কোণে আবছা অন্ধকারে সাদা কি যেন নড়ে উঠল। শব্দটা আবার হলো। তারপর আবার। গোঙাচ্ছে কেউ মরিয়া হয়ে।

একটা মশাল স্ট্যান্ড থেকে খুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে সামনে বাড়ল বেনন। বাকিরা ওর পিছু নিল।

ঘরের কোণে মশালের আলো পড়তেই থমকে দাঁড়াল সবাই।

কালি পড়ে গেছে ওদের চোখের নিচে। চুলগুলো এলোমেলো। কেটে ছড়ে গেছে গাল। মুখ বাঁধা রুমালে। একসময় সাদা ছিল। এখন লাল হয়ে গেছে। তবে ওদেরকে চিনতে দেরি হলো না কারও। জনি আর ন্যান্সিকে খুঁজে পেয়েছে ওরা!

চোদ্দ

হথর্নের হাতে মশালটা ধরিয়ে দিয়ে ন্যান্সি আর জনির হাত-পায়ের বাঁধন খুলতে লেগে পড়ল বেনন। রশি খোলার পর মুখ থেকে খুলে নিল রক্তাক্ত রুমাল।

ন্যান্সি প্রায় সংজ্ঞা হারিয়েছে। জনির কাঁধে হেলে আছে ওর মাথা। জনি নিজেও অসুস্থ; দুর্বল। তবু ন্যান্সিকে জড়িয়ে ধরে উঠে দাঁড়াল সে।

'বাইরে নিয়ে চলো ওদের,' নির্দেশ দিল বেনন।

কয়েকজন এগিয়ে এলো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। হাতগুলো এড়িয়ে গেল জনি। ন্যান্সিকে জড়িয়ে ধরেই পা বাড়াল, গুহা থেকে বেরবে।

বাইরে এসে রাতের শীতল হাওয়ায় অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিল সবাই। ক্যান্টিন থেকে জনি আর ন্যান্সিকে পানি খাওয়াল শেরিফ।

মুখে খুব শক্ত করে রুমাল বাঁধায় কেটে বসে গেছে কাপড়। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না দু'জনের কেউ। তারপর ওদের দেখে খানিকটা সুস্থ বলে মনে হতেই প্রশ্ন করল টাকার, 'কে তোমাদের বন্দী করেছিল; জেড ম্যানসেল?'

উত্তর দিল জনি। 'হ্যাঁ। ওর সঙ্গে রেনো আর ম্যাকলাস্কিও ছিল। ঈশ্বরের শপথ, একবার দেখা হোক ওদের সঙ্গে, বুঝিয়ে দেব কার সঙ্গে লাগতে এসেছিল। খুন করে ফেলব ওদের আমি।'

'আগেই রেনো মারা গেছে,' বলল বেনন। 'ম্যানসেল আর ম্যাকলাস্কিকে শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, জেলে ঢোকানো হবে। নিশ্চিন্তে থাকতে পারো, রাসলিঙের অপরাধে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে ওদের।' ন্যান্সির দিকে তাকাল বেনন। মেয়েটা চোখ খুলেছে দেখে জানতে চাইল, 'তুমি পালিয়েছিলে কেন?'

'পালাইনি,' মৃদু স্বরে বলল মেয়েটা। 'বার্নে আমাদের ধরে ফেলার পর থেকেই এখানে বন্দী হয়ে আছি আমরা।' হড়হড় করে বমি করল ন্যান্সি। একটুপর কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, 'আমি দুঃখিত। আসলে ওই চামড়ার গন্ধ এত ভয়ানক যে…'

'আমরা বুঝতে পেরেছি,' তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে বিব্রতকর অবস্থা থেকে মুক্তি দিল বেনন। বলল, 'টুসন থেকে বাড়ি ফেরার পর কি হলো তা একটু বলতে পারবে?'

'পারব।' মুহূর্তের জন্যে মনে হলো কেঁদে ফেলবে ন্যান্সি। কিন্তু দ্রুত আত্মনিয়ন্ত্রণ করল সে। বলল, 'যখন শুনলাম মিড চাচা মারা গেছে আর

ডলারগুলো পাওয়া যাচ্ছে না তখন প্রথমেই আমার মনে হলো···প্রথমেই আমার মনে হলো···' কথা শেষ না করে করুণ চোখে জনির দিকে তাকাল ন্যান্সি।

'ও ভেবেছিল কাজটা আমার,' ন্যান্সি থেমে যেতে বলল জনি। 'আমি জানতাম কতখানি ব্যাকুল ও পুবে যাবার জন্যে। ডলারের খবরও আমার অজানা ছিল না। কাজেই···'

'আমিই ওকে বলেছিলাম,' জনির হয়ে বলল ন্যান্সি। 'আমি এমনকি কয়েক হাজার ডলার চুরি করার বুদ্ধিটাও ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। খুনটা যখন হলো আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম আমি। মনে হলো জনিকে বাঁচাতে হলে আর কাউকে খুনী প্রমাণ করতে হবে···' বেননের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল ন্যান্সি। চোখের ভাষায় ফুটে উঠল ক্ষমা প্রার্থনা।

'তারপর?' জানতে চাইল বেনন যেন কিছুই ঘটেনি।

'তারপর প্রথম সুযোগেই আমি শহর ছাড়লাম। আমাকে জানতেই হতো যাকে ভালবেসেছি সে খুনের মতো জঘন্য একটা অপরাধ করেছে কিনা। যাই হোক, আমি বাড়িতে গিয়ে ডলারগুলো খুঁজে পেলাম। একেবারে চোখের সামনেই ছিল। তখনই বুঝতে পারলাম খুনটা যেই করে থাকুক জনি করেনি। জনি খুন করলে ডলারগুলো ওখানে রেখে যেত না। তখন আমি ভাবলাম···আমি ভাবলাম···'

'তুমি ভাবলে তোমার বাবা খুনটা করেছে,' বলল টাকার।

'হ্যাঁ।' আস্তে করে মাথা দোলাল ন্যান্সি। দু'চোখ ভরে উঠল জলে। ধুলোমাখা গাল বেয়ে নেমে এলো দু'ফোঁটা অশ্রুবিন্দু। 'আর কি ভাবতে পারতাম আমি? আমার জানা ছিল বাবা আর মিড চাচার মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। তারপর সেই রাতেই খুন হয়ে গেল চাচা। আমার মনে হলো বাবাই চাচাকে খুন করে বাড়িতে ডলার রেখে আবার ফিরে এসেছে হোটেলে। আমি ভেবে দেখলাম পুরো রাত সময় পেলে কাজটা বাবার পক্ষে করা সম্ভব।'

জনি আবার কথা বলে উঠল, 'এসব সাত-পাঁচ ভেবে ডলারগুলো নিয়ে আমার কাছে চলে এলো ও। আমি তখন র‍্যাঞ্চেই ছিলাম। ওকে নিয়ে বার্নে গেলাম কি করা যায় তা আলোচনার জন্যে। আমরা তখনও কথা বলছি এমন সময় আওয়াজ পেয়ে বুঝলাম দু'জন লোক বার্নের পেছন দরজা দিয়ে আসছে। ডলারসহ ধরা পড়লে বিপদ হয়ে যাবে ভেবে খড়ের গাদার পেছনে লুকালাম আমরা। আশা করলাম লোকগুলো চলে যাবে। কিন্তু ওরা গেল না। কথা শুনে মনে হলো কারও জন্যে অপেক্ষা করছে। আমার ধারণাই ঠিক প্রমাণিত হলো। কিছুক্ষণ পর বার্নে এসে ঢুকল ম্যানসেল।

'ঝগড়া শুরু হলো লোকগুলোর সঙ্গে ম্যানসেলের। গলার আওয়াজে বুঝলাম একজন রেনো আর বাকিজন ম্যাকলাস্কি। রেনোই খুন করেছে ন্যান্সির চাচাকে। ম্যানসেল বলার আগে ডলারের খবর জানা ছিল না দু'জনের কারও। কেন তারা ডলার হাতায়নি সেজন্যে অনেক ধমকাধমকি করল ম্যানসেল। বলল অত টাকা একবারে পেলে এত ঝুঁকি নিয়ে সামান্য কিছু গরু রাসলিং করতে হতো না ওদের।'

পানির ক্যানটিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল জনি। ক্যান্টিনটা মুখে তুলে ঢকঢক করে পানি খেল।

'তারপর কি হলো?' জানতে চাইল হথর্ন। সবাই গোল হয়ে জনি আর ন্যান্সিকে ঘিরে বসেছে। আগামী বিশ-ত্রিশ বছর ওরা বলবে কি রোমাঞ্চকর একটা রহস্যের সমাধান করেছিল জর্জি জোন্স নামের লোকটা। জর্জির সঙ্গে সঙ্গে জনি, ন্যান্সি এবং জড়িত সবার নামই উচ্চারিত হবে ক্যাম্পফায়ারের আগুনের ধারে; গল্পের আসরে।

'তারপর খড়ের ধুলো নাকে যেতেই আমার হাঁচি পেয়ে গেল,' লজ্জিত চেহারায় জানাল ন্যান্সি। 'ওরা শব্দটা শুনেই ধরে ফেলল আমাদের। জনি একা দু'জনের সঙ্গে পারল না। ওরা···ওরা ভেবেছিল আমরা খড়ের গাদার পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্যে গেছি, তাই ডলারের থলেটা ওরা দেখেও দেখল না। বার্নে এরকম অনেক অকাজের জিনিসই থাকে।'

'তারপর তোমাদের এখানে এনে বন্দী করল?'

'কি করত ওরা তোমাদের নিয়ে?'

'রেনো চেয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলতে,' বলল জনি। 'কিন্তু আপত্তি জানাল ম্যানসেল। বলল সবচেয়ে ভাল হবে যদি শেরিফকে বিশ্বাস করানো যায় যে মিড বাসটিয়ানকে খুন করে টাকা নিয়ে পালিয়েছি আমরা।'

'আজকে রাতে আমাদের খুন করত ওরা,' জনি থেমে যেতে বলল ন্যান্সি। 'রেনো আর ম্যাকলাস্কি ফ্রেইট কারে গরু ওঠানোর পর আমাদের তুলে নিত এঞ্জিন ক্যাবে। তারপর ট্রেনটা যখন উপত্যকার শেষের ওই উঁচু ব্রিজে উঠত তখন আমাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত ওরা।'

'খুবই বন্ধুভাবাপন্ন লোক,' শুকনো গলায় মন্তব্য করল বেনন। 'কোন সুযোগ দিতে চায়নি ওরা। ওই র‍্যাভিনটা আমি দেখেছি। অন্তত চারশো ফিট গভীর হবে।'

জনির হাত আঁকড়ে ধরল ন্যান্সি। চেহারায় আতঙ্কের ছাপ। ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল জনি। বলল, 'তারপর মৃত্যুর প্রহর গুনতে গুনতে গুলির আওয়াজ পেলাম। মনে হলো এত মিষ্টি আওয়াজ জীবনে কখনও শুনিনি আমি। বসে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম আমরা। তারপর তো তোমরা জানোই।'

'প্রায় চারদিন ধরে গুহাতে বন্দী হয়ে আছ তোমরা!' বিস্ময় প্রকাশ করল হথর্ন। 'বেঁচে আছ কি করে। ওই দুর্গন্ধে তো দম আটকে মরে যাওয়ার কথা!'

'ওরা এখানে, আর আমরা ওদের দূরদূরান্তে কোথায় না খুঁজে ফিরেছি,' আক্ষেপ করল শেরিফ। ন্যান্সিকে বলল, 'কোন চিন্তা কোরো না, এখনই আমরা শহরের দিকে রওয়ানা হয়ে যাব। এতক্ষণে তোমার বাবার বোধহয় পাগল হতে বাকি আছে।'

সবাইকে একবার দেখে নিয়ে বেননের চোখে চোখ রাখল হথর্ন। বলল, 'ধন্যবাদ যদি কাউকে দিতে হয় তাহলে তোমাকেই দিতে হবে···জোন্স! তুমি ডলার কে চুরি করেছে শুধু সেটাই বের করোনি, ডলার ফেরতও নিয়ে এসেছ।

তাছাড়া আছে রাসলারদের ধরিয়ে দেয়ার মতো একটা কাজ। তোমাকে মুখে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না আমি।'

ভেজা চোখে বেননের দিকে তাকাল ন্যান্সি। বলল, 'আমি দুঃখিত যে তোমার ওপর লোকের সন্দেহ জাগিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।'

'দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই।' হাসল বেনন। 'তুমিই একমাত্র মানুষ নও যে আমাকে অপরাধী প্রমাণ করতে চেয়েছে। জেড ম্যানসেলও চেয়েছিল আমাকে আউট-ল রক বেনন হিসেবে প্রমাণ করে খুনী সাব্যস্ত করতে।'

মেরুদণ্ড টানটান করে সোজা দাঁড়িয়ে সন্দেহ ভরা চোখে বেননের দিকে চাইল শেরিফ। বলল, 'তোমার পরিচয়ের ব্যাপারে একটু আলোচনা করা আমাদের জন্যে জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি বলছ তুমি রক বেনন নও। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি শিকাগোর ক্যাটলবায়ার অ্যাসোসিয়েশনে তোমার নাম রেজিস্ট্রি করা নেই। বলো তো আসলে কে তুমি?'

হাসল বেনন। পকেট থেকে বের করে আনল চামড়ার ওয়ালেট। ওটার ভাঁজ খুলে শেরিফের নাকের সামনে ধরল ও। 'এই যে আমার পরিচয় পত্র।'

কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল শেরিফের। জোরে জোরে পড়ল, 'পিঙ্কারটন ডিটেকটিভ এজেন্সি।'

নামটা পড়ার জন্যে ঝুঁকতে হলো তাকে। চমকে গেল। ফিসফিস করে বলল, 'তাহলে জেড ম্যানসেল ঠিকই বলেছিল! তুমিই সেই কুখ্যাত দস্যু রক বেনন! তোমার নাম এমনকি জর্জি জোন্সও না!'

'ওসব পুরনো দিনের কথা ভুলে যাওয়াই ভাল,' বলল হথর্ন। 'শহরে চলো সবাই। আজকে বেননের সম্মানে ড্রিঙ্ক আমার তরফ থেকে। যে যত খেতে পারো।'

হৈ-হৈ করে উঠল সবাই। হঠাৎ করে একটা গলা থেমে গেল। কড়া চোখে জনির দিকে তাকিয়ে আছে ন্যান্সি। চোখের শাসনের দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে পুবে যাওয়ার ভূত মাথা থেকে বিদায় নিয়েছে ওর।

রওয়ানা হয়ে গেল ওরা শহরের দিকে। যেতে যেতে ভাবল বেনন এরপর কোন্ শহরে যাবে। আজও যাত্রা শেষ হয়নি ওর। আর পকেটেও পিঙ্কারটন এজেন্সির দেয়া এক হাজার ডলার সম্মানী আছে। কাজেই চিন্তা কি! তবে আবারও টুসনে আসতে হতে পারে ওকে – জনি আর ন্যান্সির বিয়েতে।

***